ভাগ। }পৌষ ১৩০৩—জানুয়ারী ১৮৯৭{ ১ম সংখ্যা।

ভাগ। } পৌষ ১৩০৩—জানুয়ারী ১৮৯৭ { ১ম সংখ্যা।

কান্তি

ভাগ। }পৌষ ১৩০৩—জানুয়ারী ১৮৯৭{ ১ম সংখ্যা।

নিবেদন।

কান্তি প্রকাশিত হইল। অগ্রহায়ণের মই ইহা বাহির হইবার কথা ছিল। নক মহাত্মা অগ্রহায়ণের পূর্ব্বেই গ্রাহক-ভুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট সেই বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি-ছি। নানা কারণে এই বিলম্ব হইয়াছে।

ক্ষুদ্র স্থানের ক্ষুদ্র লোকের ক্ষীণ চেষ্টায় হর উৎপত্তি। ইহার আকার ক্ষুদ্র, শক্তি আকাঙ্ক্ষাও অতি উচ্চ নহে। সদুদ্দেশ্যে আকাঙ্ক্ষা লইয়া ক্ষুদ্র প্রাণী সামর্থ্যানুযায়ী নি করিতে ইচ্ছা করিলে, সহৃদয় ব্যক্তির নুভূতি ও অনুকম্পাই পাইয়া থাকে। সা করি, কান্তিও সকলের স্নেহ ও অনুগ্রহ প্ত হইবে; এবং কান্তির নামে কাহারও সকা-কুঞ্চন জন্মিবেনা।

জ্ঞানানুশীলন যে মানব-সমাজের অশেষ ণের আকর, তাহা কাহারও অবিদিত আর, সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের পক্ষে সাময়িক পত্রিকাই যে উৎকৃষ্ট উপায়, ইহাও সকল দেশেই প্রমাণিত হইয়াছে। সেই জ্ঞানানুশীলনই কান্তির মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য নহে, এবং সংবাদপত্রের অভাব পূরণ করিবার জন্যও ইহার অবতারণা হয় নাই। তবে স্থানীয় ও সাধারণ সংবাদ অল্প বিস্তর ইহাতে প্রকাশ করিতেও আমাদের ইচ্ছা আছে।

মেদিনীপুর বঙ্গদেশের একটী প্রধান জেলা। ইহার আয়তন যেমন বহুদূর-প্রসারিত বিভবও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। বঙ্গদেশের মধ্যে এক ময়মনসিংহের নীচেই মেদিনীপুরের নাম করিতে হয়। মেদিনীপুর প্রকৃতির ঐশ্ব-র্য্যেও বঞ্চিত নহে। বিশাল অরণ্যানীপরিবৃত গিরিরাজি, শাল-তাল-পিয়ালাদি মহীরুহ পরিপূর্ণ কানন, শস্যশ্যামল সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর জনাকীর্ণ জনপদ ও নগর, এবং উত্তাল তরঙ্গ

...ক ও সুকৃতী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। কাঁথি এই জেলার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান মহকুমা। মেদিনীপুর বঙ্গের মধ্যে আয়তনে যেমন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, সেইরূপ শ্রীরামপুরের নীচে কাঁথির উল্লেখ হইয়া থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এ মহকুমার কথা দূরে থাকুক, সমগ্র জেলার মধ্যেও এক খানিও কোন প্রকার পত্রিকা নাই।

এই গুরুতর অভাবমোচনের ক্ষীণ সূত্রপাতস্বরূপ এই ক্ষুদ্র আয়োজন করিয়া, আমরা যেমন প্রাণে পরম আনন্দ পাইতেছি; অপরদিকে আমাদিগের শক্তির ক্ষুদ্রতা চিন্তা করিয়া আবার সময় সময় প্রাণে ভীতিরও সঞ্চার হইতেছে। তবে দুটী বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা মনে বল লাভ করিতেছি।

প্রথম, আমরা কর্ত্তব্যবোধেই এই কঠিন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমাদের সামর্থ্য ক্ষুদ্র হইলেও আকাঙ্ক্ষা পবিত্র। এই পবিত্র আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সাধ্যানুসারে কর্ত্তব্য পালনে চেষ্টা করাই আমাদের কার্য্য; ফলাফল সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ইচ্ছাময়ের হস্তে। আমরা ভাবী ফলাফল চিন্তা করিবার অধিকারী নহি। মহদনুষ্ঠানের চেষ্টাও শ্লাঘনীয় বলিয়া মহাজনেরা বলেন। আমরা, জগতের কল্যাণপ্রদ, মহাজনদিগের সেই উপদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া হৃদয়ে বললাভ করিতেছি।

দ্বিতীয়, আমাদের আশা ভরসার অপর

ব...

ভূ...

হ...

...পোষণোপযোগী অর্থসাহায্যের... শালী পাঠকও মেদিনীপুর জেলায় স... আছেন। ইঁহাদের আগ্রহ ও উৎসাহ থা... কান্তির আর ভয়ের কারণ কি?

কান্তিকে সকলেই যদি আপনার ... গ্রহণ করেন, কান্তির উন্নতিতে স্বদেশে... ও গৌরব সাধিত হইবে বলিয়া যদি ... মনে করেন, আর এই বহুসংখ্যক শিক্ষি... শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণের অধিবাসস্থলে ... খানি সাময়িক পত্রিকা না থাকা যদি দুঃ... বিষয় বলিয়া সকলে অনুভব করেন, তবে ... আমাদের ভাবনা কি? আমরা এই শু... ষ্ঠানের আরম্ভ করিলাম; যদি ইহার সমুন্ন... সাধনে অক্ষম হই, আমাদের কর্ত্তব্য প্র... পালিত হইল বলিয়া মনে শান্তি লাভ ক... কিন্তু তাহাতে কি মেদিনীপুরবাসী ভদ্র ... লজ্জার বিষয় হইবে না?

আমরা ব্যক্তি-বিশেষের স্বার্থসাধ...দ্দেশে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। যাঁ... কান্তির প্রচারের জন্য অর্থসাহায্য করিয়াছে... তাঁহারাও তদ্বিনিময়ে লাভের আশায় প্র... নহেন। "কান্তি" আত্মপোষণ ও স্বীয় উ... সাধনে সমর্থ হইয়া দেশের সেবা ক... অনুষ্ঠাতাদিগের আনন্দ বিধান করুক, এ... আমাদের অপর কোন প্রত্যাশা নাই। ব...

যদি কখনও অর্থসচ্ছলতা হয়, তাহা কান্তির উন্নতিতেই ব্যয়িত হইবে। সুতরাং কান্তিকে আপনার বলিয়া মনে করিতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিতে পারেনা।

কান্তি কোন সম্প্রদায়বিশেষেরও মুখপত্র নহে। সাম্প্রদায়িক হিংসাবিদ্বেষ কান্তিতে স্থান পাইবেনা। সকলেই যাহাতে নিঃসঙ্কোচে স্বাধীনভাবে আপন আপন চিন্তা ও মত প্রকাশিত করিতে পারেন, তাহাই কান্তির অভিপ্রায়। সুতরাং সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলেই এই অনুষ্ঠানে অবাধে যোগ দান করিতে পারেন।

এক্ষণে, কান্তিকে সকলেই আপনার বলিয়া মনে করেন, সকলেই ইহাকে সস্নেহে প্রতিপালন ও বর্দ্ধন করেন; যাহাতে কান্তি জ্ঞানের উজ্জ্বল কান্তি বিকীর্ণ করিয়া দেশের সেবা করিতে পারে, তদনুরূপ চেষ্টা ও যত্ন করেন; আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি। ধনী, মধ্যবিত্ত, সুশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ ও সাধারণ গৃহস্থ, কান্তির নিকট সকলেই সমান; এবং কান্তি সকলেরই পালনীয়া ও রক্ষণীয়া। কান্তির এই ক্ষুদ্র উদ্যোগে আমাদের বিস্তর ত্রুটী থাকা অসম্ভব নহে। সহৃদয় উদারচিত্ত মহোদয়গণ আমাদের ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া, কান্তির উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় স্মরণ করতঃ ইহার মুখ চাহিয়া, স্নেহের হস্ত প্রসারিত করুন; কান্তি তাঁহাদের আদর ও যত্নে উত্তরোত্তর অধিকতর পুষ্টি ও কান্তিলাভ করিয়া, দেশের সেবায় সামর্থ্যবতী হউক, কান্তির কান্তিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল হউক, এই আমাদের আকিঞ্চন। ...

স্বদেশসেবাপরায়ণ মহাত্মাদিগেরও সহানুভূতির আশা আমরা যথেষ্ট করিতে পারি। আমাদের এই ক্ষুদ্র চেষ্টায় তাঁহারা যে স্বীয় সহৃদয়তার গুণেই সহানুভূতি করিবেন; তাঁহাদেরই পদচিহ্নানুসরণকারিণী এই কান্তিকে যে স্নেহাশীর্ব্বাদ বর্ষণ ও পথপ্রদর্শন করিবেন, এ বিষয়ে আর আমাদের সন্দেহ কি? তথাপি আমরা তাঁহাদিগের নিকট বিনীতমস্তকে অকিঞ্চনতাসহকারে কৃপাদৃষ্টি ভিক্ষা করিতেছি। তাঁহারা আমাদের পরম যত্নের নিধি, আদরের ধন, আশার আলোক এই কান্তিকে যেন স্নেহের অমৃতধারা সিঞ্চনে পরাঙ্মুখ না হয়েন। এ উদ্যোগ তাঁহাদেরই মহদ্দৃষ্টান্তের একটী সামান্য ফল বলিয়া যেন ইহাকে প্রীতিদানে বর্দ্ধিত করেন।

সর্ব্বোপরি আমরা নিখিল প্রজাপুঞ্জের পালয়িতা, মঙ্গলবিধাতা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা করুণাময় পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। তাঁহার ইচ্ছায় সকলই সম্ভব হয়। আমরা পুনঃ পুনঃ তাঁহারই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তিনি আমাদিগের মনে কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জাগ্রত রাখুন; জ্ঞানালোকে আমাদের ভ্রমান্ধকার ও মোহতমঃ বিনাশ করিয়া লক্ষ্যপথ প্রকাশিত করুন; আমাদিগের দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া প্রাণে উৎসাহের অগ্নি নিয়ত প্রজ্জলিত রাখুন; হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার করুন; এবং আমাদের অভিমান, অহঙ্কার, কুটীলতা ও স্বার্থপরতা বিনাশ করিয়া, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, বিনয় ও প্রেম প্রদানকরুন—যাহা... কান্তির সেবা করি... গণের ...

বিনয়াবনত ... জ্ঞানেন্দ্র ... বিদ্যোৎসাহী

করুন। তাঁহারই গৌরব প্রতিষ্ঠিত হউক ইতি।

রাজা যাদবরাম রায়।

কাঁথির পশ্চিমে কিশোরনগর নামে একটী গ্রাম আছে। ইহা সচরাচর গড় কিশোরনগর বলিয়াই খ্যাত। মাজনামুঠার জমিদারবংশ বহুপূর্ব্বাবধি এই গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই জমিদারবংশে রাজা যাদবরাম রায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ঈশ্বরী পট্টনায়ক এই বংশের আদি পুরুষ। হিজলিতে যেখানে রসুলপুর নদী বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে, তাহার অদূরে মছন্দলী শার প্রকাণ্ড আস্তানা দেখিতে পাওয়া যায়। এই মছন্দলী বা তাজখাঁ মস্নদ আলী হিজলির রাজা ছিলেন। ভীমসেন মহাপাত্র নামে তাঁহার এক দেওয়ান ছিল। ঈশ্বরী পট্টনায়ক সেই ভীমসেনের সামান্য কর্ম্মচারী মাত্র ছিলেন। বাহিরিমুঠায় ভীমসাগর নামে যে সরোবর দেখিতে পাওয়া যায়, কোন পারিবারিক মনোবেদনায়, ভীমসেন, সেই সরোবরে প্রাণ ত্যাগ করিলে, ঈশ্বরী স্বীয় অধ্যবসায়গুণে রাজসংসারে প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হন। পরে মছন্দলীর পুত্র ও জামাতার লোকান্তর হইলে, তৎকালীন সুবেদার হইতে সনন্দ প্রাপ্ত ... ১৫৮৪ খ্রীঃ অব্দে ঈশ্বরী মাজনামুঠা ... স্থাপন করেন। ... ত্যু হয়।

হইয়া 'চৌধুরী' পদবী প্রাপ্ত হন। জগমোহনের দুই পত্নী। প্রথমার গর্ভে দ্বারকানাথ এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে রায়কিশোরের জন্ম হয়। দ্বারকানাথ পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি পিতৃ-প্রাপ্ত সম্মানসূচক 'চৌধুরী' উপাধি উপেক্ষা করিয়া, আপনাকে "দাস" বলিয়া পরিচয় দিতে ভাল বাসিতেন। তিনি সাধারণতঃ দ্বারকানাথ দাস নামেই অভিহিত হইতেন। দ্বারকানাথের পুত্রের নাম কৃপানিধি। তিনি অতি সরল ও উদার স্বভাবের লোক ছিলেন। পিতার ন্যায় তাঁহার হৃদয়ও ধর্ম্মভাবে পূর্ণ ছিল; ধর্ম্মালোচনা ও দেব সেবায় সময়পাত করিতেই তাঁহার বড় ভাল লাগিত।

কিন্তু রায়কিশোরের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন উপাদানে গঠিত। স্বার্থপরতাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান অঙ্গ ছিল। দ্বারকানাথের মৃত্যু হইলে, চিরাগত নিয়মানুসারে কৃপানিধিই জমিদারীর উত্তরাধিকারী। কিন্তু স্বার্থপর রায়কিশোর ভ্রাতুষ্পুত্রের সরলতা আপন অভিষ্ট—সাধনে উপযোগী বুঝিয়া, কৌশলে কর্ম্মচারীগণকে হস্তগত করিয়া বলপূর্ব্বক জমিদারীর অধিকারী হইয়া বসিলেন।

রায়কিশোরের পর তদীয় পুত্র ভূপতিচরণ ও তৎপরে ভূপতির দৌহিত্র পার্ব্বতীচরণ জমিদার হইয়াছিলেন। ভূপতিচরণ বীর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সাহস ও বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া সুবাদার তাঁহাকে 'রায়' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই 'রায়' পদবী উত্তরপুরুষের মহা সমাদরে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ১৭৪৫ খ্রীঃঅব্দে পার্ব্বতী চরণের মৃত্যু হয়।

কৃপানিধি খুল্লতাতের-অন্যায় আচ...

জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইয়াও কিছু মাত্র দুঃখিত হন নাই। তিনি পতিব্রতা পত্নীর সহায়তায় দেব-দ্বিজের সেবায় মনের সুখে সময় যাপন করিতেন। যাদবরাম এই প্রেম-ময় দম্পতীর পবিত্র প্রণয়ের ফলস্বরূপ জন্মিয়াছিলেন। মাতার তেজস্বিতা ও পিতার ধর্ম্ম-প্রবণতা তাঁহার চরিত্রকে অতি উচ্চ উপাদানে গঠিত করিয়া ছিল। যেমন একদিকে দয়া-দাক্ষিণ্যাদি কোমল গুণনিচয়ে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল, তেমনই সাহস, অধ্যবসায়, মনস্বিতা, ন্যায়পরতা ও সমদর্শিতা প্রভৃতি মহৎ গুণেরও অভাব তাঁহাতে ছিলনা। তাঁহার শান্তমূর্ত্তি ও লাবণ্যময়ী কান্তি দর্শকের হৃদয় অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ করিয়া দিত। কথিত আছে, একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কৃপানিধির নিয়োগমতে দেব-সেবায় নিরত হইয়াছিলেন। শিশু যাদবরাম পূজার প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধীরভাবে একাগ্রচিত্তে পিতৃ-পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মণ যাদবরামের অদ্ভুত দেবপ্রীতি দর্শনে মোহিত হইয়া, দেবপদ হইতে একটী পুষ্পমালা লইয়া তাঁহার গলদেশে প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন "আমি বিষ্ণু-সমক্ষে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, এই সুরভি কুসুমের ন্যায় তোমার যশে ধরাতল পূর্ণ হইবে। এরূপ ভক্তি ও একাগ্রতা কখনই নিষ্ফল হইবার নহে"। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বচন বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছিল।

যাদবরাম ক্রমে জানিতে পারিলেন যে তাঁহার পিতাই জমিদারীর প্রকৃত স্বত্বাধিকারী; ভূপতি রায়ের পিতার কৌশলেই তিনি জমিদারী হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ভূপতি রায় অন্যায় রূপে অর্জ্জিত জমিদারী সুখে স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতেছে; তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি অণুমাত্র লক্ষ্য করিতেছেন। ইহা যুবক যাদব রামের নিতান্ত অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, পিতামহের জমিদারীর উদ্ধারসাধন না করিয়া কখনই ক্ষান্ত হইবেননা।

তিনি দেখিলেন দেশমধ্যে সুবাদারের ক্ষমতা অসীম। উন্নতি অবনতি তাঁহারই অনু-গ্রহ ও নিগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে, এবং তাঁহার সহায়তা ব্যতিরেকে মনোরথ-সিদ্ধির উপায়ান্তর নাই। সুতরাং মুরসিদাবাদ যাত্রাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইল।

তিনি কালবিলম্ব না করিয়া মুরশিদাবাদে গমন করিলেন, এবং পারসী শিক্ষার অভিলাষে এক বৃদ্ধ কাজির নিকট আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। সেখানে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি-প্রভাবে যাদবরাম অল্পকালমধ্যে বৃদ্ধের প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠিলেন।

তৎকালে নবাবসরকারে মস্তাফা খাঁর অসীম প্রতিপত্তি ছিল। মস্তাফাখাঁ এই বৃদ্ধের শিষ্য ছিলেন এবং সময়ে সময়ে বৃদ্ধের আবাসে যাতায়াতও করিতেন। এই সুযোগে মস্তাখাঁর সহিত যাদবরামের পরিচয় হইয়া, ক্রমে বন্ধুত্ব জন্মিল। তখন যাদবরামের মুরশিদাবাদ আগ-মনের উদ্দেশ্য মস্তাফাখাঁর অবিদিত রহিলনা। অবিলম্বে যাদবরাম নবাবসদনে প্রবেশলাভ করিলেন।

তৎকালে আলিবর্দ্দিখাঁ বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে আসীন ছিলেন। আলিবর্দ্দি যাদব রামের প্রতি এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহাকে সুদূর সমুদ্রতীরব... মুঠার জমি...

হইয়াছিলেন। শেষে, নিষ্ঠাবান যাদবরাম তদ্রূপ কার্য্যের প্রয়াসী নহেন বুঝিয়া, তাঁহাকে জমীদারীর সনন্দ প্রদান করেন, এবং ফৌজ পাঠাইয়া তাঁহাকে পিতামহের জমিদারীতে স্থাপন করিবারজন্য মস্তাফাখাঁকে আদেশ দেন।

এই সময়ে পার্ব্বতী চরণ জমীদার হইয়াছেন। নবাব পার্ব্বতী চরণকে দুরীকৃত করিয়া, যাদবরামকে জমিদারী প্রদান করিলে, তাহার কোমল হৃদয় উল্লাসিত না হইয়া বরং ব্যথিত হইল। পার্ব্বতী চরণের মনে বেদনা দিয়া জমিদার হইতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা হইলনা। তিনি যোড়হস্তে নবাবকে জানাইলেন যে সুবাদারের এই অনুগ্রহে তিনি নিতান্ত আপ্যায়িত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা যে পার্ব্বতীচরণ যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন তিনিই জমিদারী ভোগ করুন, তাঁহার লোকান্তর হইলে যাদবরাম বা তদীয় উত্তরাধিকারী জমিদার হইবেন। আলীবর্দ্দি যাদবরামের এই উদার স্বার্থত্যাগদর্শনে পুলকিত হইয়া তদনুরূপ আদেশই দিয়াছিলেন।

১৭৪৫খ্রীঃঅব্দে পার্ব্বতী চরণের মৃত্যু হয়। যাদবরাম নবাবের অনুমতিক্রমে রাজোপাধিতে ভূষিত হইয়া কিশোরনগরে উপনীত হইয়া মহাসমারোহে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

দেবভক্ত যাদবরাম সর্ব্বাগ্রেই দেবকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। অচিরে প্রাসাদসমীপে বিষ্ণু-মন্দির নির্ম্মিত হইয়া, নানাদেবমূর্ত্তি স্থাপিত হইল, এবং অন্যূন তিন সহস্র বিঘা দেবোত্তরস্বরূপে দেবসেবার নিমিত্ত ...বধিই বর্ষে বর্ষে শারদীয় ...তিরিক্ত কোন অপেক্ষাও অধিক আয়ের সম্পত্তি পূজ নিমিত্ত দান করিলেন, এবং অনেক পূজ প্রভৃতির বেতনস্বরূপ জমি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, দেবমন্দি রাজত্বের অস্থি-স্বরূপ ; মন্দিরপ্রতিষ্ঠার উপর প্রজাগণের মঙ্গলও রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এই কারণে তিনি কেবল রাজধানীতে দেব-সেবার বন্দোবস্ত করিয়াই ... হইলেন না। রাজত্বের নানাস্থানে দেবমূ স্থাপিত ও সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবম্প্রকারে নাড়ুয়ামুঠা পরগণার ৺মদন গোপাল ও দশভূজা মূর্ত্তি এবং দোরো পরগণা ৺রাধাবল্লভ ও শালিগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং সহস্রাধিক মুদ্রা মূল্যের উৎকৃ সম্পত্তি সেবার নিমিত্ত অর্পণ করা হইল এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানাস্থানেও মন্দির ও দেবমূ স্থাপিত হইয়াছিল।

তৎপরে কিশোর নগরের উন্নতির দিকে রাজার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। রসুলপুর নদী মোহানা হইতে সুবর্ণরেখার মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃ পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ বালুকাস্তূপের উত্তর পা কিশোর নগর স্থাপিত। এক্ষণে এই বালুকা রাশি হইতে সমুদ্র অন্যূন তিন ক্রোশ দক্ষি অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু পূর্ব্বকালে স্তূপপা রই দক্ষিণে তরঙ্গায়িত সমুদ্র বিরাজ করিত, এ উত্তরে নিবিড় অরণ্য হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ থাকি কথিত আছে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হা চরণ দাস নামে এক ব্যক্তি কটক হই ভাসিয়া আসিয়া এই বালুকা-তলে উপনী হইয়াছিলেন। পরে বালুকা রাশি উত্তীর্ণ হই জঙ্গল পরিষ্কার করত কিশোর নগর স্থা করেন। সম্ভবতঃ বালুকা-পর্ব্বতের সরস

ত্যকাদেশে তরুলতাদল সততই কিশোর শ্যামল শোভা বিকাশ করিত বলিয়াই ঐ স্থানের কিশোর নগর নাম দিয়াছিলেন। স্থাপনাবধি কিশোর নগর জমিদারবর্গের আবাসস্থান ছিল; কিন্তু কেহই ইহার উন্নতিকল্পে তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই। প্রকৃতির শোভাই ইহাকে নানা-সজ্জায় সাজাইয়া রাখিত। রাজা যাদবরাম তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি মনোরম প্রাসাদ,সুন্দর সরোবর এবং সুদৃঢ় উন্নত প্রাচীরাদি প্রস্তুত করিয়া ইহাকে গড় কিশোর নগরে পরিণত করিলেন।

রাজা যাদবরাম বাল্যাবধিই ব্রাহ্মণের সেবা করিতে ভাল বাসিতেন, এবং তাঁহার হৃদয় পরদুঃখে সততই কাতর হইত। এক্ষণে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রের অভাব মোচন করাই তাঁহার প্রধান ব্রত হইয়া উঠিল। তিনি প্রার্থী দিগকে অজস্র দান করিতে লাগিলেন।

যাদবরামের অদ্ভুত দানশীলতার কথা অচিরে দেশময় প্রচারিত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে নবদ্বীপ,শান্তিপুর,এবং পশ্চিমে কটক,জাজপুর, তুলসীচোরা, মোহনপুর পর্য্যন্ত নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণগণ যাদবরামের নিকট প্রার্থী হইয়া আসিতে লাগিলেন। গয়া ও মথুরাগত উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণগণও সময় সময় তাঁহার দ্বারে দান গ্রহণের নিমিত্ত আগত হইতেন।

যাদবরামের দানের পরিমাণও সামান্য ছিলনা। অবস্থা ও প্রার্থনানুসারে প্রার্থীগণ দুই শত হইতে পাঁচ শত বিঘা পর্যন্ত ভূমিও লাভ করিয়াছেন; তদপ্রদত্ত ভূমি এখনও অনেক গৃহীতার বংশধরেরা ভোগ করিতেছেন। আবার ঐসকল নিষ্কর ভূমি লাখেরাজ স্বরূপ এখনও এ দেশের সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে অনেকে[...] হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে সেসকল দানে[...] সংগ্রহ করা অসম্ভব। লেখক নিজে [...] সংবাদ জানেন, তাহাই নিম্নে পাঠক[...] উপহার দেওয়া গেল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র[...] হইতে কেহ যেন যাদবরামের দান[...] পরিমাণ না করেন।

তুলসীচোরা নিবাসী ফুলমণি ম[...] নিরীহ ব্রাহ্মণ। দূরদেশস্থ ভূসম্পত্তির উপভোগ করা দুরূহ বোধে, তিনি ভূ[...] গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যাদ[...] তাঁহার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে বার্ষিক [...] টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। ফুল[...] বংশধরেরাও বর্ষে বর্ষে ঐ বৃত্তি প[...] আসিয়াছেন।

রামচাঁদ দাস নামে এক ব্যক্তি[...] শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য রাজার নিক[...] সাহায্যের প্রার্থী হয়েন। রাজা তাঁহাকে [...] পাঁচ শত টাকা এবং প্রতিদিন দ্বাদশটী [...] ভোজন করাইবার নিমিত্ত ১৬০ বিঘ[...] ভূমি প্রদান করিলেন। উক্ত দাস [...] বংশধরগণ ভূঁঞামুঠাপরগণার বর্ত্তন [...] গ্রামে বাস করিতেছেন।

একদা রাজা গঙ্গাস্নান করিয়া উঠিতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন, ব[...] বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা দুঃস্থ হইয়া, তাঁহার [...] যাইবার জন্য অভিলাষিনী; কিন্তু তিনি [...] অবস্থিতি করেন, তাহা জানিতে না [...] হতাশ চিত্তে স্বীয় স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার [...] ছেন। যাদবরাম অবিলম্বে তাঁহাদের সম[...] গত হইয়া, গললগ্নবাসে বিনয়-নম্র[...] পরিচয় প্রদান কর[...]

করিতে পারেন, তাহা জানিবার কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে ৫০০ বিঘা জমি দান করেন। সেই ভূমি অদ্যাপি ক নামে পরিচিত। গঙ্গাস্নান উপলক্ষে ই প্রকার দান বিস্তর করিয়াছেন। যোগের সময় সহস্র কার্য্য ত্যাগ করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন। একবার কোনও উপলক্ষে যাদবরাম পাল্‌কী আরোহণে তা যাত্রা করিলেন। তৎকালে কলিকাতা অতি কঠিন ব্যাপার ছিল। বহুদূরবিস্তৃত অরণ্য অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। পথিমধ্যে দুই জন বাহক পীড়িত পড়িল। রাজা তাহাদের সেবার নিমিত্ত ষ্ট বাহকগণকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ক যোগের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার য়, একাকী পদব্রজে অগ্রসর হইলেন। কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম অরণ্যপথে গমন করা কোমল শরীরের পক্ষে অসম্ভব; কণ্ট- তাঁহার চরণদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া, প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাজা আর হইতে না পারিয়া হতাশ হৃদয়ে বসিয়া । অদূরে গম্ভীর প্রধান নামে এক কাষ্ঠ আহরণ করিতেছিল। যাদবরামের কাতরতা দর্শনে, তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া, নিরস্ত্র অবস্থায় অরণ্যে প্রবেশ জন্য তাঁহাকে দয়ার্দ্র চিত্তে স্নেহসিক্ত মিষ্ট ভর্ৎসনা করিল। গম্ভীর রাজাকে আপনার মত কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী বলিয়া মনে করিয়াছিল। অবশেষে আপনার আহৃত কাষ্ঠের অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে লইতে অনু- রোধ করিল। রাজা কাঠুরিয়ার সহৃদয়তা দর্শনে আহ্লাদিত চিত্তে তাহাকে অশেষ ধন্যবাদ দিলেন; এবং তিনি কাষ্ঠ-প্রত্যাশী নহেন, সুপথ দেখাইয়া দিলেই উপকৃত হইবেন বলিলেন। গম্ভীর সম্মত হইয়া অগ্রে পথ দেখাইতে দেখা- ইতে চলিল; কিন্তু রাজা তখন পায়ের বেদনায় অভিভূত, দাঁড়াইতেও অক্ষম হইলেন। তাঁহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কোমল-হৃদয় কাষ্ঠা- জীব তাঁহাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া গমন করিল। রাজা কৃতজ্ঞ চিত্তে প্রত্যুপকার-স্বরূপ গম্ভীরকে প্রচুর অর্থ দান করিলেন; এবং গম্ভীর তাঁহাকে যতদূর পথ বহন করিয়াছিল, দীর্ঘ প্রস্থে সেই পরিমাণ ভূমি তাহাকে চিরস্থায়ী সত্বে দান করিলেন। গম্ভীরের আর কাষ্ঠ-ব্যবসা করিতে হইলনা। তাহার বংশধরগণ দোর ভুবনন পর- গণায় এখনও সেই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড ভোগ করিতেছেন।

ক্রমশঃ

অই তারাটি।

(১)

শুনিনু স্বপনে—
"দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্ অই তারাটি !
কেমন উজ্জ্বলা
অই তারাটি !

কিবা নিরুপমা
দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্ অই তারাটি !
প্রাণ-জ্বালা তোর
হরে কি না দ্যাখ্ অই তারাটি !

দেখে নে দেখে নে
শত আঁখি মেলি অই তারাটি।
কার রূপে দ্যাখ্
উজলা হয়েছে অই তারাটি।

(২)

স্বপনে মেলিনু নেত্র
স্বরগের নীল ক্ষেত্র
পড়িল নয়নে;
মানি নাই কভু যাহা,
মানিলাম আজি তাহা,
স্বর্গ যে গগনে!
স্বর্গে যে চাঁদের খেলা,
স্বর্গে যে তারার মেলা,
মানিনু অন্তরে!
স্বর্গেতে রবির রথ,
স্বর্গে অই ছায়াপথ,
আঁখির উপরে!
শিরঃ ঊর্দ্ধে আঁখি-দৃষ্ট,
স্বর্গ বিধাতার স্বষ্ট,
স্বর্গ তো আকাশে!
মনের মন্দিরে নহে,
(বাতুলে যেমন কহে)
স্বর্গ তো আকাশে!

(৩)

স্বপনে মেলিনু নেত্র,
স্বরগের নীল ক্ষেত্র
পড়িল নয়নে;
চমকে অসংখ্য তারা,
রূপে যেন মাতোয়ারা,
দেখিনু গগনে;
কোটি কোটি তারামাঝে,
একটি তারকা রাজে,—
শান্ত অচঞ্চল!
তরল রজত পারা
তাহে আলোকের ধারা
ঝরে অনর্গল!
আলোক-নির্ঝরমাঝে
বসিয়ে আলোক-সাজে,
আলোক-রূপিণী
হাসিছে আলোক-হাসি,
স্মৃতিমাঝে পড়ে আসি
অতীত-কাহিনী!
প্রেম-বীজ অঙ্কুরিত,
প্রেম-তরু কুসুমিত,
স্বাদু ফল তায়!
ধরণীতে স্বর্গ স্থষ্টি;
সে স্বর্গে শনির দৃষ্টি
অবশেষে হায়!

(৪)

হৃদয়ে নন্দন বন,
মলয়ের সুপবন,
স্থির সৌদামিনী,
অনন্ত বসন্ত কাল,
ফুল ফল সুরসাল,
পূত মন্দাকিনী
এখন অতীত কথা;
বর্ত্তমান প্রাণ-ব্যথা,
প্রাণের কালিমা
হরণ করেছে এবে
(আর না ফিরায়ে দেবে)
প্রাণের পূর্ণিমা!

আলোক-নির্ঝরমাঝে,
বসিয়ে আলোক-সাজে
আলোকরূপিণী
হাসিছে আলোক-হাসি;
স্মৃতিমাঝে পড়ে আসি,
অতীত-কাহিনী !

(৫)

স্বপ্নে শূন্য-সিঁড়ি ধরে,
অই তারাটির তরে,
লাগিনু উঠিতে ,
লঘু হতে লঘুতর
অতিক্রমি' বায়ুস্তর,
বায়ুর গতিতে।
কোথা হ'তে মেঘরাশি
চারিদিকে ঘেরে আসি,
আঁধা ছ নয়ন।
শুনিনু শূন্যের পরে,
কে যেন গম্ভীর স্বরে
কহিল তখন—
"লয়ে জড়-দেহ-বোঝা,
স্বর্গে উঠা নহে সোজা,
মানব অজ্ঞান !
স্বর্গে যদি আছে দৃষ্টি,
কর হৃদে স্বর্গ সৃষ্টি,
পুণ্যে সঁপ প্রাণ !
রয়েছে তোমার(ও) কাছে ,
তোমার(ও)হৃদয়ে আছে
স্বরগে দেখ যে অই তা
আলোকেতে রাখ যত্নে
তোমার সে দিব্য রত্নে ,—
হৃদয় মাঝারে,— অই তা
আঁধারেতে থাকিবেনা ,
আলো বিনা জ্বলিবেনা ,
হৃদয় মাঝারে অই তারাটি !
উন্মূলিত করি পাপ-বাসনানিচয়ে ,
ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলো জ্বালাও হৃদয়ে ;
আলোকিত সে হৃদয়ে ,
পরম যতনে ল'য়ে ,
রাখ চিরকাল অই তারাটি।"

(৬)

স্বপনের শূন্য-সিঁড়ি
সহসা ভাঙ্গিয়া গেল ;
পড়িনু ধরায় !
চমকিয়ে জাগিলাম ,
দেখিনু নির্জ্জন গৃহে
রয়েছি শয্যায় !
এখন (ও) বাজিছে প্রাণে ,
স্বপনের শেষ কথা—
"আলোকিত সে হৃদয়ে ,
পরম যতনে ল'য়ে
রাখ চির কাল অই তারাটি !

প্রকৃতি-পর্য্যালোচনা— ইতর প্রাণী। —(১)

আমাদিগকে কেহ কোন সামান্য দ্রব্য প্রদান করিলে, আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে,তাহার কত গুণানুবাদ করি;দাতার সন্তোষের নিমিত্ত প্রদত্ত দ্রব্যটী , কত যত্ন ও মমতার সহিত ব্যবহার করি। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগের উপকারের নিমিত্ত ও সন্তোষের জন্য

সৌন্দর্য্যপূর্ণ, চন্দ্রতারাসমন্বিত জগৎ গেকে দিয়াছেন; পশু, পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ, স্রোতস্বতী নদী, তরঙ্গা-সমুদ্র, আমাদিগের শিক্ষা, দীক্ষা ও উপ-গর নিমিত্ত দিয়াছেন। আমরা কিন্তু সে ক ক্ষ্য করি না। আমরা চক্ষু থাকিতেও কর্ণ থাকিতেও বধির; সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য া সম্ভোগ করিতে জানি না। জানি না রাই, সৃষ্ট পদার্থের উপযুক্ত আদরও করিতে রি না; এবং বিশ্ব-কারণ পরমেশ্বরের মহতী মা হৃদয়ে ধারণা করিতেও সমর্থ হই না।

এক মাত্র ইতর প্রাণীবৃন্দের প্রতি দৃষ্টি-াত করিলেই বুঝা যায়, শত শত প্রাণী বিবিধ মতে আমাদের কত উপকার সাধন করিতেছে; শিক্ষাও আলোচনার বিস্তৃত ক্ষেত্র নয়নসমক্ষে প্রসারিত করিয়া দিতেছে। প্রাণী-জগৎরূপ সুবৃহৎ পুস্তকের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, অক্ষরে অক্ষরে, কত সৌন্দর্য্য, কত মাধুরী, কত কৌশ-লই বা প্রকাশিত রহিয়াছে! পর্য্যালোচনা না করিলে, বিশ্ব-নিয়ন্তার অপার মহিমা বুঝিতে পারা যায় না; এবং ইতর প্রাণীবৃন্দও যে আমাদিগের মত তাঁহার প্রিয় বস্তু, স্নেহের ও আদরের ধন, তাহাও উপলব্ধি করা যায় না।

আমরা যে দিকে চাই, অনন্ত আকাশ-তলে বিস্তৃত ধরাধাম অগণিত প্রাণীপুঞ্জে পরিপূর্ণ। কেহ জলে নদী তড়াগ ও সমুদ্রে; কেহ স্থলে গিরি, প্রান্তর, নগরাদিতে; কেহ বা আকাশে শূন্যে বায়ুপরি বাস করিতেছে। শীত-প্রধান সুমেরু কুমেরু হইতে গ্রীষ্মমণ্ডলের উত্তাপতপ্ত মরুভূমি পর্য্যন্ত, কোথাও প্রাণীর অভাব নাই। নানা জাতি প্রাণী দলে দলে, পুঞ্জে পুঞ্জে, নানা স্থানে বিচরণ করিতেছে। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, বিশ লক্ষেরও অধিক জাতীয় জীব জগতে বাস করিতেছে; এবং তদনুরূপসংখ্যক ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত, যে বহুসংখ্যক জীব এখনও মানব-চক্ষুতে পতিত হয় নাই। আবার যাহারা দৃষ্ট হইয়াছে, মানবের সীমাবদ্ধ জ্ঞান তাহাদের প্রকৃতিও সম্যক্ অবগত হইতে পারে নাই।

প্রাণীগণ আকারেও নানারূপ। কোন কোন জীব তীক্ষ্ণ অনুবীক্ষণের সাহায্যে পরী-ক্ষিত হইয়াও বিন্দুবৎ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ঈশ্বরের কি অদ্ভুত কৌশল, সেই ক্ষুদ্র দেহেই যান্ত্রিক প্রক্রিয়া চলিতেছে ও জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। আবার মহাকায় হোয়েল ররকোয়েল, পাইথন, কুম্ভীর ও হস্তী প্রভৃতি প্রকাণ্ড জীবেরও অভাব নাই। ৮০। ৯০ ফুট দীর্ঘ হোয়েল, ১২০ফুট দীর্ঘ ররকোয়েল, ৩০ফুট দীর্ঘ পাইথন, ২০ফুট দীর্ঘ কুম্ভীর, ২০ফুট উচ্চ জিরাফ ও পৃথিবীতে অনেক আছে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে প্রকাণ্ড জীব অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীই ধরাতলে প্রতি-নিয়ত অধিকতর পরিবর্ত্তন সাধিত করিতেছে। কি রূপে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র অকিঞ্চিৎকর প্রবাল-কীটকর্ত্তৃক বহুসংখ্যক প্রবালদ্বীপে পরিপূর্ণ, এবং লতা-পুষ্প-পরিশোভিত শস্য-শ্যামল উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া মানবের আবাসস্থান হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে অবাক হইতে হয়। প্রায় সমুদয় সমুদ্রেই এই কীট জন্মিয়া থাকে, কিন্তু প্রবাল-দ্বীপমালা প্রধানতঃ স্থির সমুদ্রেই প্রস্তুত হইতেছে। মৈত্র দ্বীপ, নাবিকদ্বীপ, সামাজিক দ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপ সকল এই কীট কর্ত্তৃকই নির্ম্মিত। এই সকল

দ্বীপ ক্ষুদ্রায়তন নহে ; কোন কোনটী ১০। ১২ ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রশস্ত ; মণ্ডেনদ্বীপ সমুদ্রোপরি ৫৩ হাত উচ্চ, এবং পেম্বিয়া নামে অভিহিত একটী দ্বীপ ৮৩২ হাত উন্নত। ৭৮০০বর্গ মাইল বিস্তৃত ফ্লোরিডা উপদ্বীপও প্রবাল-কীটের পঞ্জর ও দেহাবশেষ হইতে বিনির্ম্মিত হইয়াছে। সুবৃহৎ পারিস নগরী ইনফিউজোরিয়া নামক কীটের দেহ-সমাবেশ ভিন্ন কিছুই নয়।

পুত্তিকানামক কীট মধ্যআফ্রিকার প্রদেশ সকল ক্ষত বিক্ষত করিয়া উর্ব্বর ক্ষেত্র উৎপাদন করিতেছে। কলম্বিয়া দেশের নদী সকল বীবর কর্ত্তৃক স্থানে স্থানে সেতু-বন্ধ হইয়া খণ্ড খণ্ড জলা ভুমিতে পরিণত হইবার উপক্রম হইতেছে।

বাক্টিরিয়া নামক এক জাতীয় অতি ক্ষুদ্র জীবাণু আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা বায়ু-মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। স্থিরীকৃত হইয়াছে,যে নানাবিধ রোগ এই জীবাণু কর্ত্তৃক সঞ্চারিত হইয়া মানবের মৃত্যু সংঘটিত করিতেছে। সিংহ,ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সময়ে সময়ে কোথাও দুই একটী জীবের প্রাণ বধ করে ; কিন্তু এই জীবাণু-দল দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, মনুষ্যকে মৃত্যু-পথে প্রেরণ করিতেছে।

মনুষ্যের ন্যায় ইতর প্রাণীদিগের অনে-কেরই পাঁচটী করিয়া ইন্দ্রিয় আছে বলিয়া অনুমান হয়। কোন কোন জন্তুর শারীরিক যন্ত্র, শিরাবিন্যাস ও অন্যান্য অবস্থা দৃষ্টে পণ্ডি-তেরা বিবেচনা করেন, যে অধিকতর সংখ্যক ইন্দ্রিয় থাকাও অসম্ভব নহে । কতকগুলি প্রাণীর ইন্দ্রিয়ের গঠন-প্রণালী মানুষের ইন্দ্রি-য়ের সদৃশ নহে। কোনকোন জন্তুর চক্ষু পৃষ্ঠে; কাহারও বা কর্ণ চরণে দেখিতে পাও[illegible] চিংড়ি মাছের খড়্গের পার্শ্বে যে লম্বা [illegible] আছে, তাহাই স্পর্শেন্দ্রিয়ের কার্য্য ক[illegible] কোনকোন কীটের পাঁচটী করিয়া চক্ষু থ[illegible] তন্মধ্যে দুইটী,মানুষের মত মস্তকের দুই [illegible] থাকে ; অপর তিনটী ঐ দুইটীর মধ্যে [illegible] গঠনে নির্ম্মিত হইয়াছে। আবার কা[illegible] কাহারও ইন্দ্রিয়বিশেষ মানুষের অ[illegible] প্রবল। কুক্কুরের তীক্ষ্ণ ঘ্রাণ-শক্তি , ঈগ[illegible] গৃধ্রের প্রখর দর্শন-ক্ষমতা এবিষয়ের উ[illegible] দৃষ্টান্ত। বিড়াল অন্ধকারে বেশ দেখিতে পা[illegible] উষ্ট্র দুর হইতে জলের আঘ্রাণ পাইয়া থাকে[illegible]

কোন কোন জাতীয় জীবের দীপ্তি[illegible] বিকাশিকা শক্তি বা ইন্দ্রিয় রহিয়াছে। তাহ[illegible] কখন আহারীয়সংগ্রহে, কখন বা আত্মরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।কেহ কেহ ইচ্ছানুসারে আলোক বিকাশ ও নিবৃত্তি করিতে পারে ; কেহ বা তদ্রূপ পারে না ; সর্ব্বদা বা কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদের অঙ্গবিশেষ হইতে স্বতঃই আলোক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

স্থলচর জন্তুর মধ্যে দীপ-মক্ষিকা প্রথম শ্রেণী, এবং খদ্যোতিকা দ্বিতীয় শ্রেণীর উদা[illegible]হরণ। দীপ-মক্ষিকা, লণ্ঠন পত[illegible] প্রভৃতির আলোক বহুদুরব্যাপী প্রজ্বলিত উল্কাবৎ প্রভাষিত হয়, এবং জোতির্ম্মুগ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদি ঝাঁকে ঝাঁকে মক্ষিকা-মুখে পতিত হইয়া উদরসাৎ হইয়া থাকে।

খদ্যোতিকা আপন ক্ষীণ আভা হইতে[illegible] কোনও উপকার প্রাপ্ত হয় কি না বলা যায় না[illegible] কিন্তু তিমিরাবৃত রজনীতে তরুশিরোপ[illegible] সহস্র হীরকখণ্ডের শোভা বিকাশ কর[illegible] কবিত্ব-স্রোত প্রবাহিত করিয়া , মান[illegible]

প্রভৃতি তাহাদের নিকটে আ...

আকৃতি-বিজ্ঞান

"আকৃতি প্রকৃতির পরিচায়ক", সর্ব্বদেশে এই চিরপ্রসিদ্ধি আছে। "মুখমণ্ডল অন্তঃকরণের প্রতিবিম্ব-ফলিত মুকুর-স্বরূপ," ইংরাজির এই প্রাচীন কথা বাস্তবিক কল্পনা-প্রসূত নহে। কেবল মুখমণ্ডল কেন, অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও মানসিক ভাব প্রতিফলিত হয়, তাহা বোধহয় মনুষ্য মাত্রেই, এমন কি অনেক নীচ জন্তুও কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারে। যাহাকে স্বাভাবিক ভাষা (Natural language) বলে, তাহা কেবল মুখ-মণ্ডল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাবভঙ্গীদ্বারা মানসিক ভাব প্রকাশ করা মাত্র। কুকুর বিড়াল প্রভৃতি নীচ জন্তু,ও সুকুমার-মতি মানব-শিশুও সম্মুখাগত ব্যক্তির আকৃতি দেখিয়া যেন শত্রু-মিত্র-ভাব কতকটা উপলব্ধি করিতে পারে বলিয়া বোধহয়। আবার পরিপক্কবুদ্ধি সংসারী মানব, ব্যবসায়ী, প্রাড়্‌বিবাক্‌, ব্যবহারাজীব প্রভৃতি অভিজ্ঞতাদ্বারা এ বিষয়ে এতদূর ব্যুৎপন্ন হন, যে অনেক সময় মুখের কথাও সাক্ষ্য প্রমাণ অপেক্ষা, তাঁহাদের অনেকে বাহ্যিক আকৃতি ও ভাবভঙ্গীর উপর যেন অধিকতর আস্থা স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। কবিগণ ও উপন্যাস-লেখকগণ তাঁহাদের কাল্পনিক গল্প-সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণের চরিত্র প্রস্ফুটিত করিবার জন্য তাহাদের আকৃতি বর্ণনা ক...। ইঁহাদের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে এতদ্‌বিষয়ক প্রাকৃতিক নিয়মাদি লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে বাহ্যিক আকৃতি-বর্ণনায়, বর্ণিত ব্যক্তির চরিত্রের ছায়া প্রকটিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

আকৃতির সহিত প্রকৃতিগত স... বিষয়ে অনেকেরই আস্থা আছে সত্য; কি... অনেকেই আবার ইহাকে বৈজ্ঞানিক সত... বলিয়া গ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক। অপিচ, ইহা অনেক স্থলে ভ্রমাত্মক, কাল্পনিক এবং যথেষ্ট প্রমাণ-পোষিত নহে বলিয়া, ইহার চর্চ্চা অনাবশ্যক মনে করেন। কিন্তু অনেক বিষয় প্রথমতঃ মানুষের মনে কেবল কল্পনার ন্যায় অপরিস্ফুট ভাবে কুজ্ঝটিকাকারেই উদয় হয়। প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ক্রমশঃ মানুষ তাহারই ভিতর শৃঙ্খলা ও নিয়ম দেখিতে পায়। সেই নিয়মগুলি অন্যান্য স্থলে পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইলেই সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করত বিজ্ঞান নামে অভিহিত করে। সুতরাং বক্ষ্যমান বিষয়টী যে একটী বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, ইহা বলিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না।

বিজ্ঞান-সম্মত প্রাকৃতিক নিয়ম স্থির

* Phrenology ও Physiogmony কে আধুনিক ভাষায় আকৃতি-বিজ্ঞান বলিলে অসঙ্গত হইবে বোধ হয় না।

...য় বালুকামধ্যে

...য়ত করিয়া, সূত্র গুলি বাহির করিয়া রাখে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য তাহা উজ্জ্বল কীট-বোধে সমীপবর্ত্তী হইয়া তৎকর্ত্তৃক ধৃত ও বিনষ্ট হয়।

সূর্য্যরশ্মি সমুদ্র-গর্ভে আট শত হস্ত নিম্নে প্রবেশলাভ করিতে পারে না। পৃথিবীর ...ত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে সূর্য্য-কিরণের অভাব পূরণ করিবার জন্য যেমন দয়াময় পরমেশ্বর মনোরম মেরু-জ্যোতির বিধান করিয়াছেন, সেইরূপ তমসাচ্ছন্ন সমুদ্র-তলে কতকগুলি মৎস্যকে উপরোক্তরূপ দীপ্তি-বিকাশের ক্ষমতা দিয়াছেন। সমুদ্র-গর্ভে বিচরণ করিতে করিতে ইহারা জ্যোতি প্রকাশে সম্মুখস্থ জীবকে আক্রমণ করে, এবং আততায়ী সমীপাগত বুঝিয়া, আলোক-নিবৃত্তি করিয়া, অন্ধকারে শরীর মিশাইয়া দেয়। যাহাদের পুচ্ছ-ভাগে আলোক থাকে, তাহারা বিদ্যুদ্‌বৎ জ্যোতি প্রকাশ করিয়া, শত্রুর চক্ষু ঝলসাইয়া দেয়, এবং সেই উপায়ে আত্ম-রক্ষণে সমর্থ হইয়া থাকে।

সমুদ্র বিহারী কতকগুলি জীবের দর্শনেন্দ্রিয়ের নানা রূপ রূপান্তর হইতে দেখা-যায়। আট শত হস্ত নিম্নে সমুদ্র-তলে যে সকল জীব বাস করে, তাহারা অন্ধ; অথচ ঐ জাতীয় জীব চক্ষুষ্মান্ অবস্থায় উপরিভাগে বাস করিতেছে। গভীরতার পরিমাণ যতই অধিক হয়, ততই দর্শনেন্দ্রিয় ক্ষীণ হইয়া, ...খা গিয়াছে। সমুদ্রের উপরিভাগে ...দের সুন্দর চক্ষু-শলাকা ও তদুপরি উজ্জ্বল চক্ষু স্থাপিত। চারিশত হস্ত নীচে ছয় শত হস্তের মধ্যে উহাদের চক্ষু একেবারেই বিলুপ্ত, কেবল মাত্র শলাকাটি থাকে। তন্নিম্নে ঐ শলাকাও বিকৃত হইয়া, সূক্ষ্মাগ্র চঞ্চুবৎ হইয়া যায়।

জন্তুগণের বর্ণও নানাবিধ। কেহ কেহ বিবেচনা করেন, এই বর্ণ-বৈচিত্র সাধারণতঃ তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্তই হইয়াছে। সিংহের আদি বাস বালুকাময় মরুভূমি; তাহার বর্ণও বালুকার মত; বালুকার উপর শয়ান থাকিলে সহজে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যাঘ্র গভীর অরণ্যে দীর্ঘ তৃণমধ্যে বাস করে; তাহার বর্ণও তদ্রূপ লম্বমান তৃণবৎ রেখাময়। নেকৃড়ে বাঘ ও বন্য বিড়াল অরণ্যে তরু-তলে থাকিতে ভাল বাসে। শাখা পত্র ভেদ করিয়া বিন্দু বিন্দু আলোক যেমন বৃক্ষের উপরে ও তলদেশে পতিত হয়, সেইরূপ তাহাদের দেহও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছায়া ও আলোকের সমাবেশ মাত্র। তবে ক্রমশঃ স্থান ও অবস্থাভেদে সময়ে সময়ে এই নিয়মের এরূপ ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, যে এই মূল তত্ত্বের উপর সর্ব্বদা আস্থা করিতে ইচ্ছা হয় না।

নিরীহ কীট পতঙ্গের বর্ণ সাধারণতঃ ঐ নিয়মের অধীন। কিন্তু কোন কোন জীবে ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা যায়। দয়াময় ঈশ্বর সেখানে অন্যরূপ রক্ষণোপায় করিয়া দিয়াছেন। যাহাদের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, এবং শিরোপরি চক্ষুর মত চিহ্ন রহিয়াছে, তাহারা

করিতে ভ্রম থাকিয়া গেলে,অনেক স্থলে নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ক্রমে,অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমগুলি লক্ষ্যীভূত ও নিরাকৃত হয়। আকৃতি-বিজ্ঞান পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই;সুতরাং ইহাতে ভ্রান্তি লক্ষিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। এই অপূর্ণ অবস্থায়, ভ্রমাত্মক বলিয়া ইহার চর্চ্চা পরিত্যাগ করিলে,এতদ্বিষয়ক কোন সত্যই মানবজ্ঞানের গোচরীভূত হইবার সম্ভাবনা থাকিবেনা।

ভারতবর্ষে অতি পুরাকালেও এবিষয়টী বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত হইয়াছিল; এবং ইহা দুইটী বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছিল; যথা সামুদ্রিক বিজ্ঞান, ও আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান। সামুদ্রিক বিজ্ঞান অর্থে কেবল কর-চিহ্ন দেখিয়া অদৃষ্ট-গণনা নহে। সেবিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে আমরা কাহাকেও অনুরোধ করিতেছি না। মুখমণ্ডল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠনাদি দেখিয়া, প্রকৃতি ও চরিত্র নির্ণয় করাও এই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। ইহা আকৃতি-বিজ্ঞানের এক অংশ। অপরাংশ যাহা ধাতু-প্রকৃতির বিচার-সংস্পৃষ্ট, তাহা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের আলোচ্য; এবং তাহাই এই প্রবন্ধের লিখিতব্য বিষয়। ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এবিষয় এতদূর লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যে তাঁহারা আকৃতির বিশেষত্ব দেখিয়া ধাতু ও প্রকৃতির বিশেষত্ব নিরূপণ করিতে পারিতেন; ও বিশেষ বিশেষ ধাতুর লোকের আকৃতি ও প্রকৃতিরও বিশেষত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় চিকিৎসা-প্রণালী শারীরিক মূল তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মূল তত্ত্ব বা ধাতুর মধ্যে কোনটীর বিকৃতি হেতু কি রূপ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাই আয়ুর্ব্বেদের নির্ণেয় বিষয়; সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থায় কোন্ ধাতুর মনুষ্যের কিরূপ আকার ও প্রকৃতি হইয়া থাকে, ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাহা কম প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানবিৎ কেবল মানবজাতি সম্বন্ধেই এই বিষয়টীর গবেষণা আবদ্ধ রাখেন নাই; পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর জন্তুরাও প্রকৃতি-ভেদে কোন্ ধাতুর মনুষ্যের সহিত তুলনীয়, তাহাও নিশ্চয় করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যদেশ সকলেও গত কয়েক শতাব্দী হইতে এই বিষয়টীকে বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত করিবার কল্পনা হইতেছে। কিন্তু, প্রায় এক শতাব্দী সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে জর্ম্মন ডাক্তার গল মস্তিষ্কের গঠন-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিতে করিতে মানসিক প্রকৃতির সহিত ইহার সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন। এই সময় হইতেই (Phrenology)র সৃষ্টি। ক্রমে মস্তিষ্কব্যতীত অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ লক্ষিত হইয়াছে। এমন কি, নীচ জন্তুদেরও আকৃতিদ্বারা প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে; পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালীতে ধাতু নির্ণয়ের সহিত সম্পর্ক না থাকিলেও,পাশ্চাত্য চিকিৎসাতেও যে আকৃতি-বিজ্ঞান হইতে অনেক সময় ফললাভ হইতে পারে, তাহারও আভাস পাওয়া যাইতেছে। নেলশন সাইজার নামক লব্ধপ্রতিষ্ঠ আকার-বিজ্ঞানবিৎ (Phrenologist) দুইটী ক্ষিপ্ত রোগীকে ইহারই সাহায্যে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন। এই দুইটীর মধ্যে একটী রোগী সকল কথাতেই ভয়ঙ্কর হাস্য করিত; বাতুলালয়ে সাধারণ

চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই। সাইজার সাহেব ইহার রোগবৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে জানিতে পারিলেন যে, এই ব্যক্তি এক বার পড়িয়া গিয়া মস্তকের কোন স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ছিল। তাহার পরেই এইরূপ বাতুলতাগ্রস্ত হয়। তিনি অনুমান করিলেন, মস্তিকের যেখানে আনন্দোদ্দীপক শক্তির স্থান, এব্যক্তি সেই স্থানেই আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন তিনি সেইখানে জলৌকা সন্নিবেশিত করতঃ রোগীকে আরোগ্য করিলেন। অপর রোগীটী স্ত্রীলোক। অস্বাভাবিক মৃত্যুভয়ই ইহার বাতুলতা। কোন বাতুলাশ্রমের রক্ষিকাগণ সাইজর সাহেবের নিকট আপন আপন প্রকৃতি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। সেই সময় এই স্ত্রীলোকটীও আপন প্রকৃতি জিজ্ঞাসা করিল। সাইজার সাহেব ইহাকে বাতুল বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ইহাকে বলিলেন, "তোমার স্বাস্থ্য অতি উৎকৃষ্ট, ও বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা অতি বলবতী।" একজন রক্ষিকা বলিলেন, "মহাশয়, ইনি এই আশ্রমের একজন রোগী; মৃত্যু-ভয়ই ইঁহার রোগলক্ষণ।" সাহেব কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া, কেবল ইহার ঐ অস্বাভাবিক বিশ্বাস-পরিবর্ত্তনদ্বারাই এই স্ত্রীলোককে আরোগ্য করিলেন।

ক্রমশঃ

প্রেম ও বল।

বলশালী হইবার বাসনা সকলেরই দেখিতে পাওয়া যায়। বলশালী হইতে পারিলেই জীবন সফল, এবং জন্ম সার্থক হইল বলিয়া, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে সকলেরই বিশ্বাস। বলশালী ব্যক্তিকে কৃতী, সুখী, আদরণীয় এবং সমাজের পরিচালক বলিয়া সকলেই সম্মান করে। যাহার যত বল, তাহার তত প্রতিপত্তি। সকলেই তাহার অনুগত, সকলেই তাহার আজ্ঞাবহ। সে ব্যক্তি পুষ্করিণীর এক প্রান্তের জল অপর প্রান্তের অপেক্ষা উচ্চতর বলিলে, সহস্র কণ্ঠ হইতে তাহার প্রতিধ্বনি উত্থিত হইবে; এবং যে ব্যক্তি তাহার প্রতিবাদ করিবে, চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র চক্ষুর তীব্র বিদ্রূপময়ী ভ্রূকুটী, এবং কর্কশ তিরস্কার তাহার প্রতি বর্ষিত হইবে। সর্ব্বত্রই লোকে জানে,—"যার লাঠি, তারই মাটী।" এই বলের প্রার্থী সকলেই। প্রতিদিন কোটী কোটী হৃদয় হইতে একমাত্র প্রার্থনা উত্থিত হইতেছে— "বল দাও"; শত সহস্র দেব মন্দিরেএই এক মাত্র বর যাচিত হইতেছে।

বাহুবল, ধনবল, জনবল, বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল,— এই সকল বলই মানুষ প্রতিনিয়ত চাহিতেছে। এ সকল যাহার আছে, তাহার আর অভাব কি? তাহার মত সৌভাগ্যশালী আর কে? এ সকল যার নাই, তার জন্মই বৃথা, জীবন মৃত্যু দুই সমান।

সংসারে 'ছোট' হইয়া থাকিতে কে ইচ্ছা করে? সকলেই বড় হইতে চায়। সকলেরই ইচ্ছা হয়, যে অপর সকলে তাহার অনুগত, আজ্ঞাবহ ওসেবক হইয়া থাকুক। এই অভিলাষ যে সংসারের মানব মাত্রেরই মনে রহিয়াছে, ইতিহাস এবং দৈনিক অভিজ্ঞতায় তাহার সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই আকাঙ্ক্ষার আবার নির্দ্দিষ্ট সীমা

নাই। যে ব্যক্তি যত বল লাভ করে, ততই তাহার বললিপ্সা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। যাবৎ সসাগরা ধরা তাহার প্রতাপসন্নিধানে প্রণতা না হয়, তাবৎ তাহার শান্তি-লাভ ঘটে না।

মানবমণ্ডলীর উপর আধিপত্য স্থাপনের জন্য প্রতিনিয়ত কত ব্যক্তিই না চেষ্টা করিতেছে। সময় সময় পৃথিবীতে এক এক জন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ পুরুষের আবির্ভাব হয়,—যাহার অপ্রতিহত বল-প্রভাবে কোটী কোটী নরনারী পদানত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করিতে থাকে। প্রভূত বলশালী দিগ্বিজয়ী বীরগণ সৈন্য ও অস্ত্র-বলে কত সহস্র সহস্র নরশোণিতে ধরিত্রীকে প্লাবিত করিয়া, লক্ষ লক্ষ নরনারীকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতেছেন। দেশ দেশান্তরে তাঁহাদের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়া তাঁহাদের ভুজ-প্রতাপ ঘোষণা করিতেছে। তাঁহাদিগের অভিলাষ কণ্ঠনিঃসৃত না হইতেই সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাহা পরিপূর্ণ করিতে ধাবিত হইতেছে। তাঁহাদের ইচ্ছামাত্রে কত নগর শ্মশানে, ও কত অরণ্য নগরে পরিণত হইতেছে। কত নৃপতির মুকুট তাঁহাদের পাদ-পীঠস্বরূপ হইতেছে; এবং কত রাজরাণী তাঁহাদের আজ্ঞাকারিণী হইয়াও আত্মশ্লাঘা করিতেছেন। তাঁহাদিগের বিন্দুমাত্র অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে, যেন স্বর্গাপেক্ষাও উচ্চতর পদবীলাভ হইল বলিয়া সকলে মনে করিতেছে। কেবল বল-প্রতাপেই লোকে তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে। কিন্তু সংসারের বল কখনও চির-স্থায়ী নহে; আর এখানে কেহই অপরের পদানত হইয়া থাকিতেও ইচ্ছুক নহে। সর্ব্বসংহারক কালের দণ্ডতাড়নে সর্ব্ববিধ পার্থিব বলই চূর্ণীকৃত হইয়া যায়। তখন এ সকল বলের চিহ্ন-মাত্রও দৃষ্টিগোচর হয়না। আরাকৃসিস্, আলেকজণ্ডার, ডেরায়স, নাদির সা, আরাঞ্জীব ও নেপোলিয়ান প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী বীরদিগের ইতিবৃত্ত শিক্ষিত লোকমাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহাদের সে ভুজবল, সে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, সে অসাধারণ রণকৌশলের পরিণাম কি হইল? তৃণের অগ্নি যেমন হু হু করিয়া জ্বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই ভস্মে পরিণত হয়, ও সামান্য বায়ু-তাড়নেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তাঁহাদের বলও তেমনি অল্পকালমধ্যে পৃ-থীকে আলোড়িত করিয়া, দে-[illegible] অতি ক্ষুদ্র ঘটনার [illegible] গিয়াছে। কোথায় বা তাঁহাদের সে আ[illegible] কোথায় বা তাঁহাদের সে প্রভুশক্তি কো[illegible] বাসে ত্রাসোৎপাদক বীরদর্প ও ভুজবল। [illegible] দশায় সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহাদের নি[illegible] কামনা করিয়াছে; পতনেও তাহারা আন[illegible] হইয়াছে। ইতিহাস তাঁহাদের দুরাকাঙ্ক্ষা ও পরাক্রমের অসারতাই কীর্ত্তন করিতেছে। তাঁহাদের জীবন পার্থিব বলের অকিঞ্চিৎ-করত্বের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লিখিত হইতেছে। জ্ঞানীগণ তাঁহাদিগকে নিতান্ত দুরাকাঙ্ক্ষী বর্ব্বর ও নরজাতির উৎ-পাত-স্বরূপ বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন। যেমন বায়ুমধ্যে কিম্বা জলোপরি খড়্গাঘাতের কোনও চিহ্নই থাকে না, তেমনই এই সকল পার্থিব বলের কোন চিহ্ন মনুষ্য-সমাজে স্থায়ী হয় না। এসকল বললাভ করিয়াও প্রকৃতপক্ষে মানুষের দুর্ব্বলতা দূরীকৃত হয় না, আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়না কাহাকেও আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা ও জন্মেনা।

কিন্তু বিশ্ব-বিধাতা মানবের হৃদয়[illegible]

ন্তরে একটী অপার্থিব বলের বীজ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করিতে পারিলে,মানুষ অক্ষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। সে বল কালের অধীন নহে; তাহা মৃত্যুঞ্জিৎ। কালবশে ক্ষীণ না হইয়া তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ও প্রসারিত হইতে থাকে। যতই দিন যায়, ততই নরনারীগণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া,তাহার প্রাধান্য স্বীকার করত, অধীনতা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতে থাকে। প্রেমই সেই অলোক-সম্ভব স্বর্গীয়, ... নিত্যবর্দ্ধনশীল ও সর্ব্ববিজয়ী বল। ... আছে, তিনিই প্রকৃত বলশালী ... সকলের পূজনীয়। এই ... নিকট সকলেই অধীনতা স্বীকার ...র,— এ শৃঙ্খলে দুর্দ্দান্ত দৈত্যকেও বাঁধিয়া ...া যায়। পার্থিব বলের ন্যায় ইহার প্রসার অস্তিত্ব চর্ম্মচক্ষুর গোচর নহে বটে, কিন্তু ... লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া, মায়া-যোদ্ধা ইন্দ্রজিতের ন্যায় শত্রুকে নাগপাশে আবদ্ধ করে। লোকে ইহার আপাত-বিজয় দেখিতে না পাইয়া, ইহার ক্ষমতাকে তুচ্ছ করে; কিন্তু তৃণরাশি-পরিবৃত অগ্নির ন্যায়,ইহা ক্রমশঃ বলবত্তর হইয়া, অবশেষে সকল বাধা বিঘ্নকে পরাজিত করত আপন তেজ বিকীর্ণ করে। প্রেম সম্রাটকে ভিখারীর দাস করে; পণ্ডিত-কে নিরক্ষর ব্যক্তির শিষ্য করে এবং দিগ্বিজয়ী বীরকে অকিঞ্চনের পদানত করে।

সূত্রধরপুত্র যীশু, খনক-পুত্র মার্টিন লুথার, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-তনয় শ্রীগৌরাঙ্গ, রাজ্য-ত্যাগী ভিক্ষু শাক্য সিংহ, বনিগ্‌ভৃত্য মহম্মদ, তন্তুবায়-পালিত কবীর, লবণ-বিক্রেতা নানক ... প্রেমবীরদিগের জীবন ও চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে, প্রেমের অদ্ভুত, অপরিসীম, অলৌকিক বলের পরিচয় পাইয়া অবাক হইতে হয়। ইহারা গৃহহীন,নিরন্ন,নিঃসহায়,সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াও, সহস্র সহস্র নরনারীর প্রতি-রোধ ও প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতিগণের শত্রুতা অগ্রাহ্য করিয়া, এবং দেশপূজিত পণ্ডিতগণের কুটীল তর্কজাল ছিন্ন করিয়া, জীবের দুঃখে ব্যথিত প্রাণে পরিত্রাণের মন্ত্র প্রচারিত করি-য়াছেন। লোকের দ্বারে দ্বারে দন্তে তৃণ লইয়া, সকলের চরণে ধরিয়া, সত্যামৃত ও প্রেম-সুধা পান করাইয়াছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়া গেল, অদ্যাপি সমগ্র পৃথিবীর নরনারীগণ তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিতেছে; তাঁহাদের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, ধন জন, সুখ সম্পদ, আত্মীয় স্বজন, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত অকাতরে পরিত্যাগ করিতেছে; সজনে নির্জ্জনে, স্বদেশে বিদেশে, সম্পদে বিপদে, তাঁহাদের নামগুণকীর্ত্তন ও চরিত্র ধ্যান করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছে। তাঁহাদিগের অনুগত দাস হইতে পারা পর্ণ-কুটীরবাসী ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র হইতে সম্রাটগণ, এবং নিরক্ষর কৃষক হইতে মহা পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত জীবনের পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেছেন। যতই দিন যাইতেছে, কাল-চক্রের ভীষণ নিষ্পেষণে পৃথিবীর সকল বলই লুপ্ত হইতেছে; কিন্তু মানবজাতির হৃদয়-রাজ্যে এই ফকীরদলের রাজত্ব উত্তরোত্তর প্রসারই লাভ করিতেছে। এই যে অদ্ভুত দিগ্বিজয়, ইহা কোন্ বলে সম্পাদিত হইয়াছে? কোন্ অলৌকিক অস্ত্রে ইহারা মানবজাতিকে পদানত করিলেন? কোন্ অমর্ত্ত্যসুলভ শৃঙ্খলে ইহারা মানব-

জাতির উদ্দাম হৃদয়কে আবদ্ধ করিলেন? কোন্ মোহমন্ত্রে ইঁহারা প্রচণ্ড দৈত্যসম উচ্ছৃঙ্খল মানবজাতির দুর্দ্দমনীয় বাসনা-চঞ্চল মন প্রাণ আয়ত্ত করিলেন? কোন্ অনন্ত-পরিজ্ঞাত কৌশলে ইঁহারা এই নশ্বর, ক্ষণ-ভঙ্গুর, মৃত্যুময় সংসারে অচঞ্চল, অক্ষয়, অবিনশ্বর, চিরপ্রসারণশীল রাজত্ব স্থাপনে সমর্থ হইলেন? বিশ্বপতি জগৎপিতা, এবং তাঁহার পুত্রকন্যাগণের প্রতি অসীম প্রেমই ইঁহাদের একমাত্র বল, সহায়, অস্ত্র, কৌশল এবং মহামন্ত্র।

মানব-হৃদয়কে আয়ত্ত করিতে প্রেমের তুল্য অন্য কৌশল নাই। পরকে আপন করিতে, শত্রুকে মিত্র করিতে, দুর্দ্দান্তকে বশীভূত করিতে, উচ্ছৃঙ্খলকে সংযত করিতে, প্রাণবিনাশোদ্যত দস্যুকে সেবক করিতে, পাপীকে পুণ্যাত্মা করিতে, দুঃখীকে সুখী করিতে, মৃত প্রাণ সঞ্জীবিত করিতে, পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিতে, প্রেম ভিন্ন আর কোন্ বলে পারা যায়? সর্ব্ব প্রকার অভিমান, অহঙ্কার ও ভেদাভেদ চূর্ণ করিয়া, সর্ব্বত্র সমভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার আর উপায়ান্তর নাই। মনুষ্যের কথা কি, বিষধর ভুজঙ্গ এবং স্বভাবতঃ হিংস্র সিংহ ব্যাঘ ভল্লুকাদি ভীষণ জীবগণ পর্য্যন্ত প্রেমে বশী-ভূত হয়। অবিশ্বাস-কলুষিত সংসারের যুদ্ধবিগ্রহেও সাম ও দান রূপে এই প্রেমের ছলনাই সমধিক কার্য্যকরী হইতেছে।

যাহাকে প্রেমে আবদ্ধ করিতে পার, সে অযাচিত হইয়াও, তোমাকে হৃদয়, মন, সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া, তোমার দাস হইয়া যাইবে। তখন তোমার খড়্গাঘাত তাহার নিকট পুষ্পবৃষ্টিতুল্য বোধ [illegible] অকাতরে জীবন দান করিয়াও সে পরম সুখ [illegible] হইবে। তোমার শরীরবিদ্ধ কণ্টকটি নিষ্কাশ[illegible] করিতে প্রাণটী দিতেও সে কুণ্ঠিত হইবে না তোমার সুখই তাহার জীবনের লক্ষ্য হইবে তোমার দুঃখ তাহার মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণাদায়ক হইবে। অর্থদাস, অন্নদাস কিম্বা বিজিতদাস কি কখনও এরূপ হইতে পারে? অর্থ কিম্বা অপর কোন প্রত্যাশায় যে তোমার সেবকত্ব স্বীকার করে, সে স্বীয় স্বার্থ সাধনের জন্যই ব্যস্ত; তোমার স্বার্থ যদি তাহার নিজ স্বার্থের সাক্ষাৎ ভাবে অনুকূল না হয়, সে তোমার দিকে চাহিবে কেন? আর যখন তাহার স্বার্থ সাধি[illegible] হইবে, তখনই বা সে তোমাকে আর সেবা করিবে কেন? সে ব্যক্তি তো অন্তরে অন্তরে তোমার ঐ অবস্থাটীর প্রতি ঈর্ষা করে, এবং স্বয়ং যাহাতে তোমাকে অতিক্রম করিতে পারে, তদনুরূপ চেষ্টাই করে। সে কদাচ তোমার আপনার হইতে পারে না।

যাহারা ধনাভিমানে মত্ত হইয়া, বা পদগৌরবে অন্ধ হইয়া নরনারীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, এবং মনে করে তাহাদের ক্ষম[illegible] তা ও অর্থের বলেই সকলে তাহাদের পদানত ও অনুগত হইয়া তাহাদিগের ভোগ-সুখ সাধনে চিরদিন ব্যাপৃত থাকিবে, তাহা-দিগকে অচিরে দুর্দ্দশাগ্রস্ত, অপদস্থ এবং অধঃপতিত হইয়া আত্মভ্রম বুঝিয়া হাহা[illegible] করিতে হয়। পার্থিববলাভি[illegible] ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়াই [illegible] প্রশান্ত করিয়া দেয়। তাহাদিগকে [illegible] সংসারে [illegible]

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বিগত ৯ই ডিসেম্বর তারিখে মেদিনীপুর ডষ্ট্রীক্ট বোর্ডের একটী অধিবেশন হইয়াছিল। জেলার মাজিষ্ট্রেটও চেয়ারমেন ব্রাইট্ সাহেব বাহাদুর প্রত্যেক মেম্বরকে স্ব স্ব স্থানের ফসলের বিবরণ সম্বন্ধে স্বীয় স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে উপস্থিত মেম্বর মহাশয়গণ জেলার সকল মহকুমার ধান্য ফসলের অবস্থা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাহাদুর ও মেম্বর মহাশয়গণের বিবেচনায় এ জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে পরিমাণ ধান্য ফসল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। মোটা মুটি ভাবে দেখা যায় যে মেদিনীপুর জেলায় ‌॥০ আনা ফসল হইবে। কিন্তু মেদিনীপুরের জঙ্গল বিভাগে বিনপুর থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহে ইতিমধ্যেই অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে। সদাশয় মাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর ঐ থানার এলাকায় দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকের কষ্ট নিবারণজন্য বন্দোবস্ত করিতেছেন।

মেদিনীপুর সদর	॥০ আনা ফসল
দাঁতন	॥০ আনা
কাঁথি	৸০ আনা
তমলুক	॥৵০ কিং৸০ আনা
গড়বেতা	॥০ আনা
ঘাঁটাল	॥৵০ আনা

বিগত নবেম্বর মাসের সেশনে, মেদিনী- আদালতে একটি ডাকাতির ...র হয়। কেশপুর থানার ...র্শবর্ত্তী গ্রামের কয়েক ...তির অপরাধে ...প্রায় ১৫০ ...ও তাহার স্ত্রীকে মারপিট করিয়া গৃহস্থিত সোণা রূপার অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি চুরি করিয়া লইয়া পলায়। ফরিয়াদির পক্ষের লোক কেশপুর থানায় সংবাদ দিলে, পুলিশ-কর্ম্মচারী পঞ্চমী গ্রামে উপস্থিত হইয়া ফরিয়াদীর এজাহার গ্রহণ করতঃ তদন্তে প্রবৃত্ত হন। ক্রমশঃ মেদিনীপুর সদর থানার সব্ ইন্‌স্পেক্‌টর ও ইন্‌স্পেক্‌টর তথায় তদারক করেন। আসামীগণ গ্রেপ্তার হইয়াছিল। অধিকাংশ আসামীর নিকট মাল পাওয়া যায়। ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার সহকারী সাহেব তদারকস্থলে উপস্থিত ছিলেন। একজন ডাকাতের পদচিহ্নের সহিত ফরিয়াদির বাটীতে প্রাপ্ত লেপের উপরিস্থিত পদচিহ্নের মিল হয়। শ্রীগুলুখাঁ নামক আসামীর স্ত্রীর মুখের ভিতর ও কেশের ভিতর হইতে তাবিজের অংশ পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই মোকদ্দমার বিচারে আসামীগণ কেহ দুই বৎসর কেহ তিন বৎসর মিঞাদপ্রাপ্ত হইয়াছে। পঞ্চমী গ্রামে অনেক গুলি মুসলমানের বাস। তন্মধ্যে সম্প্রতি দুইটী দল হইয়াছে। কয়েকটী লোকের নাম বদমাইসি খাতায় লিখিত হইয়াছে।

কাঁথিতে স্থানীয় ভদ্র মহোদয়দিগের চেষ্টায় একটী হরিসভা স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। একটী বড় হল এবং তৎসঙ্গে একটী পুস্তকালয় থাকিবে। প্রায় ৬৫০০৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, এবং প্রায় ৩৩০০৲ টাকা আদায় হইয়াছে। ...ভা-গৃহের জন্য স্থানও মনোনীত হইয়াছে। বাড়ী প্রস্তুতের উদ্যোগ হইতেছে।

রাজা যাদবরাম রায়।

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

যাদবরাম ব্রাহ্মণকে দেবতার অংশ জ্ঞান করিতেন। ব্রাহ্মণের বিরাগ বা অসন্তোষ রাজ্যের অমঙ্গল-জনক বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ব্রাহ্মণের অত্যাচারও তিনি শুভাশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে করিতেন। একদা তিনি বরাহ-নগরে অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহার এই অনুপস্থিতির সুযোগে মহিষাদলের ব্রাহ্মণ রাজা দোরো পরগণার এক খণ্ড ভূমি বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। যাদবরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুঙার নারায়ণ এই অন্যায় ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। এই সংবাদ বরাহনগরে যাদবরামের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি অবিলম্বে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পথিমধ্যে কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্‌যোগ করার নিমিত্ত তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া অনেক তিরস্কার করতঃ গৃহে ফিরাইয়া দিলেন; এবং ব্রাহ্মণ রাজা ভূমিগ্রহণে তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছেন বলিয়া, নানা প্রকার বিনয়-বাক্যপূর্ণ পত্র লিখিয়া মহিষাদলের রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন।

যাদবরামের অচলা ব্রাহ্মণ-ভক্তির দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরও একটী ঘটনা বিবৃত করিতেছি। তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। তৎ-কালে এক্ষণকার মত সমুদ্র-তীরে বাঁধ ছিল না। সময়ে সময়ে সমুদ্র উথলিয়া প্রবল বন্যায় দেশের সমস্ত শস্যরাশি বিনষ্ট করিত। প্রজা-গণ সমুদ্র-কূলে বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দেওয়ার জন্য, যাদবরামের নিকট আবেদন করিল। যাদবরাম বাঁধ না দিয়া,ঐ অংশের সমগ্র ভূমি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন; এবং প্রজা-গণকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন, " মাটীর বাঁধ তরঙ্গাঘাতে সময়ে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মোত্তর জমীতে সমুদ্র কখনও অগ্রসর হইবে না। সুতরাং প্রজাদের আর কখনই ভয়ের কারণ রহিল না।"বিস্ময়ের বিষয় এই, যে তাঁহার রাজত্বকালের মধ্যে আর কখনও লবণাম্বু হইতে ঐসকল জমীতে কোন অনিষ্টাপাত হয় নাই।

হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিকেই তিনি নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। অপর ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার বিদ্বেষ ছিলনা। তিনি বলিতেন; " যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন, ভক্তি ও বিশ্বাস ভিন্ন কখনই ধর্ম্মোন্নতি বা পরকালে সদ্গতি লাভ করিতে পারিবেন না। " রাজ্য-মধ্যে তাঁহার একাধিপত্যসত্বেও তিনি মুসলমানদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানে বলপূর্ব্বক কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া,স্বীয় ধর্ম্মানু-রাগ প্রকাশ করিতেন না। মিষ্ট কথা, সদুপ-দেশ এবং মৈত্রীই তাঁহার মন্ত্র-স্বরূপ ছিল। এই সকল উপায়েই তিনি সকলকে বশীভূত রাখিতেন।

এক দিবস যাদবরাম স্নান করিতেছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন, কতিপয় মুসল-মান একটী গাভী ক্রয় করিয়া বলিপ্রদানের জন্য লইয়া যাইতেছে। তিনি সত্বর গমনে সেই মুসলমানদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া, সস্নেহ বচনে গাভীটি ভিক্ষা চাহিলেন। তাহারা গাভীর মূল্য প্রার্থনা করিল। রাজা তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত মূল্যের চতুর্গুণ অর্থ প্রদান করি-লেন। আর

না, এই শপথ করায়, তাহাদিগকে ৬০০ বিঘা ভূমি লাখেরাজস্বরূপ পুরস্কার দিলেন।

যাদবরামের দানের সীমা ছিলনা। অর্থী কখনও তাঁহার দ্বারে বিফলমনোরথ হয় নাই। প্রতিদিন দান না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না।

এই প্রকারে মুক্ত হস্তে দান করিতে করিতে;ক্রমে তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট ভূমি দানগ্রহীতাদিগের নিকর হইয়া পড়িল।

ক্রমে তাঁহার এই দানশীলতার কথা মুর্শিদাবাদের নবাবের কর্ণে পৌঁছিল। এইরূপ দানে যে রাজ্যের ভাবী রাজস্বের অবনতি হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সুতরাং নবাব এ সংবাদে বিরক্ত হইবেন বিচিত্র কি? তথাপি, যতদিন মস্তাফা খাঁ জীবিত ছিলেন, ততদিন, কেহই যাদবরামের শত্রুতাচরণ করিতে পারে নাই। কিন্তু মস্তাফাখাঁ চিরজীবী নহেন। তিনি পরলোকগত হইলে, পার্ব্বতীচরণের মুর্শিদাবাদবাসী আত্মীয়বর্গের চেষ্টায় যাদবরামের প্রতি নবাবের অপ্রসন্নতা জন্মিল। নবাব যাদবরামকে মুর্শিদাবাদের দরবারে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন।

যাদবরাম নবাব-দরবারে উপস্থিত হইলেন। নবাব তাঁহাকে প্রদত্ত সম্পত্তিসকল প্রতিগ্রহণ করিতে অনুজ্ঞা, এবং ভবিষ্যতে অপর কাহাকেও সম্পত্তি দান করিতে নিষেধ করিলেন।

স্বধর্ম্মনিরত, বিশ্বাসী যাদবরাম নবাবের উক্ত আদেশের প্রত্যুত্তরে নির্ভীকচিত্তে [illegible] দান-প্রতিগ্রহীতার [illegible] নবাবের ঈদৃশ আদেশ প্রতিপালনে অসমর্থ। আর, আমি প্রতিদিন পর্য্যাপ্ত দান না করিয়া জলস্পর্শ করি না, সুতরাং দান না করিয়া আমি জীবনধারণও করিতে পারিব না।”

নবাব এতাদৃশ প্রত্যুত্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া, যাদবরামকে আবক্ষ মৃত্তিকাগর্ত্তে প্রোথিত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন, “সমুদ্রতীরবাসী জমিদার কি রূপে বিনা দানে জলগ্রহণ না করে, দেখিব।”

নবাবের আদেশ কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইলনা;— দানবীর যাদবরাম মৃত্তিকামধ্যে আবক্ষ প্রোথিত হইলেন। প্রখর সূর্য্য-কিরণ তাঁহার অনাবৃত মস্তকে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু বিশ্বাসী যাদবরাম প্রসন্ন অন্তঃকরণে, অকাতরে তাহা সহ্য করত, ঊর্দ্ধমুখে অভীষ্ট দেবতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, অনন্যমনে তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন।

এই সংবাদ অনতিবিলম্বে চারিদিকে প্রচারিত হইলে, বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য উপনীত হইলেন। যাদবরাম গাঢ় ভক্তির সহিত সকলকে অভিবাদন করিলেন; এবং দৈব-দুর্ব্বিপাকে বিপন্ন হইয়া, আজ ব্রাহ্মণ-সেবায় বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জল-যোগ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি তখন হস্তস্থিত হীরকাঙ্গুরীয় ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া, তাঁহাদিগের চরণোদক মাত্র পান করিয়াই তৃপ্ত হইলেন।

পরদিন নবাব-গোচরে যাদবরামের এই দান-বৃত্তান্ত বিবৃত হইল। নবাব অদ্য তাঁহার গ্রীবা পর্য্যন্ত প্রোথিত করিতে আদেশ

দিলেন।

নবাবের আদেশে,বিস্তৃত,অনাবৃত বধ্যভূমিতে যাদবরাম আকণ্ঠ প্রোথিত হইলেন; মস্তকটীমাত্র মাটীর উপরে রহিল।

বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় শ্রীক্ষেত্রাগত এক ব্রাহ্মণ রাজার নিকট গিয়া, তাঁহার ঈদৃশী দুর্দ্দশাদর্শনে, ব্যথিত চিত্তে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত আলাপে রাজা জানিতে পারিলেন,যে ঐ ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ দান-প্রাপ্তির আশায় যাদবরামের রাজধানীতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এক্ষণ মৃত্যুর করাল গ্রাসে আপতিত; এ অবস্থায় ব্রাহ্মণকে যে কি দান করিবেন; দান করিলেইবা তাঁহার অন্তে, কোন্ বলে ব্রাহ্মণ সেই দান উপভোগ করিতে পারিবেন,এই সকল ভাবিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে,তিনি ব্রাহ্মণের নিকট এক গাছি তৃণ প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণ কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে তাঁহাকে একটী তৃণ দিলেন। যাদবরাম দন্তদংশনে জিহ্বা ছেদন করিয়া, সেই শোণিত লইয়া, ঐ তৃণগাছটী মুখে ধারণ করত,ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত একটী পত্রোপরি "বার বাটী বাস্তদান" এই কথাটী লিখিয়া, ২৪০ বিঘা পরিসর বিস্তৃত রাজপুরী ব্রাহ্মণকে দান করিলেন।

যথাকালে এ সংবাদও নবাবের কর্ণগোচর হইল। রাজার এই অদ্ভুত চরিত্রদর্শনে নবাবের হৃদয় দ্রবীভূত হইল! "সমুদ্র তীরবাসী জমিদার"কে নবাব যে পরীক্ষা করিলেন,যাদব রাম তাহাতে ভীত হইবার লোক নহেন দেখিয়া,তৎপ্রতি নবাবের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইল। সদ্ভাবের নিকট বিদ্বেষ পরাজিত হইল। নবাব মহাসমাদরে যাদবরামের অভ্যর্থনা করত তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রতিপ্রেরণ করিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে শেষোক্ত এই ব্রাহ্মণেরও সহৃদয়তার কথা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। ব্রাহ্মণ দানপ্রাপ্ত রাজপুরী একটাকা মাত্র রাজস্ব ধার্য্য করিয়া যাদবরামকে প্রজারূপে তাহাতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বীয় মহানুভাবতার পরিচয় প্রদান করিলেন।

ক্রমশঃ

বিষয়ানন্দের অর্থ-নীতি।

অনেকে বলেন, "অর্থই অনর্থের মূল"; কিন্তু আমি বলি, এই মত যারপর নাই স্বার্থবিরোধী—অতীব ভ্রমাত্মক—নিতান্ত অযৌক্তিক। এই সব মনিষী অপেক্ষা বরং বিদ্যাসুন্দরের হীরামালিনীও যে অধিকতর বুদ্ধিমতী ও বিবেকশালিনী ছিল, ইহা স্থির নিশ্চয়। হীরা বলিয়াছে —

" কড়ী ফট্‌কা চিড়া দই, বন্ধু নাই কড়ী বই,
কড়ীতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়ীতে বুড়ার বিয়া, কড়ীলোভে মরে গিয়া,
কুলবধূ ভুলে কড়ী দিলে।"

সুতরাং হীরাই যে সর্ব্বসুখবিধায়ক অর্থের মহিমা-জ্ঞানে সক্ষম হইয়াছিল, ইহা বলা অত্যুক্তি মাত্র। মান বল—সম্ভ্রম বল—বল বল —বুদ্ধি বল —খাতির বল—প্রতিপত্তি বল, সকলই অর্থ-সাপেক্ষ; এহেন অর্থকে অনর্থের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করা কি কম ধৃষ্টতা! অর্থইত সকল সুখের মূল! অর্থ বিনা কোন কার্য্যই সুসাধ্য নহে। অর্থে অশীতিপর বৃদ্ধের সহিতও সদ্য-প্রস্ফুটা পরমলাবণ্যবতী কন্যার শুভ পরিণয় সুসাধ্য;অর্থে কুরূপ,কদর্য্য, কুশ্রী পুরুষও মনসিজসদৃশ [illegible]

সমাদৃত; অর্থে—হস্তীমূর্খও ষড়শাস্ত্রবিশারদ ত্রিকালজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত; অর্থে কাণ্ডজ্ঞানবিহীন, অকালকুষ্মাণ্ডগণও অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বলিয়া সর্ব্বত্র মান্য; কর্ণভেদী গভীর বজ্র-নির্ঘোষেও যিনি টিক-টিকি পড়িল ভাবিয়া, ভুমিতে তিনটী টক্কর মারেন, অর্থে এরূপ ভীষণ বধিরও প্রখর শ্রবণশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র গৃহীত; অর্থে কুম্ভকর্ণসদৃশ নিদ্রাপ্রিয় ও উদর-সর্ব্বস্ব জড়ভরতগণও লক্ষ্মণতুল্য সংযমী বলিয়া সর্ব্বত্র আরাধ্য। যিনি এই সর্ব্বসুখ-বিধায়ক অর্থের উপর বীতানুরাগ, তাঁহার ন্যায় অর্ব্বাচীন সংসারে আর কে? তিনি মনুষ্য নামের অনধিকারী।

অর্থই সাংসারিক যাবতীয় কার্য্যের একমাত্র সহায়। সুতরাং যাহাতে অর্থাগম হয়—যাহাতে দুই পয়সার সংস্থান হয়, তদ্বিষয়ে সকলেরই বিশেষ যত্নবান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থোপার্জ্জন সহজ; কিন্তু অর্থ সঞ্চয় করা তত সহজ নহে। অর্থসঞ্চয়রূপ গূঢ় রহস্যের গূঢ় যবনিকা ভেদ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অর্থ-ব্যবহারসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু উহা তত্দূর সারগর্ভ—তত্দূর পরিচালনীয় বলিয়া আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। উহাদ্বারা ব্যক্তিগত উপকার তত সম্ভবপর নহে।

প্রাচীন ঋষিগণ এসম্বন্ধে অনেকে অনেক তর্ক, অনেক গলাবাজি করিয়া গিয়া-[illegible] ঐ সব বহু প্রাচীন মত, [illegible] সমাজের পক্ষে নিতান্ত অসাময়িক ও অনুপযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ধর্ম্মবিধির পরিবর্ত্তন হইয়াছে—রুচিরও পরিবর্ত্তন হইতেছে; সুতরাং এখন যে আর ঐ সব সেকেলে ঋষি-প্রণীত ও প্রবর্ত্তিত মত অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত থাকিয়া পূর্ব্ববৎ পসার জাহির করিতে পারিবে, এ আশা বিড়ম্বনা মাত্র। অর্থনীতি সম্বন্ধে অকাট্য ও অভ্রান্ত মত ভারতে প্রচার করিতে পারেন, এখন আর এমন মস্তিষ্কবান্ ব্যক্তি কে? অগত্যা আমাকেই এই বৃদ্ধ বয়সে এই গুরুভার মস্তকে ধারণপূর্ব্বক ঈদৃশ বহুকালানুভূত দুরপনেয় অভাব মোচনার্থ এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হইল। ভরসা করি, সকলে আমার প্রণীত অর্থ-নীতির নিয়মানুযায়ী কার্য্যানুবর্ত্তী হইবেন।

যাহার বিনিময়ে মূল্য পাওয়া যায়, তাহাই অর্থ। যথা বি. এ. পাশ অবিবাহিত পুত্র, শুক্রবিক্রয়ী ব্রাহ্মণের কন্যা ইত্যাদি। "Wealth is anything which has an exchange value" পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অর্থের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন। যদি কোন ব্রাহ্মণ পাঁচশত টাকা কন্যাপণ গ্রহণ করিয়া কোন এক পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করেন, তাহা হইলে, ঐ কন্যাটীকে ব্রাহ্মণের অর্থস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। এখানে ঐ কন্যাটীর বিনিময়মূল্য পাঁচশত টাকা, এইরূপ ধরিয়া লইতে হইবে। পাশ্চাত্য মতে কন্যাটী অর্থ হউক আর না হউক, অন্ততঃ প্রাচ্য মতে উহা যে অর্থ, তাহা এক রকম নিঃসংশয়।

অর্থ ও মুদ্রা একার্থ-বোধক শব্দ নহে। রজত কাঞ্চনের পরিমাণ-নিরূপণদ্বারা কোন দেশের অর্থ-পরিমাণ নিরুপিত হওয়া উচিত

নহে; বস্তুতঃ এদেশের অর্থপরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে, এদেশে রজতকাঞ্চনের পরিমাণ কত, অবিবাহিতা কন্যা ও অবিবাহিত এন্ট্রান্স, এল এ, বি এ, ও এম এ পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকের সংখ্যাই বা কত—ইহাদের কন্যা ও বরপণই বা কত হইতে পারে,ইত্যাদি বিষয় নিরূপণ করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে, জাতীয় অর্থ-নির্দ্ধারণ, কোন মতেই সম্ভবপর নহে।

যে পরিশ্রম মুখ্য বা গৌণভাবে ব্যক্তিবিশেষের অর্থাগমের সহায়তা করে, তাহাকে সফল, এবং যাহা সহায়তা না করে, তাহাকে বিফল পরিশ্রম বলে।

মনেকর, দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকদিগের সাহায্যের জন্য অনেক সভা সমিতিতে চাঁদা তুলিবার কথা চলিতেছে। তুমি ঘরে বেকার বসিয়া কেবল অন্ন ধ্বংস করিতেছ—কাজ কিছুই নাই, এবং আগামী ছয় মাসের মধ্যে কোন অর্থকর কাজ কর্ম্ম হইবে, এমনও কোন সম্ভাবনা নাই। তোমার প্রাণ দেশের দুঃখে বড়ই ব্যথিত হইল। তুমি প্রাণপণ পরিশ্রমসহকারে দুর্ভিক্ষের জন্য পঞ্চাশটী টাকা সংগ্রহ করিয়া, ঐ সমস্ত টাকাই দুর্ভিক্ষ-স্থলে পাঠাইয়া দিলে। তোমার এই পরিশ্রম নিতান্ত বিফল পরিশ্রম বলিয়া গণ্য। কিন্তু, তুমি যদি ঐ পঞ্চাশটী টাকা হইতে,তোমার যাতায়াতের গাড়ীভাড়া, তোমার নিজ আহারাদির ব্যয় ও তোমার পরিবারবর্গের তাৎকালিক খোরপোষ বাবত ন্যূনকল্পে পঁচিশটী টাকাও কাটিয়া রাখিতে পার,তবেই তোমার ঐ পরিশ্রম সফল পরিশ্রম বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। মনেকর, তোমার স্থবির অকর্ম্মণ্য জনক জলমগ্ন হইতেছেন দেখিয়া, তুমি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিলে। এ অবস্থায় তোমার এই পরিশ্রম বিফল, পরিশ্রম কিন্তু যদি এমন হয়, যে তোমার ঐ জনক পিতা বিলক্ষণ কার্য্যপটু ও অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম,—খরচ খরচা বাদে তাঁহার যাহা অন্ততঃ টাকাটা শিকাটাও বাঁচিয়াথাকে, তবে জানিবে, তুমি তাঁহার প্রাণ রক্ষার জন্য পরিশ্রম করিলে, তাহা সফল পরিশ্রমমধ্যে গণ্য। এসম্বন্ধে মহামতি মীলও আমার মতের পরিপোষক। মীল বলেন, "The labour of saving a friend's life is not productive, unless the friend is productive labourer and produc more than he consumes."

ব্যয় দ্বিবিধ—সৎ ও অসৎ; বা সার্থক ও অনর্থক। যে ব্যয় ভাবী অর্থাগমের সহায়তা করে, তাহাই সদ্ব্যয়; আর যে ব্যয় তাহা না করে,তাহাই অসদ্ব্যয়। এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে বহুমূল্য নজর দিবার জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহা সার্থক ও সদ্ব্যয় বলিয়া গণ্য; যেহেতু ইহাদ্বারা ভাবী অনেক প্রকার উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কিন্তু পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধ, ইষ্টদেবকে বার্ষিক দান প্রভৃতিতে যে অর্থহানি হয়,তাহা অসদ্ব্যয় বলিয়া পরিগণিত। কারণ ইহাতে ভাবী অর্থাগমের আশা আদৌ নাই।

যে অর্থ ভাবী অর্থাগমের সহায়তা করে, তাহাই মূলধন। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মূলধনের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন,—The wealth which has been accumulated with the object [illegible]ssisting

roduction is termed capital." একটী অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে হইলে পাঁচশত টাকার অধিক পণ কোন মতে আশা করা যায় না; কিন্তু কন্যাটীকে ষোড়শবর্ষীয়া করিয়া সম্প্রদান করিতে পারিলে, হাজার টাকা পণ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং ঐ কন্যাটীকে ষোড়শবর্ষীয়া করিয়া সম্প্রদান করিতে হইলে, তাহার ভরণপোষণের জন্য যাহা খরচ পড়িবে, তাহা মূলধনমধ্যে গণ্য। মনে কর, তুমি তোমার পুত্রের বি এ পাশ হইবার পর তাহার বিবাহ দিলে। ঐ বিবাহে পাঁচ হাজার টাকা পণ বা যৌতুক মিলিল। ঐ পুত্রটীর শিক্ষার জন্য তোমার যত টাকা খরচ পড়িয়াছে, তাহা অবশ্য মূলধনমধ্যে গণনীয় হইতে পারিবে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, "ক্ষেত্র, পরিশ্রম ও অর্থ" ধনাগমের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু আমি এ বিষয়ে উক্ত পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আমি বলি, "চাকরী, চাটুকারিতাওকূটবুদ্ধি" অর্থাগমের প্রধান সহায়। "যেমন তেমন চাকরী ঘি ভাত" এই মহাবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া চলা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যৌথ কারবারের (Joint Stock Company) গুণকীর্ত্তনে শতমুখ। কিন্তু আমি ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহা সমাজের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। পরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে গেলেই, একপ্রাণতা, একতা এবং বাধ্যবাধকতা আসিয়া যোটা সম্ভব। বাধ্যবাধকতা যে অর্থ-নাশের সূত্র মাত্র, তাহা বলা অত্যুক্তি মাত্র। সুতরাং এসব গোলযোগে যোগ না দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

শ্রমবিভাগ (Division of labour) অর্থোন্নতির পক্ষে বিশেষ দরকারী। তবে যে যেরূপ কার্য্যের উপযুক্ত, তাহাকে সেইরূপ কার্য্যের ভারার্পণ করাই প্রশস্ত। এ সম্বন্ধে মহামতি ফসেটও আমার মতের পৃষ্ঠ-পোষক। তিনি বলেন, "Each workman can be employed solely upon the work he can do best" অর্থাৎ যিনি যেমন কাজের উপযুক্ত, তাঁহাকে সেই রকম কাজে নিযুক্ত করাই উচিত। ইংরেজীতে একটী প্রাচীন প্রবাদ আছে যে "It is no good to put a race horse to plough." পারিবারিক যাব-তীয় কার্য্যে "শ্রম-বিভাগ" প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে লাভ ভিন্ন কিছুমাত্র লোকসান নাই। মা বল—বাপ বল—ভাই বল—ভগিনী বল, সকলেরই উপর এক একটী বিশেষ কার্য্যভার অর্পণ করা নিতান্ত আবশ্যক। তবে তোমার প্রাণের প্রাণ,দেহের শোণিত, হৃদয়াধিকারিনী সহধর্ম্মিনীর উপর বিশেষ কোন কার্য্যভার না দিয়া, তাঁহাকে সকলের উপর তত্বাবধায়িকা নিযুক্ত করিয়া দিবে। তিনি কৃশাঙ্গী অবলা; সুতরাং তাঁহাদ্বারা শ্রমসাধ্য কাজ নিষ্পন্ন হওয়া কিরূপে সম্ভব? কে কি করিতেছে না করিতেছে, কে বেকার বসিয়া আছে না আছে, তিনি এই সব দেখিতে পারিলেই যে যথেষ্ট হইল। ইহাই যে তাঁহার পক্ষে বিশেষ গুরুতর কার্য্য! ত্রুটী দেখিলে,যদি তিনি শ্বশুর শাশুড়ীকেও দুই চারিটা মর্ম্মভেদী কটূক্তি করিয়াছেলেন, তাহাও তত দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এজন্য তোমার তাঁহাকে কোন কথা না বলাই যুক্তিসিদ্ধ।

বাড়ীতে সরু ও মোটা, উভয়বিধ চাউ-

লের ব্যবস্থা রাখিবে। তুমি, তোমার হৃদয়-নন্দনারিমী সহধর্ম্মিণী ও তোমার প্রাণপ্রতিম, নয়ন-পুত্তলি সন্তানগণ সরু চাউলের ভাত খাইবে; এবং পিতা, মাতা,খুড়া, জ্যেঠা,ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র ভগিনী ও ভাগিনেয় প্রভৃতি সকলকেই মোটা চাউলের ভাত দিবে। চাকরাণীর তো কথাই নাই। মোটা চাউল একে সুলভ, তায় আবার দুষ্পাচ্য ;সুতরাং ইহা গৃহীর বিলক্ষণ উপযোগী। তুমি যদি সরু চাউলের অন্নে সেই সকল অকর্ম্মণ্য লোকের ক্ষুধার, ও চাকরমহাশয়দিগের ভীষণ জঠরাগ্নির খাণ্ডব দাহন করিতে মানস করিয়া থাক, তবে জানিবে, তোমার কপালে ঝুলি অবশ্যম্ভাবী। আর শুদ্ধ অন্ন কেন, বস্ত্রাদি অপর সমস্ত জিনিষ সম্বন্ধেও বুদ্ধিমান-মাত্রেরই নিয়ম মানিয়া চলা উচিত। কোন্ চাকর খাইল না খাইল—কে তাতে মাছ পাইল না পাইল—কে অসুস্থ আছে না আছে, এ খোঁজ খপর লওয়া কি বুদ্ধিমান্ লোকের উচিত ? বরং এই সকল দেখিয়াও না দেখা বিধেয়। এ সব বাজে কাজে তোমার মাথা ফাটাইবার কি দরকার ?

এক দিনে অনেক বক্তৃতা শুনিলে পাঠকগণ কিছুই স্মরণ রাখিতে পারিবেন না এই আশঙ্কায় আজ এখানেই ক্ষান্ত হইলাম। ভবিষ্যতে অপরাপর অত্যাবশ্যকীয় উপদেশ গুলি দিতে ভুলিবনা।

বৃদ্ধের চিন্তা।

আরাম-আসনে বৃদ্ধ করিয়া শয়ন,
অতীত যৌবন-কথা করিছে স্মরণ।
সম্মুখে করিছে ক্রীড়া বালক বালিকা ;
মুখগুলি যেন ফুল্ল কুসুম-কলিকা।
কেহ করে ছুটাছুটী উৎসাহে পূরিত,
মনের আনন্দে কেহ করে নৃত্য গীত।
জানে না সংসার কত বিভীষিকাময়,
কত দুঃখ সহে হেথা মানবনিচয়।
হয় নি বিক্ষত প্রাণ জীবনের রণে,
তাপিত হৃদয় নয় চিন্তার দহনে।
নাহি জানে শোক তাপ, সদাই উল্লাসে
নাচে, গায়, হাসে, খেলে,আনন্দেতে ভাসে।

দেখিতে দেখিতে হ'ল দিবা অবসান,
অস্তাচলে দিবাকর করিলা পয়াণ।
খেলা ধূলা সাঙ্গ ক'রে হরিবোল ব'লে,
বালকবালিকাগণ ঘরে গেল চ'লে।
নূতন চিন্তার স্রোত বৃদ্ধের মনেতে
বহিল প্রবল বেগে,—লাগিল ভাবিতে,—
"দুঃখময় এসংসারে এই বাল্যকাল
সুখের সময় বটে, নাহিক জঞ্জাল।
ভোগ-সুখ আছে বটে যৌবনে বিস্তর,
শত বিষে প্রাণ কিন্তু দহে নিরন্তর;
স্বজন-পালন চিন্তা, রিপুর বিক্রম,
মায়াবিনী প্রবৃত্তির কুহক বিষম;
মরীচিকাসম সুখ-আশা পদে পদে
ভুলায়ে, ডুবায় সদা বিষম বিপদে;
ধন, মান, সম্পদের অপার বাসনা
অনুক্ষণ আশা দিয়ে করয়ে ছলনা।
তার পর বার্দ্ধক্য, সে আরও ভীষণ-
জরাজীর্ণ ক্ষীণ দেহ, হীনতেজ মন;
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় সবাই বিকল
নিত্যই নূতন কিন্তু বাসনা

সুখে বিকট কাল অন্ধকারময়,
রণে কম্পিত প্রাণ, শুকায় হৃদয়;
প্রতিক্ষণে আশা হত, বিলীন উদ্যম;
তথাপি ছাড়ে না,হায়, ভাবনা বিষম;
অতীতের স্মৃতি শুধু অনুতাপময়—
'কি করিনু, কি হইল, আরো কিবা হয়'।
হায় রে! শৈশব যদি ফিরে পুনঃ পাই,
বার্দ্ধক্যের জ্ঞান-গর্ব্ব কিছু নাহি চাই;
বিদ্যা বুদ্ধি যশ যত করেছি অর্জ্জন,
সুখেতে এখনি পারি দিতে বিসর্জ্জন।
এক দিন শৈশব সম্ভোগ করিবারে
দশ বর্ষ আয়ু দিতে পারি অকাতরে।
আছে কি এমন কেহ,এ বিশ্বমাঝারে,
আবার শৈশব মোরে এনে দিতে পারে?"
এইরূপ মোহময় চিন্তার আবেশে
উড়িছে বৃদ্ধের প্রাণ কল্পনার দেশে।
প্রবল চিন্তার বেগ নাহি মানে রোধ;
কল্পনায় সত্য বলি' হয় মনে বোধ।
আবেশে বিবশ বৃদ্ধ দেখিতে পাইল,
শুভ্রবেশ দিব্য এক পুরুষ আইল;
ধীরে আসি দাঁড়াইল বৃদ্ধের সমুখে,
মধুর সম্ভাষি' কয় হাসি হাসি মুখে;—
"দিতে পারি আমি পুনঃ শৈশব আনিয়া,
শ্বেত কেশে পুনঃ কৃষ্ণবরণ করিয়া;
দিতে পারি প্রফুল্ল সে সহাস্য আনন,
চিন্তাহীন আশাপূর্ণ সদানন্দ মন;
নবীন করিতে পারি ক্ষীণ কলেবর,
দিতে পারি পুনঃ তোমা সেই খেলাঘর;
কিন্তু এক কথা আমি শুধাই তোমারে,
আর কিছু তুমি কিগো চাহ এ সংসারে?"
আশার ছলনে বৃদ্ধ পুলকিতমন,
কহিতে লাগিল তারে করি' সম্বোধন;—
"অই মম পতিরতা ভার্য্যা প্রিয়তমা,
জগতে নাহিক যার প্রেমের তুলনা;—
এত অনুগ্রহ যদি করিবে আমারে—
সঙ্গিনী করিয়ে তবে দাও তুমি তারে।"
শুনিয়া বৃদ্ধের কথা পুরুষ কহিল,—
"আর কিছু চাও যদি, এই বেলা বল।"
নাচিয়া উঠিল তবে বৃদ্ধের হৃদয়;
আপনা সম্বরি' বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কয়,—
"এত দয়া যদি তব এ দীনের তরে,
একটী প্রার্থনা আরো দাও পূর্ণ ক'রে,—
প্রাণের অধিক এই পুত্রকন্যাগণে
ত্যজিতে বিষম ব্যথা বাজে মম প্রাণে;
পার যদি, তাহাদিগে দাও মম সনে,
কৃতজ্ঞতা-পাশে বাঁধা রব ও চরণে।"
বৃদ্ধের প্রার্থনা তবে করিয়া শ্রবণ,
দিব্যধামবাসী হেসে বলিল বচন,—
"হে বৃদ্ধ প্রার্থনা তব বড়ই অদ্ভুত,
শিশু হ'তে চাও, কিন্তু, চাও দারাসুত!
শিশুর থাকিবে পত্নী,পুত্র কন্যা আর,
এ লীলা সাজিবে ভাল, হে বৃদ্ধ, তোমার!"
বলিতে বলিতে হেসে করিল প্রস্থান;
হাসিতে বৃদ্ধের স্বপ্ন হ'ল অবসান।
আজিও রয়েছি বদ্ধ ঘোর মোহ-পাশে'
ভাবিয়ে আপনি বৃদ্ধ মনে মনে হাসে।

মিলনে।

মন খুলে বলিব।
কে জানিত—
মিলনে ও মুখ হেরি সব কথা ভুলিব?

ভেবেছিনু—

স্থতায় স্থতায় গাঁথা

মনের সকল কথা

মনের গায়েতে সব জড়াইয়ে রাখিনু!

এ কি হায়?—

তন্ন তন্ন ক'রে মন

করিলাম অন্বেষণ,

কথার মালায় ঘেরা মন নাহি পাইনু।

তবে বুঝি—

অন্ধকারে ছিল পাতা মনের আসন,

মন গিয়েছিল তব হেরিতে বদন;

কথার মালিকা গেঁথে,

মনের অঙ্গেতে দিতে,

মনভ্রমে জড়ালেম মনের আসনে,

বিস্মৃতি সে মালা ল'য়ে পলাল গোপনে!

ভুলিব কেমনে?

ভুলিব কেমনে? — শশধর গায়

যে মোহিনী ছবি নিতি শোভা পায়,—

জোছনা তরঙ্গে নাচিয়ে নাচিয়ে

সেই চারু ছবি পরাণে গড়িয়ে

গড়িয়ে আসে? —

অনন্ত অসীম নীল নভঃ অঙ্গে

ঝকে যে মুরতি তারাকুলসঙ্গে;—

ম্লানমুখী তারা যে ছবি-প্রভায়

প্রভাত গগনে লাজে ঢাকে কায়

নীলাভ বাসে?—

স্বচ্ছ ব্যোম-কোলে, মারুত হিল্লোলে,

যে মোহিনী ছবি অবিরত দোলে;—

তরুলতা-দেহে, কুসুমের দলে,

মৃণাল আসনে, সরসীর জলে,

মনোহারিণী

যে ছবি চিত্রিত, ভুলিব কেমনে?

সে যে ছবি মম সঙ্গিনী জীবনে!—

চিত্তের পিপাসা, সুধারব কাণে!—

সে যে ছবি মম আঁধার পরাণে

আলো-রূপিনী!!—

আমার মোকদ্দমা।

(১)

আমার নামধাম পাঠকের শুনিয়া কাজ নাই; আর বাল্যকালের লীলাখেলাও অপ্রকাশ থাকুক। যে সময় হইতে কথা আরম্ভ করিতেছি, তখন আমার বয়স ৩০ বৎসর। এতদিন পিতা ছিলেন, তাঁহার কর্ত্তৃত্বে গাছের ছায়ায় দিন কাটাইতাম। সংসারের প্রখর কিরণ পিতার উপরেই পড়িত। অদৃষ্টদোষে সে দিন গিয়াছে, আজ দশদিন পিতা মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন; সংসারের গুরুভার আমার স্কন্ধেই আসিয়াছে। বাড়ীর অনতিদূরে

একটি পাঠশালা করিয়া, মাসিক ৪টী টাকা আমার রোজগার। এই ক্ষমবান্ পুরুষের উপর এখন ৯টি প্রাণীর প্রতিপালনের ভার পড়িয়াছে— বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, নাবালক সহোদর, একটি শিশু পুত্র, আর ২টি গাভী, ২টি বলদ ও ১টি বিড়াল। সম্পত্তির মধ্যে ১০৴ বিঘা ধানের জমি, ১৴ বিঘা কালা, আর ॥০ কাঠা বাস্তু।

যখন পিতা ছিলেন, তিনিই চাষ করিতেন; ভাইটি গরুগুলি দেখা শুনা করিত; মা ও স্ত্রীর দ্বারা পা'ট কাজ, রান্না বান্না সমস্তই সম্পাদিত হইত। পিতার পরিশ্রমলব্ধ ধান্যে, আর আমার উপার্জ্জিত অর্থে, সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। গোলায় ধান, পুখুরে মাছ, বাড়ীতে আনাজ, হাঁড়িতে দুধ, গাদায় খড় সম্বৎসর বিরাজ করিত। মেয়েদের গায়েও গৃহস্থের উপযোগী অলঙ্কারের অভাব ছিলনা; অতিথি অভ্যাগতকেও সাধ্যমত আপ্যায়িত করিবার ক্রটী হইত না। এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা এই ক্ষুদ্র উপার্জ্জনে সোনার সংসার পাতিয়া, অঋণী অপ্রবাসী হইয়া, মধ্যাহ্নে শাকান্ন ভোজন করিয়া, মনের সুখে কাল কাটাইতাম। বিলাসিতা জানিতাম না; ধর্ম্মার্জ্জিত অর্থে সমস্তই সঙ্কুলান হইত, অভাব উদ্বৃত্ত ছিল না।

পাঠশালা-পরীক্ষায় একবার তিরিশটী টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলাম। এককালীন ত্রিশ মুদ্রা আয় আমাদের পক্ষে বড় সহজ কথা নহে। কি রূপে এই টাকা গুলির সদ্ব্যবহার হইবে, ভাবীকালে সংস্থানের মূল হইয়া সুখের কারণ হইবে, এই চিন্তায় তিন রাত্রি কাটাইয়াছিলাম। শেষে খাতকের রক্তশোষণ-ব্যাপারই সহজ বলিয়া মনে হইল। আমরা ঐ বহুচিন্তাকর মুদ্রাত্রিংশৎ সনাতন রায়ের প্রদত্ত রেজেষ্টীকৃত তমস্সুকের পরিবর্ত্তে, তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া, শান্তিলাভ করিলাম। সনাতন খুব সাহস দিয়া, শপথ করিয়া, বুঝাইয়া দিল, যে মাসে ৸৴০ পনর আনা সুদ সে নিশ্চয়ই আদায় করিবে; আর চারি মাস পরে আসল টাকাও বাকী রাখিবে না। সনাতন ইহাও বুঝাইতে ক্রটী করে নাই, যে ফেলিয়া রাখায় তাহার কিছুই লাভ নাই, বরং ধরিতে গেলে লাভ আমাদেরই; ভার হইলে সে একেবারে কি করিয়া পরিশোধ করিবে? আমরা পিতা পুত্রে সনাতনের সারগর্ভ যুক্তিতে সন্দেহের কোন কারণ দেখি নাই। তথাপি লেখক মুনসিয়ানা করিয়া, মুরুব্বিয়ানা ধরণে চো'ক টিপিয়া, তমস্সুকে এক পাকা সর্ত্ত বসাইয়া লইলেন যে, মিয়াদমধ্যে টাকা আদায় না দিলে, সনাতনকে তমস্সুকের তারিখ হইতে এক আনা করিয়া সুদ দিতে হইবে। ১৸৴০ আনা হিসাবে সুদ পাইব দেখিয়া, আমাদের আহ্লাদের সীমা রহিল না। সেই রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, যেন সনাতন হাজার টাকা সুদ আমাকে গণিয়া দিতেছে।

সনাতন প্রথম মাসে দশ আনা পয়সা দিয়াছিল। তারপর কোন মাসে কন্যার বিবাহ, কোন মাসে বাকী খাজানা, কোন মাসে পুত্রের অন্নপ্রাশন প্রভৃতি নানারূপ খরচের কারণ দেখাইয়া, আর এক পয়সাও আদায় দিল না। পিতাই তাগিদ দিতেন। সময়ে সময়ে আমি তাঁহাকে টাকার কথা জিজ্ঞাসিলে বলিতেন, "তা এত ব্যস্ত হবারই বা কারণ কি? মাসিক ১৸৴০ আনা সুদ; এ সুবিধা কেন ছাড়িব?"

আজ সেই তমসুক লক্ষ্য করিয়া মাতা বলিলেন, " বাছা, সনাতন ত ছয়মাস মরিয়া গেল ; তাহার স্ত্রীকে কত বার টাকা চাহিলাম, সে আজ কাল করিয়া একটী পয়সাও দিলে না। তুমি নিজে একবার দেখ; কিছু আদায় না করিলে, কর্ত্তার শ্রাদ্ধের খরচ কি রূপে চলিবে ?

আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। কন্যা-দায় আর পিতামাতার শ্রাদ্ধের দায় বাঙ্গালীর পক্ষে বড় অগ্রাহ্যের বিষয় নহে। আমি তমসুক বাহির করিয়া দেখিলাম,১৮৶ হিসাবে সুদ ধরিয়া ১৮৭৷৷০ টাকা পাওনা হইয়াছে। দেখিয়া, এই অকূল পাথারেও যেন কূল পাইলাম ;— শ্রাদ্ধের ব্যয়ের জন্য একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাবিলাম, ১০০৲ টাকা শ্রাদ্ধে খরচ করিব,বাকী টাকা অপর খাতককে দাদন করিব। মাকেও মনের কথা বলিলাম ; তিনিও আমার কথাতেই সায় দিলেন।

পরদিন প্রাতে সনাতনের বাড়ীতে গেলাম। সনাতনের পত্নী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, আমাকে মহা সমাদরে বসিতে দিলেন; একথা ওকথা ফেলিয়া,নাবালকগণের অসহায় অবস্থার উল্লেখ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তার পর পিতার অকাল-মৃত্যুর জন্যও কএক ফোঁটা জল পড়িল। আমারত চোক ছল ছল করিয়া উঠিল,—মুখ ফুটিলনা; টাকার কথা বলিতে পারিলাম না।

দুই এক দিন পরে আবার গেলাম। সে দিন একেবারেই বলিয়া ফেলিলাম—টাকার নিতান্ত প্রয়োজন জানাইলাম। সনাতন-পত্নী মিনতি করিয়া বলিল শীঘ্রই দিবে। কয়েক দিন পরে আবার গেলাম; বলিল,টাকার চেষ্টা করিতেছে। তৃতীয় দিনে দেখিলাম, তেমন নরম বিনীত মেজাজ নাই; বলিল, " এত ব্যস্ত হ'লে চল্‌বে কেন ? বাক্সে তুলে রেখে টাকা দিচ্ছি না এমন ত আর নয় ?"

চতুর্থ দিবসে ইচ্ছা করিয়াই দেখা দিল না। পঞ্চম দিবসে সাফ জবাব দিল, "যে টাকা লইয়াছে সে জানে, আমি তার কি জানি ?" সে দিন তাহার সহোদর রামদাস আসিয়াছিল; রাম মালি মোকদ্দমা বুঝে বলিয়া শুনিলাম।

আমার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল;দূর হইতে যে আলোক লক্ষ্য করিয়া অন্ধকারেও অগ্রসর হইতেছিলাম, তাহা হঠাৎ নিবিয়া গেল। কি করিব, কি বলিব, ঠিক করিতে না পারিয়া, সেখান হইতে উঠিয়া আসিলাম। অবিলম্বে মাতৃ-চরণে সমস্তই নিবেদন করিলাম। মানুষে যে অপরের টাকা ধারিয়া এমন উত্তর দিতে পারে, এরূপ ধারণা তাঁহার ছিল না; তিনি অবাক্ হইয়া,গালে হাত দিয়া,বসিয়া পড়িলেন। পত্নী সরিয়া আসিয়া, এক হাতে একটু ঘোম্‌টা সরাইয়া, কারণজিজ্ঞাসুভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আমিও আমাতে ছিলাম না; কিন্তু ক্রমে বুঝিলাম, আমি সাহস না করিলে চলিবে না। বিশেষতঃ দুইজন স্ত্রীলোকের নিকট একটু পুরুষকার না দেখাইতে পারিলে পুরুষ জাতির অবমাননা হয়। তাই মাতাকে সাহস দিয়া বলিলাম, "মা তুমি ভয় করিও না; শুনিয়াছি টাকা না দিলে নালিশ করিতে হয়। আমরাও নালিশ করিব, দেখি কেমন করিয়া টাকা না দেয়; তবে এই সময়ে কিছু ব্যয় হ'য়ে যাবে এই যা কথা।"

মা বলিলেন, "তা খরচ ক'রলেই যদি

হয়, তবে তাই করা উচিত। আমার কাছে দশটি টাকা আছে; অনেক দিন হাতে রেখে ছিলাম; তা সোণার বৌয়ের মনে এত ছিল জান্‌তেম না”। সনাতন পত্নী “সোণার বৌ” বলিয়াই অভিহিত হইত। মাতার আদেশমতে মোকর্দ্দমা করাই স্থির হইল।

---

(২)

আমি যেখানে পাঠশালা করি, তাহারই অদূরে বিশ্বম্ভর দাস মহাশয়ের বাস। জেলা মহকুমা সর্ব্বত্র তাঁহার গমনাগমন; উকিল মোক্তার প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয়; দেশের মধ্যে নাম ডাক যথেষ্ট। তিনি বলিতেন, ৩০৩ টি হাকিম তাঁহার আমলেই গত হইয়াছে। লোকের মালিমোকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে, তাঁহার প্রখর বুদ্ধির আশ্রয় ভিন্ন চলিত না।

এই অশেষ সদ্‌গুণালঙ্কৃত মহানুভব দাস মহাশয় আমার নিতান্ত পর নহেন;মাতামহের জ্ঞাতি ভ্রাতা। এই কারণে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। তিনি প্রথম প্রথম আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগকেই পরামর্শ দিতেন; পরে ক্রমে পশার অধিক হইয়া, এক্ষণে ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’ করিয়া ফেলিয়াছেন। লোকে বলিত, দাদা মহাশয় কাহারও উপর জুলুম করিয়া কখনও কিছু লইতেন না;পরোপকার করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। প্রতি দিন শিবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। কাজেই আমার মত পাঠশালার সরকার তাঁহার যুক্তি না লইয়া,কাজে নামিতে পারিল না; আর নামিতে চাহিলেও নামিতে জানিত না। সকল কার্য্যেই পাওয়ার দরকার। সুতরাং মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া,পরদিন প্রাতে বিশ্বম্ভর-সদনে গমন করিলাম। দাদা মহাশয় আদর করিয়া নিকটে বসাইলেন। পিতার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিলেন। স্নেহ-পূর্ণ গদ্‌গদ্‌স্বরে অনেক কথা বলিলেন। তাঁহার সহানুভূতি দেখিয়া,আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। শেষে বলিলাম “দাদা মশাই,আপনার নিকট এসেছি”। আমি কথা শেষ না করিতে করিতেই,দাদা পূর্ব্ববৎ স্বরে আবার কথা পাড়িলেন,—পিতৃশ্রাদ্ধ পরম পবিত্র, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিলেন। আরও বলিলেন,“তথাপি নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া,যদিচ্ছা ব্যয় করিলে চলিবে না। আর আত্মীয়বন্ধুগণের সাহায্য করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়; তবে আজকাল সকলেরই অভাব, এই যা কথা।” তারপর সাধারণ হইতে ব্যক্তিত্বে আসিয়া, আরও বলিলেন, “আমি কি তোমাদের পর? তোমার এই বিপদে কিছু সাহায্য ক’রবার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, এই সময়ে হাতে কিছুই নাই”। আমাকে অর্থপ্রার্থী বোধে দাদা মহাশয় বক্তৃতা দীর্ঘ করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, “শ্রাদ্ধের খরচ এক রকম চলিয়া যাইবে;আমি সম্প্রতি সেজন্য আসি নাই। বোধ করি আমার একটি মোকদ্দমা করিতে হইবে; সেই যুক্তির জন্য এসেছি।” মোকদ্দমার কথা শুনিয়া,দাদা মহাশয় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন, “তোর আবার কি মোকদ্দমা রে?” আমি সব কথা বলিলাম। কি রূপে ভ্রাতা রামদাসের যুক্তিতে সনাতন-পত্নী টাকা দিতে অসম্মত হইল,তাহাও জানা-

ইলাম। আরও বলিলাম,"সোনার বৌ লোক মন্দ নয়; সনাতনের তিনটি নাবালক পুত্র; তাহাদিগকে দেখিয়া, দয়া করিয়া আমি এতদিন কিছু বলি নাই। এখন রামদাস মাঝে পড়িয়া গোল বাধাইয়া দিতেছে"।

ক্রমশঃ

প্রেম ও সৌন্দর্য্য।

হৃদয়ে প্রেম থাকিলেই চক্ষেও সুন্দর দেখা যায়। যে যাহাকে ভালবাসে, সেই তাহাকে সুন্দর দেখে। হৃদয়স্থিত প্রেমের এই এক অদ্ভুত শক্তি আছে,যে ইহা বাহিরের পদার্থকে সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া দেয়। পাণ্ডুরোগীর চক্ষে জগৎ পীতবর্ণ দেখায়। প্রেমিকের চক্ষে জগৎ নিখিল সৌন্দর্য্যের আধার। তুমি আমি যে পদার্থে কিঞ্চিন্মাত্র সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না, প্রেমিক তাহারই দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন; চক্ষু ফিরাইতে চাহেন না; এবং ঐ পদার্থ নয়নের অন্তরাল হইলে, তাঁহার প্রাণ অস্থির হয়। যে পদার্থ অপরের নিকট অতিশয় কুৎসিৎ এবং বিরক্তিকর, প্রেমিক তাহারই ভিতরে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য অনুভব করেন। প্রিয় পাত্রকে কখনও কুৎসিত বোধ হয় না। জননীর হৃদয়ে প্রেম থাকে বলিয়াই,"অসিত বরণ" সন্তানও "কষিত কাঞ্চনের" ন্যায় প্রতীয়মান হয়। প্রেমের মোহিনী শক্তির প্রভাবেই এরূপ ঘটে।

এক জন আর এক জনকে দেখিতে বড়ই ভাল বাসে; অনিমেষনেত্রে তাহার মুখাবলোকন করিতে করিতে আত্মবিস্মৃত হয়; যত দেখে, ততই দেখিতে ইচ্ছাকরে; কতদিন, কতমাস, কত বৎসর যাবৎ দেখিতেছে, তথাপি দর্শনস্পৃহা তৃপ্ত না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে থাকে; সে মুখ যেন নিত্যই নূতন;যেন নিত্যই তাহাতে নব নব সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতেছে,— এরূপ ঘটনা পৃথিবীতে নিতান্ত বিরল নহে। প্রেমের এই শক্তি অনুভব করিয়াই কবি গাহিয়াছেন, "লাখ লাখ যুগ রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।" সেরূপ তো জগতের সহস্র সহস্র লোকেই দেখিতেছে; তবে কেবল মাত্র ঐ এক জনেরই বা কেন এমন মোহ জন্মে, অপরের কেন তেমন হয় না? এ মোহ কোথাহইতে আসে? এসৌন্দর্য্য অপরের নিকট লুক্কায়িত থাকে, কিন্তু তাহারই নিকট প্রকাশিত হয়,এ কেমন যাদু? তাহার অন্তরস্থ প্রেমই এ মোহের উৎপত্তি-স্থান;— ঐ প্রেমই সেই যাদুকর।

যাহাকে ভাল বাসা যায়, তার সকলই সুন্দর। তাহার নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুগঠিত এবং সুরঞ্জিত বোধ হয়। তাহার মুখের কথাগুলি কেমন মিষ্ট লাগে; তাহার কার্য্য গুলি কতই উত্তম বোধ হয়; কোন কার্য্যেই যেন কোন দোষ নাই,—দুরভিসন্ধি বা অন্যায় নাই। সে যখন চলিয়া যায়, তাহার প্রতিপাদবিক্ষেপে যেন নৃত্য বোধ হয়। সে যখন নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে, তাহার স্তিমিতনেত্রশোভিত মুখে যেন অসীম অপার সৌন্দর্য্য উথলিত হইতে

থাকে। তাহার তীব্র তিরস্কার-বাক্যও যেন কর্ণে মধু বর্ষণ করে;তাহার দণ্ডাঘাতও পুষ্প-বর্ষণের অপেক্ষাও সুখকর। তাহার অঙ্গ-স্পর্শে প্রাণ পুলকিত ও সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়। তাহার গৃহ যেন স্বর্গ,তাহার সংসর্গ যেন মোক্ষ,তাহার আলিঙ্গন যেন নির্ব্বাণ। তাহার স্মরণে সুখ, ধ্যানে আনন্দ, মিলনে নবজীবন। শুধুই কি এই পর্য্যন্ত ? তাহার ব্যবহৃত পদার্থ গুলিও কত সুন্দর, কত উপাদেয়, কত উৎকৃষ্ট বোধ হয়। তাহার বস্ত্র,অলঙ্কার,শয্যা,পাদুকা, যষ্টি, ছত্র, সকলই প্রীতিকর। সে যাহা হাতে করিয়া দেয়, তাহা অকিঞ্চিৎকর হইলেও, মহামূল্য রত্ন অপেক্ষাও আদরনীয়। প্রেমের এই অদ্ভুত শক্তির পরিচয় অল্প বিস্তর সকলই পাইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে,যাহার প্রতি প্রেম নাই,তাহার কোথাও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। অপরের নিকট তাহার মূর্ত্তি, বাক্য,কার্য্য ভাল লাগিতে পারে, কিন্তু তাহা তোমার আমার নিকট নিতান্ত অগ্রাহ্য, অপ্রীতিকর এবং নানা প্রকার ক্রটীতে পরিপূর্ণ বোধ হইবে। তাহার রূপে কত খুঁত, তাহার কথাগুলিতে কত কর্কশতা, তাহার কার্য্যের মধ্যে কত গূঢ় অভিসন্ধি দেখিতে পাই।সে যদি আদর করে, তাহাতে স্বার্থের আরোপ করি; যদি অনাদর করে, অভদ্রতা নির্দ্দেশ করি; যদি কোন উপ-হার দেয়, লৌকিকতা বলিয়া গ্রহণ করি,তৎ-প্রতি বিশেষ আদর জন্মে না; সে জিনিষটী নিতান্ত সামান্য অথবা নানা দোষে দুষ্ট বলি-য়া মনে হয়। এই জন্যই প্রবাদ হইয়াছে—
" দেখ্‌তে নারি চলন বাঁকা।"

এই সুবিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য পদার্থ আছে। অই জ্যোতির্ম্ময় দিনকর-করোজ্জ্বল অসীম আকাশমণ্ডল; চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত অগণিত নক্ষত্রখচিত, গ্রহোপগ্রহসমন্বিত নীল নভস্থল; তরঙ্গায়িত, অতলস্পর্শ সুবিশাল জলনিধি ; বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত , বিবিধ প্রকার সুরভিবাসিত, কুসুমালঙ্কৃত ও লতাপল্লব-শোভিত শ্যামল বনরাজী; নিবিড় গহনমণ্ডিত, নির্ঝরিণী-বিধৌত,অসংখ্য কলনাদিনী স্রোত-স্বিনী-প্রবাহিত, তুষার-মুকুট-শোভিত উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা ; বহুযোজনবিস্তৃত বালুকাপূর্ণ মরু-ভূমি; বিস্তীর্ণ প্রান্তর ভূমি; বিচিত্র বর্ণ,বিচিত্র-স্বর,বিবিধাকৃতি কোটী কোটী পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ; এ সকল তো সহস্র সহস্র ব্যক্তি দর্শন করিতেছে। কিন্তু কয় জন এ সকল দেখিয়া মোহিত হইয়া থাকে ? কয় জন সুখী হইয়া থাকে? কয় জনের প্রাণ এ সকলে তৃপ্তি লাভ করে ? কয় জন এ সকল দেখিয়া প্রাণের জালা নির্ব্বাপিত করিয়া থাকে ? ব্যথিত প্রাণ লইয়া কয় জন এসকলের নিকট ধাবিত হয়? এ বিশ্বে যে হৃদয় মনের উন্মাদকারী সৌন্দর্য্য আছে, তাহা কয় জন অনুভব করে ? কিন্তু প্রেমিকের চক্ষে এ বিশ্ব অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার। তিনি এই সৌন্দর্য্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, কত শান্তি, কত তৃপ্তি ও কত আনন্দই সম্ভোগ করিয়া সুখী হয়েন। পত্রের প্রতি রেখায়, পুষ্পের বর্ণে ও গন্ধে, সূর্য্যের উত্তপ্ত রশ্মিতে, চন্দ্রের সুশীতল রজতময় কিরণজালে, নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে, আকাশের অনন্ত প্রসার নীল বক্ষে, সমুদ্রের তরঙ্গ-বিক্ষোভে, পর্ব্বতের গগণস্পর্শী শিখরে, নির্ঝরিণীর উৎক্ষিপ্ত জল-বিন্দুসমূহে, স্রোতস্বিনীর কল নিনাদে, বিহঙ্গ-মের কাকলীতে, ভ্রমরের গুঞ্জনে,- পৃথিবীর

যাবতীয় পদার্থপুঞ্জে কত সুধাই আহরণ করেন— যে সুধাপানে তাঁহার মন প্রাণ অনুক্ষণ বিভোর হইয়া সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া যায়। তিনি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করেন, কি মনোমদ সৌন্দর্য্যই দেখিতে পান, যে তাঁহার মনপ্রাণ একেবারে উদ্বেলিত হইতে থাকে; নয়নদ্বয়ে বাষ্পরাশি বিগলিত হইতে থাকে; সর্ব্বাঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে;আলোক-সম্ভব আনন্দ-ধারায় তদীয় চিত্ত-ক্ষেত্র প্লাবিত হইয়া যায়! প্রেমহীন শুষ্কহৃদয় ব্যক্তি এ সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ মাত্র।

প্রেম বিকলাঙ্গকে সুন্দর দেখায়; ঘৃণাকারজনক দুর্গন্ধময় গলিতকুষ্ঠাক্রান্তদেহ, আত্মীয়বর্গপরিত্যক্ত ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করাইয়াও সুখী করে। প্রেমই জাতিবিদ্বেষ, সামাজিক ভেদজ্ঞান, বংশমর্য্যাদার অভিমান, ধনৈশ্বর্য্যের গর্ব্ব, পাপী সাধুর ভেদাভেদ বিলুপ্ত করিয়া, ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে একাসনে বসায়; জ্ঞানীমূর্খকে হাতে হাতে ধরায়; রাজপুত্রকে নিরাশ্রয় দুঃখীর সেবায় নিয়োজিত করে; পরম ধার্ম্মিক, দেবাত্মা, পবিত্রচরিত্র সাধু ব্যক্তিদ্বারা মহাপাপী,সমাজের পরিত্যক্ত নারকীকেও আলিঙ্গন করায়; এবং তাবৎ প্রাণীকে আত্মবৎ দেখায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে, চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে, এবং প্রাণবধে উদ্যত, প্রেম ভিন্ন তাহাকে কে ক্ষমা করাইতে পারে? প্রেমিক কোথাও মন্দ দেখিতে পান না,কাহাকেও ঘৃণা করেন না,কিছুতেই বিরক্ত হয়েন না। তাঁহার প্রেমানুরঞ্জিত নয়নসমক্ষে সকলই সুন্দর, সকলই প্রীতি-ভাজন;সর্ব্বত্রই তিনি ভালবাসার বস্তু,এবং সর্ব্ব জীবেই প্রীতিকর গুণ অবলোকন করেন। প্রতি আত্মায় স্বর্গীয় সদ্ভাব,প্রতিদেহে সৌন্দর্য্য, প্রতি ঘটনায় মঙ্গলের আভাষ; সর্ব্বাবস্থায় সুখকরত্ব,কুৎসিতে রমণীয়ত্ব,ঘৃণিতে আকর্ষণ, পরিত্যক্তে প্রয়োজন, অধিক কি, ভীষণ নরকের ভিতরও স্বর্গের আভাষ,কেবল মাত্র প্রেমিকের চক্ষেই প্রত্যক্ষ হয়।

পক্ষান্তরে, অপ্রেমিক এ বিশ্বের কোন পদার্থকেই সুন্দর দেখে না; তাহার প্রীতি আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত বস্তু কুত্রাপি খুঁজিয়া পায় না;সে ব্যক্তি সর্ব্বত্র কেবল ত্রুটী,বিকৃতি, হীনতা, ও কদর্য্যতা অনুভব করিয়া বিরক্ত হইতে থাকে। বিরাগ, ঘৃণা ও পরিত্যাগই তাহার মন্ত্র হইয়া পড়ে। সে যাবতীয় নরনারীর মুখে কলঙ্কের ছায়া, বাক্যে, কপটতা, কার্য্যে কুটীলতা, অভিপ্রায়ে স্বার্থপরতা, চরিত্রে ভণ্ডতা,এবং মনে নরকের ভীষণ ছবি দেখিয়া ভীত হয়; তাবৎ আত্মায় জঘন্যতা অনুভব করিয়া, দুরন্ত বিরাগভরে মনে মনে সমগ্র মানব-জাতিকে পরিত্যাগ করে। বাহ্য জগৎও তাহার নিকট নিতান্ত অসার, শূন্যময়, নীরস,অর্থহীন,এবং সৌন্দর্য্য-রহিত;নিরবচ্ছিন্ন বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও মৃত্যুর বিকট বিশৃঙ্খল কোলাহলে পরিপূর্ণ, এবং চঞ্চলতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার জীবন্ত কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া প্রতীত হয়।

জীবনের কোন না কোন মুহূর্ত্তে প্রত্যেকেই প্রেমের প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। সকলেই জানেন, হৃদয়ে যখন প্রেম জাগ্রত হয়, তখন কেবল প্রেমের পাত্রটী কেন, সমস্ত জগৎই মিষ্ট হইয়া থাকে। আর সে ভাবটী যখন প্রবল না থাকে, তখন সহজেই প্রাণে

বিরক্তি ও অতৃপ্তি জন্মিতে থাকে। এমন কি, যখন কোন প্রকার অভিলষণীয় ঘটনা—কোন প্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত মিলন ঘটে, তখন প্রাণে এতই উদারতা জাগিয়া উঠে, যে সকলকেই সুখী করিতে ইচ্ছা হয়; প্রার্থীগণের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য কত উৎসাহ জন্মে। তখন যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহাকে তাই দিতে ইচ্ছা হয়। ফলতঃ সকলেই তখন অল্প বিস্তর প্রীতি আকর্ষণ করিতে থাকে।

অহো প্রেম, তোমার কি আশ্চর্য্য প্রভাব, অনির্ব্বচনীয় মহিমা, অচিন্ত্য অলৌকিক শক্তি, অদ্ভুত লীলা! তোমাতে কত রূপ, কত রস, কত গন্ধ, কত সৌন্দর্য্য, কত ভাব, কতই মোহ! তুমিই জগতে স্পর্শমণি, জীবনামৃত! এ অমৃত যে সৌভাগ্যশালী বিন্দুমাত্র পান করিতে পাইল, সেই মজিল! যে না পাইল, সে মরিল! যাহার প্রেম আছে, সে সর্ব্বসম্পদ্ লাভ করিয়াছে, যাহার প্রেম নাই, সেই প্রকৃত দরিদ্র ও কৃপাপাত্র। এ জগতে যেন কাহারও সে দুর্ভাগ্য না ঘটে।

আকৃতি-বিজ্ঞান—ধাতুপ্রকৃতি।

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে আকৃতি-বিজ্ঞানের যে অংশ ধাতুপ্রকৃতিসম্বন্ধীয় বিচার-সংসৃষ্ট, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের মধ্যে এ সম্বন্ধে কতক সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়; কতক বিষয়ে আবার বৈপরীত্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু উভয় মতে সম্পূর্ণ মিল হয় না বলিয়া, ইহার কোন একটীকে বা উভয়কেই ভ্রান্ত বলিবার কাহারও অধিকার নাই। হয়ত ধাতু-বিভাগ সম্বন্ধে উভয় মতে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকিবে; তাহা হইলে, একের বিভাগ অন্যের বিভাগের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে মিলিবার সম্ভাবনা নাই। অথবা ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে, যে উভয়ের ধাতু-বিভাগ-প্রণালী এক হইলেও, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও জল বায়ু ও শীতাতপের ইতর বিশেষ হেতু, একই ধাতুর লোকের আকার ও প্রকৃতির বিভিন্নতা ঘটিতে পারে। ফলতঃ স্থূল কয়েকটী বিষয়ে উভয় মতে সুন্দর সামঞ্জস্য দেখা যায়, যথা—

(১) মানবের দৈহিক যন্ত্রাদি বা ধাতুর পার্থক্য অনুসারে দৈহিক গঠন ও মানসিক প্রবৃত্তির পার্থক্য হয়। এবং সেই পার্থক্য অনুসারে মনুষ্যকে ভিন্ন ২ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(২) ধাতুর পার্থক্য অনুসারে কেহ সাত্ত্বিক, কেহ রাজসিক, ও কেহ তামসিক হইয়া থাকে।

(৩) দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও জল বায়ু ভেদে ধাতুর পার্থক্য হইতে পারে; সুতরাং প্রকৃতিরও পার্থক্য হইতে পারে।

(৪) পিতা মাতার ধাতু-প্রকৃতি সন্তানে লক্ষিত হইয়া থাকে।

এ স্থলে পার্থক্যের বিষয় বিবৃত করা গেল না। প্রত্যেক ধাতু-বিভাগের বিশেষ বিবরণ-স্থলে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

ইউরোপীয় প্রাচীন প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিদেরা মনুষ্যকে ধাতু-ভেদে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতেন যথা——

(১) শোণিতপ্রধান (Sanguine -Temperament) রক্তবাহী যন্ত্রের বলবত্তা ইহাদের দেহের লক্ষণ।

(২) পাক-যন্ত্র ও কোষ-প্রধান ধাতু (Lymphatic or Phlegmatic Temperament) পরিপাকযন্ত্র ও কোষ (Glands) আদির প্রাবল্য ইহাদের লক্ষণ।

(৩) পিত্তপ্রধান ধাতু (Bilious Temperament) অস্থি, পেশী ও যকৃৎ যন্ত্রের প্রাবল্য ইহাদের লক্ষণ।

(৪) স্নায়ুপ্রধান ধাতু (Nervous Temperament .) স্নায়ু ও মস্তিষ্কের প্রাবল্য ইহাদের লক্ষণ।

ক্রমে দেহের সহিত মানসিক সম্বন্ধের জ্ঞান, এবং রোগ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পাশ্চাত্য প্রাচীন ধাতুবিভাগের ও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইল। আধুনিক আকারবিজ্ঞানবিৎগণ এখন আর ঐ চারিটী বিভাগ স্বীকার করেন না। (Sanguine temperament) বা শোণিত-প্রধান ও (Lymphatic) বা কোষ-প্রধান, এই দুই শ্রেণী এক শ্রেণীতেই পড়িতে পারে বলিয়া আধুনিকদিগের মত। তদ্ব্যতীত প্রাচীন নামগুলিরও পরিবর্ত্তন হইল। আধুনিক পাশ্চাত্য ধাতু-বিভাগ এইরূপ।—

(১) (Motive temperament)বা শক্তি-প্রধান ধাতু। প্রাচীন মতের Bilious বা পিত্তপ্রধান ধাতু ইহার অন্তর্গত।

(২) Vital temperament বা কোষ্ঠ-প্রধান *ধাতু। প্রাচীন মতের শোণিত-প্রধান ও কোষ-প্রধান ধাতু ইহার অন্তর্গত।

(৩) (Mental temperament) বা স্নায়ু ও মস্তিষ্ক-প্রধান ধাতু। ইহাই প্রাচীন মতে স্নায়ু-প্রধান ধাতু। আয়ুর্ব্বেদীয় পিত্ত-প্রধান, শ্লেষ্মা-প্রধান ও বাত-প্রধান ধাতুর সহিত এই তিন বিভাগের তুলনা হইতে পারে। অনেকের মতে আয়ুর্ব্বেদীয় ধাতু-বিভাগ ও পাশ্চাত্য ধাতু-বিভাগ অভিন্ন। ইঁহারা বলেন, ইংরাজীর Nervous Temperament আয়ুর্ব্বেদীয় বায়ুপ্রকৃতি; Bilious Temperament পিত্তপ্রকৃতি, এবং Phlegmatic Temperament শ্লেষ্মাপ্রকৃতি।

Motive temperament বা শক্তি-প্রধান ধাতুর লোকের অস্থি ও পেশীর গঠন দৃঢ়, স্কন্ধ বিস্তৃত, চিবুকাস্থি বৃহৎ ও উচ্চ, দন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট ও দৃঢ়, মুখমণ্ডল চতুষ্কোণ ভাবাপন্ন, উদর মধ্যাকৃতি, আকার প্রায় একটু দীর্ঘ এবং শরীরের সাধারণ গঠন দৃঢ় ও শক্ত শক্ত। সাধারণতঃ যাহাকে"হাড়ে মাঁষে জড়িত গড়ন" বলে, ইহাদের সেইরূপ গঠন হইয়া থাকে। অস্থি , পেশী, ও সন্ধিবন্ধনের দৃঢ়তা ইহাদের প্রধান লক্ষণ। স্ত্রী জাতি অপেক্ষা পুরুষ জাতির মধ্যে এই শ্রেণীর লোকের আধিক্য দেখা যায়। ইহারা বিলক্ষণ কর্ম্মঠ ও

* পক্কাশয়, আমাশয়, হৃৎপিণ্ড, শ্বাস-যন্ত্র প্রভৃতির নাম কোষ্ঠ। এই শ্রেণীর লোকের এই সমস্ত যন্ত্র প্রবল বলিয়া, ইহাদিগকে কোষ্ঠ-প্রধান বলা হইল।

শ্রমকষ্ট-সহিষ্ণু।

দেহের ন্যায় ইহাদের মানসিক বৃত্তি-গুলিরও তেজস্বিতা ও বলবত্তা দেখা যায়। মানসিক দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা ইহাদের বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়; কিন্তু ইহাদের হৃদয় তাদৃশ কোমল হয় না।

যদিও ইহারা শারীরিক পরিশ্রমের ন্যায়,মানসিক পরিশ্রমেও সহজে ক্লান্তি বোধ করে না, তথাপি সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি, উদ্ভাবনা-শক্তি ও ভাবুকতা ইহাদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না; কিন্তু অপরের উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত কোন একটী বিষয়কে কার্য্যে পরিণত করিতে বলিলে, বিশেষ পটুতার সহিত তাহা করিতে পারে। ইহাদের সাংসারিক কার্য্য-কুশলতা বিলক্ষণ থাকে। ইহারা প্রায়ই বলদৃপ্ত ও অহঙ্কারী হয়। সমৃদ্ধি, ক্ষমতা, ও প্রভুত্বশালিতার স্পৃহা ইহাদের অত্যন্ত বলবতী;এবং তৎ-কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া ইহারা প্রাণপণ পরি-শ্রমেও পশ্চাৎপদ হয় না।

এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া, ইহাদিগকে রাজসিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীর যে সমস্ত জাতি সংগ্রামপ্রিয়তা ও শৌর্য্যের পরিচয় দিয়া, ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে,তাহাদের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কানন-পর্ব্বতবাসী আমেরিকার আদিম নিবাসী, স্কটলণ্ডের নীরস গিরিপ্রস্তরপরিপূর্ণ হাই-লেণ্ডবাসী, ও স্কাণ্ডিনেভিয়ার হিমানী-ক্লিষ্ট অধিবাসীদের মধ্যেও এই শ্রেণীর লোকের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।† তাহার কার-ণও কিয়ৎ পরিমাণে অনুমিত হইতে পারে। যে দেশে প্রকৃতি ফলশষ্যসম্বন্ধে মুক্ত-হস্ত, বিশেষতঃ তথায় যদি শীতের প্রাখর্য্য না থাকে, তাহা হইলে,সে দেশের লোককে অন্ন বস্ত্র সংগ্রহে অধিক পরিশ্রম বা সময় ব্যয় করিতে হয় না। সুতরাং তাহাদের মধ্যে কতক লোক স্বভাবতই বিলাসী ও আলস্য-পরায়ণ হইয়া পড়ে;আর কতকলোকে শরীর পোষণাপেক্ষা উচ্চতর চিন্তায় মনোনিয়োগ করিতে পারে। কাযেই কতক লোক তমো-গুণযুক্ত, আর কতকলোক সত্ব-প্রধান হইয়া থাকে। কিন্তু যে দেশ অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর ও অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান, তথায় লোককে আহার্য্য ও পরিধেয় সংগ্রহে অধিকতর পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিতে হয়; এবং যথা-সাধ্য শরীর ও মনকে সেই চেষ্টায় নানারূপে নিয়োজিত রাখিতে হয়। ইহার ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দৃঢ় ও কর্ম্মঠ হয়,এবং মনও সাংসা-রিক উন্নতিকল্পে ব্যস্ত থাকায়, প্রবৃত্তিও তদ-নুগামী হয়। এই জন্য এই সমস্ত লোকের রাজসিক প্রকৃতিই বলবতী। * যাহাহউক দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাই যে ধাতু-প্রকৃতির

† স্বাধীন তাতার ও আরব দেশের অধিবাসীদের মধ্যেও এই প্রকৃতির আধিক্য আছে বলিয়া বোধ হয়।

* কিন্তু যে দেশে শীত বা গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব,তথায় এই নিয়মের ব্যভিচার দেখা-যায়। পৃথিবীর সুদূর উত্তর ভাগে দুরন্ত শীতপ্রভাবে লোকে গৃহের বাহির হইয়া সব সময় কার্য্য করিতে পারে না বলিয়া,শ্রমজীবীদের মধ্যে ক্রমশঃ আলস্য ও আমোদ-প্রিয়তা আসিয়া জুটে।

এক মাত্র কারণ, তাহা নহে। বিশেষ বিশেষ কার্য্যানুসরণ বা জীবিকাবলম্বন,ও পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতির বংশপরম্পরাগত প্রকৃতিও মানুষের প্রকৃতি-গঠনের কারণ হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদমতে সকল প্রকার ধাতুই, বীজ-সঞ্চার-কালে পিতামাতার দেহে যে প্রকৃতি বলবান্ থাকে,তাহারই অনুরূপ হয়। পাশ্চাত্য কোন কোন আকৃতি-বিজ্ঞানবিৎও Motive Temperament সম্বন্ধে দেশ ও জলবায়ু ব্যতীত আরও একটী কারণ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন, যে দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম-সাপেক্ষ কোন কোন উপজীবিকা বংশ-পরম্পরাক্রমে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিলে, সেই বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণের মধ্যেও এইরূপ ধাতু-প্রকৃতি ও শারীরিক গঠন লক্ষিত হয়। Motive Temperament এর লোকের শরীর-গঠন এবং মানসিক বৃত্তি, দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমসাধ্য ব্যবসায়ের পক্ষে যে বিশেষ উপযোগী, তাহা সহজেই অনুমান হয়। সুতরাং এইরূপ ব্যবসায় বা উপজীবিকা বংশ-পরম্পরাগত হইলে, ক্রমশঃ তাহার উৎকর্ষ সাধনের সুবিধা হইবে, ইহা অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে বিশেষ বিশেষ ব্যবসায় বিশেষ বিশেষ জাতিগত করার ইহাও একটী কারণ।

এক্ষণে পাশ্চাত্য শক্তিপ্রধান ধাতুর সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় পিত্ত-প্রধান ধাতুর কতদূর ঐক্য হয় দেখা যাউক। আয়ুর্ব্বেদমতে পিত্ত-প্রকৃতির মনুষ্যের শরীর গৌর বর্ণ, মুখ তাম্র বর্ণ, কেশ কপিল বর্ণ, সন্ধিবন্ধন ও মাংস শিথিল হয়, এবং শরীর অল্প রোমযুক্ত হয়। ইহারা শূর, অভিমানী, সচ্চরিত্র, মেধাবী, বৈভবযুক্ত, সাহসী, বুদ্ধিমান্ ও বলবান্ হয়। শত্রুগণও আশ্রিত হইলে, ইহারা তাহাদের সহায় হয়। ইহারা উগ্রস্বভাব, ঈর্ষান্বিত,ধর্ম্মদ্বেষী ও অহঙ্কারী হয়।

গাত্র ও কেশের বর্ণ সম্বন্ধে উভয় মতে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা ধর্ত্তব্য নহে। কারণ বর্ণ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় ও পাশ্চাত্য লোকের ঐক্যের সম্ভাবনা নাই। তবে একটী গুরুতর বিষয়ে উভয়ের অনৈক্য দেখা যাইতেছে। পাশ্চাত্য শক্তি-প্রধান ধাতুর লোকের মাংস-পেশী ও সন্ধি-বন্ধনের দৃঢ়তাই তাহাদের প্রধান দৈহিক লক্ষণ; কিন্তু ভারতীয় পিত্ত-প্রকৃতির মনুষ্যে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য দেখা যায়। জল বায়ু ও শীতাতপের বিভিন্নতা ইহার কারণ হইতে পারে কি না, বলা দুরূহ। কিন্তু দৈহিক বলবত্তা ও মানসিক প্রবৃত্তি সম্বন্ধে উভয় মতে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাহস, তেজস্বিতা, দৈহিক ও মানসিক বল, বৈভবশালিতা বা বৈভবপ্রিয়তা ও প্রভুত্বশালিতা এবং অহঙ্কার, এই সমস্ত গুণ শক্তি-প্রধান ও পিত্ত-প্রধান উভয় শ্রেণীতেই দেখা যায়। পাশ্চাত্য প্রাচীন মতের Bilious-

স্কেণ্ডিনেভিয়ার লোক দিগের মধ্যে motive temperament এর প্রাবল্য দেখা যায় বটে, কিন্তু উপরি উক্ত কারণে তথাকার কৃষিজীবী ও অন্যান্য শ্রমজীবীদের প্রকৃতিতে আবার vital temperament অর্থাৎ কোষ্ঠ-প্রধান ধাতুর আমোদপ্রিয়তা ও চপলতা প্রভৃতি কএকটী লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

Temperament বা পিত্তপ্রধান ধাতুর সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় পিত্তপ্রকৃতির অধিকতর ঐক্যের সম্ভাবনা। কিন্তু আধুনিক শক্তি-প্রধান ধাতুর মধ্যে প্রাচীন মতের Bilious ও Sanguine উভয়ের কতক কতক থাকায় এই অনৈক্য অসম্ভাবনীয় নহে।

আয়ুর্ব্বেদে পিত্তকে সত্বগুণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। ইহাও পাশ্চাত্য মতের সহিত একটী পার্থক্য বলিয়া বোধ হয়। আবার পিত্ত সত্বগুণ হইলেও পিত্তপ্রকৃতির লোক রাজসিক বলিয়া কোন কোন কবিরাজ কে মত প্রকাশ করিতে শুনাযায়।

ক্রমশঃ

সরস্বতী-পূজা।

বিশদবরণা দেবী মাতা বাগীশ্বরী
এ মধু পঞ্চমী দিনে বঙ্গে অবতরি,
আবাল বৃদ্ধের করে লন পুষ্পাঞ্জলি;
অতুল আনন্দে বঙ্গ পড়িছে উছলি!
জ্ঞানের আলোক-তৃষ্ণা অন্তরে সবার!
জোড় করে ডাকে ভক্ত সুস্বরে বীণার—
"সরস্বতি, পূর্ণকাম কর বিদ্যাদানে,
চিরদিন নাশি ভ্রান্তি ফুটাও জ্ঞেয়ানে,
বিক্রীত চরণে তব হোক মা জীবন,
থাক্ মতি তোমাতে মা যা করি যখন!"
ভক্তিভরে মায় আমি করি আবাহন,
নিবেদি চরণ তাঁর করি বিলোকন—
"'কান্তির'কান্তিতে সবে হোক্ পুলকিত,
বিমল আলোকে কান্তি হোক
আলোকিত'।

দুর্ভিক্ষের সংবাদ।

ভারতের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থে ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ডে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। ইংলণ্ডে ৮৩০০০ হাজার পাউণ্ড উঠিয়াছে। আশা করা যায়, কান্তি গ্রাহকগণের নিকট পৌঁছিতে পৌঁছিতে আরও বহু সহস্র পাউণ্ড সংগৃহীত হইবে। ভারতবর্ষেও বড়লাট সাহেব অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। তাহাতেও ইতিমধ্যেআড়াইলক্ষ টাকার অধিক চাঁদা উঠিয়াছে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজার নিজ জমীদারীর লোকদিগের জন্য আটলক্ষ টাকা ব্যয় করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন প্রজাবর্গের রাজস্ব মহকুবাদিতে এবং পূর্ত্তকার্য্যেও আরও আটলক্ষ টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ারেলওয়ে কোম্পানির এজেণ্ট সাহেব একলক্ষ টাকা মঞ্জুর করিবার জন্য ষ্টেট্ সেক্রেটারীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাবধি তাহার কোন উত্তর পৌঁছে নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রায়ং কোটী টাকা খরচের বরাদ্দ করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশ হইতে প্রায় একলক্ষ আশি হাজার মণ চাউল ভারতে রওনা হইয়াছে। আরো নয় দশ লক্ষ মণ আসিবে। ভারতে যে ধান উৎপন্ন হইয়াছে, এবং অন্যান্য দেশ হইতে যাহা আমদানী হইতেছে, তাহা যদি ভারতে থাকিতে পাইত, তাহাহইলে চাউল দুর্ম্মূল্য হইত না। কিন্তু সে আশা বিড়ম্বনা মাত্র। যদি অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই সময় চাউল কিনিয়া রাখা যাইত; এবং পরে অল্প লাভে বিক্রয় করা যাইত, তাহাহইলে দেশের মহদুপকারের সম্ভাবনা ছিল।

প্রেম ও জ্ঞান ।

কান্তির দ্বিতীয় সংখ্যার "প্রেম ও সৌন্দর্য্য" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে, যে প্রেম ভিন্ন কোন পদার্থের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারা যায় না। কিন্তু কি প্রকারে সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়, তদ্বিষয়ে কিছুই বলা হয় নাই। এই প্রস্তাবে প্রথমেই তদ্বিষয়ে কয়েকটী কথা বলা প্রয়োজন।

সৌন্দর্য্য কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। আমরা বলিয়া থাকি, "সুন্দর চেহারা, সুন্দর গন্ধ, সুন্দর গান, সুন্দর ভাষা, সুন্দর প্রকৃতি, সুন্দর হৃদয়, সুন্দর ভাব, সুন্দর কথা, সুন্দর কবিতা, সুন্দর পুস্তক," ইত্যাদি। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, যে সৌন্দর্য্য দর্শনেন্দ্রিয়ের ন্যায় অপরাপর ইন্দ্রিয়দ্বারাও অনুভূত হয়; এবং অন্তরিন্দ্রিয়ও সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া থাকে। ফলতঃ যে পদার্থ কোন বাহ্য ইন্দ্রিয় অথবা মনের সুখকর হয়, তাহাকেই সুন্দর বলা যায়। সৌন্দর্য্য যেমন ইন্দ্রিয়গোচর, তেমনি অতীন্দ্রিয়ও হইয়া থাকে।

বহিরিন্দ্রিয়দ্বারা সৌন্দর্য্য-বোধের ক্ষমতাও সকলের সমান নহে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির, বিভিন্ন দেশীয় লোকের,এমন কি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরও সৌন্দর্য্য-বোধ ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। যে বর্ণটী একজনের চক্ষুর প্রীতিকর, তাহা অপরের চক্ষে নিতান্ত বিরক্তিকর হইতে পারে। যে রস এক ব্যক্তির নিকট পরম সুস্বাদ, অপর এক ব্যক্তির নিকট তাহা অত্যন্ত বিস্বাদ। যে গন্ধে এক জন যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করিতেছে, আর এক জনের নিকট তাহা ন্যক্কারজনক। যে সংগীতে একের মন মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে, অপরে তাহা কর্কশ বিকট চীৎকারমাত্র মনে করিতেছে। যে শয্যা এক জনের নিকট অতিশয় কোমল বিবেচিত হইতেছে, তাহাই আবার আর এক জনের নিকট কঠিন বোধ হইতেছে। একজন যে বিষয়ে অত্যন্ত মোহিত হইতেছে, অপরের নিকট তাহা নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতেছে। যে অনুষ্ঠান এক জনের নিকট পরম পবিত্র ও অতি মহৎ, অপরে তাহাকে অধর্ম্মাচরণ বা বাতুলতা বলিয়া অশ্রদ্ধা করিতেছে। রুচিই বল, প্রবৃত্তিই বল, আর অভ্যাসই বল, ইন্দ্রিয়ের অথবা মনের শক্তির বিকাশের তারতম্যানুসারেই এই সকল প্রভেদ ঘটিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। আবার ইন্দ্রিয়শক্তির যতই পরিচালনা করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্মতা অনুভব করিবার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে বিকশিত হয়, ইহাও নিশ্চয় কথা। এই কারণেই কলাবত শব্দের, চিত্রকর রূপের, বিলাসী ব্যক্তি রূপরসগন্ধস্পর্শাদি সকলেরই সূক্ষ্মতা অপর লোক অপেক্ষা অধিক অনুভব করিতে পারে। বাহ্য শোভার সূক্ষ্মতাবোধের উপরই শিল্পের ও কলাবিদ্যার উন্নতি নির্ভর করে।

বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্য-বোধের যেমন তারতম্য ও বিকাশ সম্ভব, অন্তরিন্দ্রিয়-

গোচর সৌন্দর্য্য-বোধেরও তদ্রূপ তারতম্য ও বিকাশ হইতে পারে। ভাবুক, কবি, দার্শনিক, আলঙ্কারিক, বৈয়াকরণিক, বিজ্ঞানবিৎ ও তত্ত্বজ্ঞানী প্রভৃতি উন্নত ব্যক্তিদিগের অন্তরিন্দ্রিয়ের শক্তি বা জ্ঞানের বিকাশ সাধারণ লোকের অপেক্ষা অধিকতর। যিনি যে বিষয়ের জ্ঞানের বিকাশ বা উন্নতি করিতে চেষ্টা করেন, তিনি সেই বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল অনুভব করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছেন; কিন্তু অপরের নিকট তাহা তদ্রূপ মিষ্ট বোধ হয় না। অন্তরিন্দ্রিয়ের বিষয়সকলের সৌন্দর্য্য-বোধ তো সম্পূর্ণরূপেই জ্ঞানসাপেক্ষ; বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সৌন্দর্য্য-বোধের পক্ষেও জ্ঞানই প্রধান সহায়। জ্ঞান ভিন্ন কোন বস্তুরই ভাল মন্দ বিচার করা যায় না। কি প্রাকৃতিক তথ্য, কি লোকচরিত্র, কি দেব-চরিত্র, আর কি ঐশ্বরিক তত্ত্ব; সকলই জ্ঞানের বিষয়। যার যেমন জ্ঞান, তার সৌন্দর্য্য-বোধও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। যার যে বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই, তার সে বিষয়ের সৌন্দর্য্য বিচারেরও কোন ক্ষমতা নাই।

কি বহির্জগতে, কি অন্তর্জগতে, সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য আছে। এই বিশ্ব সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার,—সৌন্দর্য্যের পসরা। কিন্তু সে সৌন্দর্য্য দেখিবার চক্ষু সকলের নাই। আবার সকলের চক্ষুর শক্তিও সমান নহে। জ্ঞানের অভাব, অসম্পূর্ণতা, ভ্রান্তি ও কুসংস্কার বশতঃই সকলে এ বিশ্বের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে পারে না। অনেক বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞানই নাই; অনেক বিষয়ে জ্ঞান একদেশদর্শী ও অঙ্গহীন; অনেক বিষয়ে বা আমরা জ্ঞানের পরিবর্ত্তে ভ্রান্তিতে পতিত,—এই সকল কারণেই আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে অসমর্থ হই। জ্ঞানই প্রকৃত তত্ত্ব। এই তত্ত্বের ভিতরই সৌন্দর্য্য নিহিত আছে।

কিন্তু, এই জ্ঞান আবার প্রেম-সাপেক্ষ। অনুরাগ ভিন্ন কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায় না। যে বিষয়ের প্রতি মনের অনুরাগ আকৃষ্ট না হয়, সে বিষয় নিতান্ত জটিল, দুর্ব্বোধ্য এবং নীরস বোধ হইতে থাকে। আবার যে বিষয়ের প্রতি যাহার যত অনুরাগ, সে ব্যক্তি সেই বিষয়ে ততই গভীর জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এবং ততই তাহা তাহার নিকট সরল, সুখবোধ্য এবং সরস ও সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়। অনুরাগ সহকারে চর্চ্চা না করিলে কোন বিদ্যা লাভ করা যায় না; কোন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি জন্মে না; কোন কার্য্যই শিক্ষা করিতে পারা যায় না। অনুরাগ জন্মাইয়া দিতে পারিলে, বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বালকই বিদ্বান্ হইতে পারে। যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয়, অনুরাগ থাকিলে নির্ব্বিশেষে তত্তাবৎ বিষয়ই বুঝিতে ও শিক্ষা করিতে পারা যায়। যে সকল বালক পাঠ মুখস্থ রাখিতে পারে না, তাহারাই আবার উপকথা ও গল্প একবার মাত্র শুনিয়াই আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়। ইহার কারণ এই যে গল্পের প্রতি মানুষের অনুরাগ যেমন সহজ, পাঠ্য বিষয়ের প্রতি সেরূপ সহজে অনুরাগ জন্মে না। বিদ্যাশিক্ষায় তাহাদের স্বাধীনতা নাই; পিতামাতা ও গুরুজনের ইচ্ছাই তথায় তাহাদের পরিচালক; তদ্ভিন্ন বিদ্যার গৌরব বা উপকারিতাও তাহারা সহজে বুঝিতে পারে না, তদ্দ্বারা

তাহাদের কোন প্রিয় বস্তুর লাভ হইবে বলিয়াও বুঝিতে পারে না; এই সকল কারণেই তৎপ্রতি তাহাদের যথেষ্ট অনুরাগ জন্মে না। অনুরাগের অভাবেই বিদ্যালাভ এত কঠিন ব্যাপার হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি গণিত বোঝে না; কোন ব্যক্তি বা বিজ্ঞান বোঝে না. কোন ব্যক্তি আবার ইতিহাস শিক্ষা করিতে পারে না। ইহার এক মাত্র কারণ এই, যে তত্তৎ বিষয়ের প্রতি তাহাদের অনুরাগ নাই। ভগবান যে তাহাকে ঐ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবার ক্ষমতাহইতে একেবারে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহা কদাচ সম্ভব নহে। অনেক সময় দেখা যায়, প্রথমে যাহা দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, পরে প্রয়োজনবোধে বা অন্য কোন কারণে যখন তাহা আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন বা চর্চ্চা করা যায়, তখন আবার অতিশয় সরল ও সুখবোধ্য হইয়া উঠিতে থাকে, এবং অল্পায়াসেই আয়ত্ত হইয়া যায়। অনেক বড় লোকের বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়, যে তাঁহাদের কেহ বা বাল্যকালে নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন; কেহ বা অবস্থাগতিকে কোন শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন নাই; বয়স্ক হইয়া তাঁহারা মহৎ গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, অথবা অধিক বয়সে বিদ্যারম্ভ করিয়াও মহাপণ্ডিত হইয়াছেন। ইহার কারণ কি এই নহে, যে অধিক বয়সে কোন কারণে ঐ সকল দিকে তাঁহাদের অনুরাগ প্রবল হইয়াছিল বলিয়াই এরূপ উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? ফলতঃ সর্ব্ব প্রকার বিদ্যা বা জ্ঞানলাভেই অনুরাগ একান্ত আবশ্যক। এই অনুরাগ প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং জ্ঞানের মূলেও প্রেম রহিয়াছে। প্রেম ভিন্ন কোন বিষয়েরই জ্ঞান জন্মে না।

যাহাকে প্রেম করা যায়, তাহার প্রকৃতি, ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রভৃতির প্রতি মন একাগ্র হইয়া লক্ষ্য করিতে থাকে; ইহাতে ঐ সকল বিষয়ে আমরা সহজেই জ্ঞান লাভ করিতে পারি; অথচ তজ্জন্য যে চেষ্টা ও চিন্তা প্রভৃতি সাধনা করিতে হইল, তজ্জনিত কোন ক্লেশ বা পরিশ্রম অনুভব করিতে পারি না। আবার প্রেমপাত্রের উপলক্ষে,— তাহার সুখ বা হিত সাধনের জন্য—অতি সহজে অপরাপর অনেক ব্যক্তি ও বস্তুসম্বন্ধেও বিস্তর অভিজ্ঞতা লাভ করি। অতএব, প্রেম কেবল তত্ত্বনির্ণয়ের অবশ্যপ্রয়োজনীয় অবলম্বনমাত্র নহে; পরন্তু আমাদিগের অজ্ঞাতসারে সাধনার ক্লেশ বুঝিতে না দিয়া, প্রেম আমাদিগকে অনেক বিষয়ে জ্ঞানী করিয়া দেয়। ফলতঃ প্রেম বিনা জ্ঞান পথে চুলমাত্র অগ্রসর হইতে পারা যায় না।

যাহাকে ভাল বাসিতে পার না, তাহার কথার সদর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না; কার্য্যের অভিসন্ধি তত্ত্বতঃ নির্ণয় করিতে পারিবে না; মনের অবস্থা বা গতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না; তাহার সুখ দুঃখে সহানুভূতি করিতে পারিবে না; তাহার আশা আকাঙ্ক্ষার মর্ম্মবোধ করিতে পারিবে না; তাহার আচরণেরও অর্থ বোধ করিতে পারিবে না। তাহার প্রকৃতি, চরিত্র ও জীবন তোমার নিকট সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বোধ্য ও অজ্ঞাত রহিয়া যাইবে; অথবা তৎসম্বন্ধে তুমি ভ্রান্তির ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া থাকিবে।

জগতে এক জাতি অপর জাতির রীতি নীতিকে কুৎসিৎ জ্ঞানে ঘৃণা করে; এক ধর্ম্মাব-

লম্বী অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে হেয় বা পতিত মনে করে এবং তাহার আচার অনুষ্ঠানকে অর্থহীন বাতুলতা, অথবা কুভাবপূর্ণ কুক্রিয়া, এবং ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহাচরণ বলিয়া গণনা করে; তাহার ভিতরে কিছুমাত্র সুন্দর, পবিত্র, ভাবযুক্ত, ভক্তিমিশ্রিত, তত্ত্বজ্ঞানসম্মত ও ভগবানের অভিপ্রায়ানুমোদিত থাকিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। ইহা হইতে জগতে কত বিদ্বেষ, হিংসা এবং অত্যাচার উৎপীড়ন সংঘটিত হইয়াছে এবং হইতেছে। প্রেমের অভাবেই মানবসমাজে এই সকল অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে। প্রেমহীনতার ফলেই সমাজে এত সঙ্কীর্ণহৃদয় পরদোষদর্শী, গর্ব্বিত, আত্মাভিমানী গোঁড়া লোক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমের অভাবেই এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে হেয়, অধম, পশুবৎ, নারকী এবং অস্পৃশ্য মনে করে। অপ্রেম অন্ধকারস্বরূপ,— অজ্ঞানতা, অবিশ্বাস, সন্দেহ, ভ্রান্তি, ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং বিরোধের স্ফূর্ত্তিসাধক। অপ্রেম সর্ব্বত্রই কু দর্শন করে, কোথাও কিছু সৎ দেখিতে পায় না;—স্বর্গেও নরক সৃজন করিয়া, আপনিই সেই নরক ভোগ করে। প্রেমই অর্থ-বোধের একমাত্র উপায়। প্রেম-জ্যোতি ভিন্ন ভ্রমান্ধকার দূর হয় না,—কোন তত্ত্বই অবগত হইতে পারা যায় না।

প্রেম ভিন্ন বিশ্বকার্য্যেও বিশ্বরাজের জ্ঞান, কৌশল, পবিত্রতা, ন্যায়, দয়া ও প্রেম প্রভৃতি তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। বিশ্বসৃষ্টির ভিতরে তাঁহার যে অপার প্রেম, অসীম করুণা, ও অনন্ত মঙ্গলাভিপ্রায় রহিয়াছে; প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে এবং সমগ্র মানব-সমাজে যে তাঁহার প্রেমের হস্ত অবিশ্রাম মঙ্গল বিধানে নিযুক্ত আছে, তাহা প্রেম ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে বুঝিতে পারা যায় না। প্রেমিক ভক্তগণ নিরক্ষর হইয়াও যে সকল গভীর তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, এবং যে সকল মহান্ সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা বড় বড় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও বুঝিতে পারেন না। জগতের অধিকাংশ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণই বিদ্যাবিষয়ে এক প্রকার মূর্খ ছিলেন। যীশু, মহম্মদ, নানক, কবীর প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। আবার যাঁহারা বিদ্বান্ ও পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারাও যত দিন বিদ্যার অহঙ্কার ও জ্ঞান-গর্ব্ব পরিহার করিয়া বিনীত দীনভাব অবলম্বন করিতে না পারিয়াছেন, ততদিন তাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান বিকাশিত হয় নাই। বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল। বিদ্যা বুদ্ধির প্রখর কূট তর্কে মনুষ্যের বিচারালয়ে কাহাকেও অপরাধী বা কাহাকেও নিরপরাধী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রেম ভিন্ন হৃদয়ের নিগূঢ় প্রদেশে কাহার কি আছে না আছে, তাহা কদাচ আবিষ্কার করা যাইতে পারে না। ইহার পরিচয় আমরা প্রতিনিয়তই পাইতেছি। সেইরূপ, প্রেম ভিন্ন ভগবানের নিগূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায়ও মানুষের বোধগম্য হয় না। ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তিকেই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বলা হইয়াছে। ভক্তি প্রেম ভিন্ন আর কি? প্রেম ভিন্ন কাহাকেই বা পাওয়া যায়? কাহাকেই বা জানা যায়? কাহার তত্ত্বই বা অবগত হইতে পারা যায়? বিশ্বকার্য্যে সহস্র সহস্র আপাত বিসদৃশ ব্যাপারের ভিতর— নানা প্রকার পরিবর্ত্তনের ভিতর, জীবন মৃত্যু—

সুখ দুঃখ ও সম্পদ বিপদের ভিতর — ভগবানের নিগূঢ় কল্যাণপ্রদ মহদভিপ্রায়, প্রেম ভিন্ন কেবল ক্ষুদ্র, ভ্রান্তিপূর্ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মোহান্ধ বুদ্ধির বিচারে কোন প্রকারেই বুঝিতে পারা যায় না। এই জন্যই অপ্রেমিকের নিকট বিশ্বসংসার ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন, মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী ছায়ায় আবৃত, অশান্তির আকর, নিরানন্দের আধার। এই কারণেই অপ্রেমিকের অবিশ্বাসপূর্ণ হৃদয় নিরন্তর ভীতি, অশান্তি, নিরাশা ও দুর্ব্বলতায় পরিপূর্ণ, বিভীষিকায় সতত সন্ত্রস্ত। পক্ষান্তরে, প্রেমিকের মুখে নিত্যানন্দজনিত প্রফুল্লতা; মনে অদম্য উৎসাহ, অসীম উদ্যম, অনন্ত আশা; হৃদয়ে অপরিমেয় দুর্জ্জয় বল, ও অব্যাহত স্ফূর্ত্তি; আত্মায় গভীর আনন্দ, শাশ্বতী শান্তি। প্রেমিক জগৎ মন্থন করিয়া, জগৎপতির প্রেমামৃত উদ্ধার করেন; এবং সেই সঞ্জীবনী সুধাপানে প্রমত্ত হইয়াই সমস্ত দুঃখজ্বালা বিস্মৃত হয়েন, এবং মৃত্যুভয় হইতে মুক্ত হইয়া, নিত্যসুখ ও নিত্যানন্দের অধিকারী হয়েন। তাঁহার প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত মনশ্চক্ষুতে মৃত্যুর অভ্যন্তরে অমৃতের উৎস, এবং বিপদের ভিতর সম্পদের সোপান প্রত্যক্ষ হয়; কাজেই তিনি জীবনে মরণে, সুখে দুঃখে বিধাতার প্রেমের জয় ঘোষণা করিতে থাকেন।

লোকসমাজের উন্নতি ও হিতসাধনের উপায় অনেকেই চিন্তা করিয়াছেন, এবং এখনও করিতেছেন। কিন্তু ইতিহাস জলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ প্রমাণ দিতেছে যে প্রেমিকেরাই জগতের প্রকৃত স্থায়ী মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ। সঙ্কীর্ণহৃদয় জ্ঞানাভিমানী কূটনীতিবিশারদগণ উপকারের নামে কেবল অপকারই সাধন করিয়াছেন। উত্তর পুরুষেরা অনেক স্থলে প্রকৃত জ্ঞানীকে চিনিতে পারিতেছে বটে, কিন্তু জীবদ্দশায় তাঁহাদিগকে সকলেই ধূর্ত্ত, ভণ্ড, বা সমাজদ্রোহী দুষ্ট লোক বলিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিয়াছে। মানবসমাজের কুরীতি দুর্নীতি বিদূরিত করিয়া, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা বিনাশ করিয়া, সমাজকে উন্নত করিতে তাঁহারা যেমন সহায়তা করিয়াছেন, এমন আর কে করিয়াছে? কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, যে বিষয়ে যে কোন উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সকলই প্রেমিকদিগের চেষ্টায়। তাঁহারা প্রেমামৃত পান করিয়া আপনারাও কৃতার্থ হইয়াছেন,—ভবের দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন; এবং জগতেও প্রেমরাজ্য স্থাপনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। প্রকৃত সুখ ও নিত্য শান্তি লাভের পন্থা ঐ প্রেমের ভিতর প্রত্যক্ষ করিয়া, এই মহাসত্য ত্রিতাপপীড়িত নর নারীর দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব তাঁহারাই তত্ত্বতঃ আবিষ্কার করিয়া নর নারীর পরিত্রাণের সহায় হইয়াছেন। প্রকৃত পুরুষার্থ—পরম তত্ত্ব— তাঁহারাই আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং প্রেমিকই যে প্রকৃত জ্ঞানী, তাহাতে সন্দেহ কি?

কেহ কেহ বলেন, প্রেম মানুষকে অন্ধ করে; কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। আমরা ভ্রান্তি ও কুসংস্কারবশতঃ অনেক সময়ে অপ্রেমকেই প্রেম বলিয়া মনে করি; তাহাতেই এরূপ বিসদৃশ ঘটনা সম্ভবিত হয়। আবার অনেক সময়ে মোহ ছদ্মবেশে প্রেমের স্থান অধিকার করে। মোহ অন্ধকারস্বরূপ;

মোহেতেই মানুষ অন্ধ বা জ্ঞানভ্রষ্ট হয়; মোহ হইতেই বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটে। এই মোহ প্রেম নহে। প্রকৃত নিস্বার্থ প্রেম জ্যোতিস্বরূপ। তবে প্রেম মানুষের উদারতা বৃদ্ধি করিয়া, সহানুভূতি এবং ক্ষমা শিক্ষা দেয় বটে। সে উদারতা অন্ধতা নহে; আর অপ্রেমিক, কঠোর-হৃদয়, কুটীল-বুদ্ধি ব্যক্তির "তীক্ষ্ণদৃষ্টিও" বাস্তবিক, তত্ত্বদর্শিনী নহে।

এই স্থলে আর একটী কথা না বলিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে সৌন্দর্য্য দেখিলেই তৎপ্রতি প্রেম করা মানবের স্বাভাবিক; সুতরাং প্রেমকে কেন সৌন্দর্য্যের আবিষ্কারক বলা হইল? এই আপত্তির আশঙ্কায় বলিতেছি, যে মানবহৃদয়ে প্রেমও স্বাভাবিক, জগতে সৌন্দর্য্যও স্বাভাবিক, সুন্দরকে প্রেম করাও মানবের প্রকৃতি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে এ বিশ্বের সূক্ষ্মতর, গভীরতর, এবং উচ্চতর সৌন্দর্য্য সহজে মানুষ অনুভব করিতে পারে না। প্রেম ভিন্ন আর কেহই তাহা দেখাইতে পারে না। জগতের যে স্থানে বাহ্য চক্ষে কিম্বা অগভীর দৃষ্টিতে আমরা কোন সৌন্দর্য্যই অনুভব করিতে পারি না, প্রেম তথায়ও স্বর্গীয়, অনুপম, চিত্তমোহন সৌন্দর্য্য প্রকাশিত করিয়া দেয়। তখন সেই সৌন্দর্য্য আবার প্রেমকে বর্দ্ধিত করে। সৌন্দর্য্য প্রেমের সৃষ্টি করে না, প্রেমও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে না; কিন্তু প্রেম সৌন্দর্য্য অনুভব করে, আর সৌন্দর্য্য প্রেমকে উত্তেজিত ও গাঢ়তর করে। পক্ষান্তরে, অপ্রেম অর্থাৎ বিরাগ, বিতৃষ্ণা, বিদ্বেষ বা বিরুদ্ধ ধারণা— সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে কেবল কদর্য্যতা প্রদর্শন করে, এবং বিদ্বেষ বর্দ্ধিত করিতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যবোধও হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। এক সময় যাহা সুন্দর বোধ হয়, কোন কারণে বিদ্বেষ জন্মিলে পর তাহার সকল সৌন্দর্য্যই — সকল গুণই— আমরা বিস্মৃত হইতে থাকি, এবং তৎস্থলে কেবল দোষই দর্শন করিতে থাকি, ইহা সকলেই জানেন।

রাজা যাদবরাম রায়।

(২১ পৃষ্ঠার পর।)

মুরশীদাবাদে রাজার এই অদ্ভুত দানের কথা অচিরেই চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; এবং বহুদূর হইতে দলে দলে ব্রাহ্মণগণ কিশোরনগরে সমাগত হইতে লাগিলেন। যাদবরামের আনন্দের সীমা নাই—দানস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে তিনি একেবারে দুইটী সুবৃহৎ পরগণা দান করিয়াছিলেন। তৎকালে প্রতিবেশী বাসুদেবপুর-রাজের অধীনে একাদশটী পরগণা ছিল। যাদবরাম ত্রয়োদশ পরগণার অধিকারী বলিয়া, বাসুদেবপুরের ব্রাহ্মণ রাজা অপেক্ষা অধিকতর মর্য্যাদা ও উচ্চতর আসন প্রাপ্ত

হইতেন। ইহাতে তাঁহার অণুমাত্র প্রীতি হইত না; লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া প্রদত্ত সম্মান গ্রহণ করিতে হইত। সেই কারণে, কৌশলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ রাজাকে তুইটী পরগণা দান করিয়া, ইচ্ছাক্রমেই নিম্নতর পদবী স্বীকার করিলেন।

যাদবরামের হৃদয় প্রেম ও প্রীতির আধার ছিল। পুত্রকন্যাগণের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ ছিল। কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্টাই তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা স্বরূপ ছিল। কর্ত্তব্যজ্ঞানের নিকট অপত্য-স্নেহও পরাজিত হইত। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীত হইত, তাহার অনুষ্ঠান না করিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। কোন বাধা বিঘ্নই তাঁহার দৃঢ় সংকল্পের ব্যতিক্রম করিতে পারিত না।

তাঁহার গৃহ পুত্র কন্যা পৌত্র দৌহিত্রে পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি প্রতিদিন বালক বালিকাদিগকে লইয়া বার্দ্ধক্যের গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া বালকের ন্যায় খেলা করিতেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ামণির প্রতি তাঁহার অতিশয় স্নেহ ছিল। গোবিন্দরাম নন্দীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া,কন্যা ও জামাতাকে অতি সমাদরে গৃহে রাখিয়াছিলেন। একদা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জামাতা অবনত বদনে আহার করিতেছেন; কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, দোলায় বসিয়া সঙ্গিনীর সহিত হাস্য পরিহাসে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহার আকার ও ভাবভঙ্গিতে ঔদাস্য প্রকটিত হইতেছে। কন্যার আচরণে যাদবরামের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। তাঁহার বোধ হইল, পিতৃগৃহে পিতার আদরে কন্যাকে রাখিয়া, তিনিই এই অশিষ্টতার কারণ হইয়াছেন। তিনি জামাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গোবিন্দরাম, তুমি রাজপুত্র নও বলিয়াই পিতৃস্নেহ-গর্ব্বিতা রাজকন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া তোমার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিতেছে। হিন্দু রমণীর এ ধৃষ্টতা অসহনীয়। তুমি তাহাকে আপন আলয়ে লইয়া যাও; যাহাতে বিষ্ণুপ্রিয়া রমণী-স্বভাবোচিত প্রেম ও স্বামীভক্তি শিক্ষা করে, তদ্রূপ বিধান করিতে ত্রুটী করিও না।"

পরদিন প্রাতেই রাজাদেশে জামাতার বাসগৃহ নির্ম্মাণের আয়োজন হইতে লাগিল। গোবিন্দরাম অশ্বারোহণে যে পরিমাণ স্থান বেষ্টন করিয়া আসিলেন, তাহাই তাঁহার বাস্তুরূপে প্রদত্ত হইল। যথাসময়ে বাসস্থান নির্ম্মিত হইলে, প্রচুর অর্থ ও ধনরত্নে ভূষিতা করিয়া কন্যাকে স্বামীভবনে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার অপত্য-স্নেহপূর্ণ কোমল হৃদয় ছিন্ন হইয়া গেল। তথাপি জীবনের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া আর কিশোরনগরে আনীত হয়েন নাই।

একদা যুবরাজ কুমারনারায়ণ কোন কার্য্যোপলক্ষে দোরো যাইতেছিলেন;পথিমধ্যে এক স্থানে দেখিতে পাইলেন, পথের এক দিকে শস্যশ্যামল উর্ব্বর ক্ষেত্র নয়নের প্রীতি উৎপাদন করিতেছে; অপর দিকে নীরস ভূমিখণ্ড ক্বচিৎ নিস্তেজ শস্যগুচ্ছে মলিন হইয়া রহিয়াছে। তিনি কথা-প্রসঙ্গে জানিতে পারিলেন, যে রাজা উভয় পার্শ্বস্থ ভূমির অর্দ্ধাংশমাত্র এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ দানের পর হইতে এক দিকের উৎকৃষ্ট অংশ দখল করিতেছে। কর্ম্মচারীগণ সাহস করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সংবাদে কুমার যারপরনাই অস-

ভুষ্ট হইয়া, ভবিষ্যতে কেহ এরূপে যথেচ্ছ কার্য্য করিতে না পারে, কর্ম্মচারিগণকে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে আদেশ দিলেন।

রাজপুত্রের এই অসন্তোষের কথা লোকপরম্পরায়, শাখাপ্রশাখায় বর্দ্ধিত হইয়া ব্রাহ্মণের কর্ণে পৌঁছিল। ব্রাহ্মণ শুনিলেন, যে কুমার প্রদত্ত ভূমি প্রতিগ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন; এবং অন্যায়পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ভূমি আত্মসাৎ করার নিমিত্ত সমুচিত শাস্তিরও বিধান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অতিশয় ভীত হইলেন। রাজার নিকট ক্ষমাভিক্ষা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, এই ভাবিয়া, অবিলম্বে কিশোরনগর যাত্রা করিলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর, চতুর্দ্দশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া, প্রত্যূষে বিশুষ্ক বদনে তোরণ-দ্বারে উপনীত হইলেন। রাজা প্রাতঃকালে বহির্গত হইয়াই ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার বিরস মুখ এবং সজল নয়ন রাজার কোমল হৃদয় আর্দ্র করিয়া ফেলিল; রাজা আর অশ্রু সম্বরণ করিতে-পারিলেন না। অগ্রসর হইয়া, গদ্গদস্বরে কাতর কণ্ঠে বিষাদের কারণ জানিতে ইচ্ছা করিলেন। ব্রাহ্মণ যাহা শুনিয়াছিলেন, সরল ভাবে বিবৃত করিলেন। যাদবরাম আশ্বাস-বাক্যে অভয়দান করিয়া তাঁহার উদ্বেগ দূর করিলেন, এবং উপরোক্ত ভূখণ্ড সমস্তই তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

ব্রাহ্মণ যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই রাজসমীপে নিবেদন করিয়াছিলেন। পরে প্রকৃত বিবরণও যাদবরামের জানিতে বিলম্ব হয় নাই; কিন্তু উষাকালে ব্রাহ্মণের যে বিষণ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, তাহা কোন প্রকারে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, দানগ্রহীতা শত শত ব্রাহ্মণ তাঁহার অন্তে এইরূপে অশ্রুজলে ভাসিবে। মহিষাদল-রাজের সহিত কুমারের যুদ্ধযাত্রার সময় হইতেই তাঁহার হৃদয়ে একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিয়াছিল; এই ঘটনায় তাহা প্রবল ঝটিকায় পরিণত হইয়া, ঘোরতর অশান্তি আনয়ন করিল।

তিনি ভাবিলেন,শত শত ব্রাহ্মণ তদীয় ভূসম্পত্তির উপস্বত্বে প্রতিপালিত হইতেছে; কাহাকেও লিখিয়া দেন নাই; মুখের কথার উপর নির্ভর করিয়াই ব্রাহ্মণগণ দান গ্রহণ করিয়াছেন; ইচ্ছা করিলেই এই নিরীহ ব্রাহ্মণদলকে অনায়াসে বঞ্চিত করা যাইতে পারে। কুমার ব্রাহ্মণের প্রতি তাদৃশ অনুরক্ত নহেন; এই ভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে,ব্রাহ্মণগণের নিস্তার থাকিবে না। বংশধরগণ দত্তাপহারী হইয়া নিরয়গামী হইবে, এ চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে বিষময় জ্বালা উৎপাদন করিল। তিনি স্থির করিলেন, নির্ব্বংশ না হইলে বিপদের আশঙ্কা বিলুপ্ত হইবে না।

মানুষ নির্ব্বংশ হইতে চাহিলেই হইতে পারে না। কিন্তু ভক্ত যাদবরাম ব্রাহ্মণকে দেবতার অংশ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; সুতরাং ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদই স্বীয় অভীষ্ট-সিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিলেন।

অবিলম্বে দেশদেশান্তর হইতে শাস্ত্র-বিশারদ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইলেন; কিশোর নগরে লক্ষ ব্রাহ্মণের বিরাট সভার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।

যথাসময়ে ব্রাহ্মণগণ উপনীত হইয়া, স্ব স্ব প্রার্থনানুযায়ী ধনরত্নাদি দান প্রাপ্ত

হইলেন। পরিশেষে বিদায়দিবসে যাদবরাম সভা-সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক করযোড়ে গললগ্নবাসে দাঁড়াইলেন। চারিদিক হইতে জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রোচ্চারণে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। যাদবরাম বলিলেন, "যদি দেবতাগণ এ দাসের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি নির্ব্বংশ হই; ইহাই আমার এক-মাত্র প্রার্থনা।" এই অভাবনীয় আশীষ প্রার্থনায় সমাগত ব্রাহ্মণবৃন্দ অবাক্ হইয়া, মূর্ত্তিমান্ তেজঃপুঞ্জসদৃশ যাদবরামের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রাজা পুনরায় বলিলেন, "আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করুন, এই আশীর্ব্বচন লাভের নিমিত্ত আমি একান্ত ব্যাকুল; যদি অধমের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, এই আশীষ প্রদানে চরিতার্থ করুন।" যাদবরামের সতেজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ বচনে ব্রাহ্মণগণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সকলেই একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মহারাজের জয় হউক, অভিলাষ পূর্ণ হউক।"

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যাদবরামের জীবনান্তে তদীয় পুত্র পৌত্র কেহই অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। পুত্র কুমার নারায়ণ দুই বৎসর পরে, এবং পৌত্র জয় নারায়ণ তিন বৎসর পরেই পরলোকগত হইলেন। দৌহিত্রের বংশধরগণই ভাবীকালে তদীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। উত্তর পুরুষেরা কেহ কখনও ব্রাহ্মণের সম্পত্তিতে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

রাজা যাদবরাম এপ্রদেশে মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। তিনি মুক্ত হস্তে ব্রাহ্মণদিগকে ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন। নানাস্থানে সেই সকল সম্পত্তি দানগৃহীতাদিগের বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন। কাযেই তাঁহার দানকীর্ত্তি অদ্যাপি অনেক পরিমাণে জানিতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার জীবনের বিস্তৃত বিবরণ জা-নিবার কোন সদুপায় নাই। শ্রুতিপরম্পরায় য-তদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পাঠকগণকে উপহার দিলাম। এই সামান্য বিবরণ হইতেই যাদবরামের যে মহত্ত্ব জানা যাইতেছে, তাহা জগতে সুলভ নহে। যদি মনুষ্যের হৃদয় এবং আচরণ দেখিয়া তাঁহার চরিত্রের বিচার করি-তে হয়, তবে যাদবরাম যে অতি উচ্চশ্রেণীর মনুষ্য ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যিনি পরদুঃখে কাতর, সম্পদে অপ্রমত্ত, বিষয়লাল-সার অতীত, স্বার্থপরতা যাঁহার নিকট অপরিচিত; স্বজাতি এবং অপর জাতির সম্বন্ধে সমদর্শী, এবং স্বধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাসী, তাঁহার আর কি গুণের অভাব রহিল?

যাদবরাম এক শতাব্দী পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াগিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার চরিত্র-প্রভাব অদ্যাপি এপ্রদেশবাসী নরনারীর স্মৃতি-পটে জীবন্ত থাকিয়া, সকলের হৃদয়ের উপর রাজত্ব করিতেছে। ইহাকেই বলে "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" যাদবরামের কীর্ত্তি-মান্ নাম অদ্যাপি ছন্দোবন্ধে আবালবৃদ্ধের কণ্ঠে গীত হইতেছে। আমরা তাঁহার দেবচরিত্র স্মরণ করিয়াও কৃতার্থ হইতেছি, এবং আত্মাকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি।

যাদবরাম ১৭৮০ খৃঃ অব্দে বৃদ্ধ বয়সে পরলোক গমন করেন। ১৭৪৫ হইতে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসর তিনি রাজত্ব করেন। নবাব আলীবর্দ্দি খাঁ ১৭৪০হইতে১৭৫৬পর্য্যন্ত-

মুরশিদাবাদের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন ; সুতরাং তিনিই যে যাদবরামকে রাজোপাধিতে ভূষিত করেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মস্তাফাখাঁর সহায়তায় আলীবর্দ্দি অথবা তদীয় পূর্ব্বাধিকারীর সহিত যাদবরামের কথোপকথন হইয়াছিল,তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে আলীবর্দ্দিকর্তৃক রাজোপাধি প্রদত্ত হওয়ায়, তিনিইযে অত্যাচারিত যাদবরামকে স্বরাজ্যে স্থাপন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ছিলেন;এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু কোন্ নবাবের আদেশক্রমে যাদবরাম ধৃত হইয়া মুরশিদাবাদে নীত হয়েন,ও পূর্ব্বলিখিত নিগ্রহ ভোগ করেন,তাহা স্থির করিবার উপায় নাই।

মানবের বল।

(১)

কেন এত অভিমান ?— কেন অহঙ্কার ?
আপনারে কর নিরীক্ষণ ;
কি আছে ক্ষমতা ?—ভেবে দেখ এক বার,
হে মানব, শুনহ বচন।

(২)

আজি মনে কত আশা মুকুলিতপ্রায়,
কা'ল সব গেল শুকাইয়া, —
বিষম সন্তাপময় নিরাশা-বাত্যায়
অই দেখ পড়িল ঢলিয়া !

(৩)

হবে তুমি এক জন মানব-প্রধান,—
করিতেছ কতই কৌশল;
নিশ্চয় অব্যর্থ হবে তোমার সন্ধান,
ভাবিতেছ, হইল সফল ;—

(৪)

কিন্তু, হায়, আচম্বিতে—দৈবের ঘটন—
ছিঁড়ে গেল কৌশলের পাশ;
পরহস্তগত হ'ল লব্ধপ্রায় ধন,
তব তরে শুধু হাহুতাশ !

(৫)

রিপু জয় করি' হবে পবিত্র-জীবন,
বাসনার দাসত্ব ঘুচাবে; —
আজি তব নবোদ্যম নবীন যৌবন,—
কতই প্রতিজ্ঞা কত ভাবে!

(৬)

অলক্ষ্যে ব্যাধের বংশী অই যে বাজিল,—
সুখ-আশা ঘোর প্রলোভন,—
বিবেক বিরোধী, কিন্তু পরাণ মজিল,—
মন-মৃগ লইল বন্ধন !

(৭)

ভেবে দেখ, সে বন্ধন করিতে ছেদন
কতবার প্রতিজ্ঞা করিলে;
কিন্তু, যাই ধ্বনি পুনঃ পশিল শ্রবণ,
অচেতন অবশ হইলে !

(৮)

যতই উঠিতে তুমি চাও নিজ বলে,
ততই যে যেতেছ ডুবিয়া ;
হাবু ডুবু হইতেছ সংসার-সলিলে,
স্রোতে কোথা চ'লেছ ভাসিয়া;

(৯)

সংসারের মোহ-মন্ত্রে মুগ্ধ তব মন,
কি কৌশলে বাঁধিল তোমায়!
নাসায় বাঁধিয়া রজ্জু ক্রীড়ক যেমন
যষ্টি হাতে ভল্লুকে নাচায়।

(১০)

কাল দণ্ড, দুটী প্রান্ত সুখ দুঃখ তার;
সুখ দেখি' আনন্দে মগন;—
অহঙ্কারে স্ফীত বক্ষ হয় যে তোমার,
কারে আর না কর গণন।

(১১)

দেখিতে দেখিতে দণ্ড ফিরিল আবার,
শুকাইল মুখ তব, হায়,—
আকাশ পূরিল তব ঘোর হাহাকার,
লুঠাইলে ধরার ধূলায়!

(১২)

সম্পদ, বিপদ, মৃত্যু,— নিয়তির গতি,—
মায়াবী সুখের প্রলোভন,
রোধিতে তোমার যদি নাহিক শকতি,
কেন তবে বৃথা আস্ফালন?

(১৩)

অসার, কথার কথা মানবের বল,—
ঠিক যেন শিশুর হুঙ্কার!
এই যে সংসার-ক্ষেত্র ভীম রণস্থল;
কত শত্রু, সংখ্যা নাই তার।

(১৪)

সেই বটে সুচতুর,— জানে আপনারে,
দীন হ'য়ে দাঁতে তৃণ লয়;
বিসর্জ্জন করি' বলবুদ্ধি-অহঙ্কারে,
মাগে সদা বিভুর আশ্রয়।

(১৫)

সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি, করুণা-নিধান,
শান্তিদাতা, পতিতপাবন;
এক মাত্র গতি; তিনি সুহৃদ-প্রধান,
চিরশিব তাঁহার চরণ;—

(১৬)

এ দৃঢ় বিশ্বাসে স্থির থাকে তার মন;
সংসারের বাসনা-নিচয়
বিভুপদে একমনে করে সমর্পণ,
শির পাতি' তাঁর বিধি লয়।

(১৭)

সদাই প্রার্থনা তার জীবনে মরণে
"তব ইচ্ছা হো'ক সম্পাদন";
নিত্যানন্দে প্রফুল্লতা তাহার আননে,
মাতৃ-ক্রোড়ে সন্তান যেমন!

(১৮)

বিভুবলে বলীয়ান্ তাহার অন্তর,
নির্ভয়ে সে যুঝে ভীম রণ;
ব্রহ্ম-কবচেতে ঢাকা তার কলেবর,
কি করিবে রিপু-প্রহরণ?

ভুলোনা আমায়!

১

চিত্র-পটে সুচিত্রিত চারু ফুল ফল,—
শ্বেত, রক্ত-লাল, নীল, সুপীত, পাটল!
অধঃ উর্দ্ধ দুই ভাগে লিখিত বিবিধ রাগে
বিলাতি অক্ষরে, মরি, "ভুলোনা আমায়"!
হেরি নিত্য এই ছবি শুইয়ে শয্যায়!

২

হেরি ছবি, বাজে প্রাণে "ভুলোনা আমায়"!
"ভুলোনা আমায়" বাজে শিরায় শিরায়!
তরল মুকুতা পারা বিদায়ের অশ্রুধারা
আবার নূতন হ'য়ে প্রাণে জড়াইয়ে
মর্ম্মের নিভৃত কুঞ্জে পড়ে গড়াইয়ে!

৩

হেরি ছবি, বাজে প্রাণে মৃদু মৃদু ঘায়
পরাণ জাগান রব "ভুলোনা আমায়"!
'ভুলোনা আমায়, দেখো, মনের কোণেতে রেখো
দাসী ব'লে কোরো দয়া, ঠেলোনা কো পায়!
আজিও কে যেন বলে অস্ফুট ভাষায়!

৪

আসিয়াছি দেশান্তরে লইয়ে বিদায়!
ছবির আড়ালে থাকি, "ভুলোনা আমায়"
ভাসিয়ে নয়ন-জলে, কে যেন এখন(ও)বলে;
অমনি অন্তরে উঠে উথলিয়া দুখ;
চমকি সমক্ষে হেরি অশ্রুমাখা মুখ!

৫

অশ্রুমাখা সেই মুখ, বুকে চাপি যায়,
বলিলাম "প্রাণেশ্বরি, দাও লো বিদায়"!
আইলাম ধীরে ধীরে, চাহিলাম ফিরে ফিরে,
হেরিলাম অশ্রুমাখা সেই চাঁদ মুখ,
চমকিয়া হেরিতেছি আজিও সে মুখ!

৬

ছবিতে বাধিছে ছবি, জলে যথা জল!
দুখেতে বাধিছে দুখ,—অনলে অনল!
তুমি হে পরম মিত্র, স্মৃতিজাগরণ-চিত্র,
বিদায়ের সেই কথা যদিও শুনাও,
বিদায়ের সেই কান্না যদিও কাঁদাও!

৭

ছবি, তব মোহ-মন্ত্র এত যদি আছে,
পার কি বহিতে সেই সরলার কাছে—
আমার প্রাণের কথা,—আমার প্রাণের ব্যথা,
আমার নয়নঝরা এক ফোঁটা জল,—
বিচ্ছিন্ন বিবর্ণ শুষ্ক এ হৃদয়-দল?

৮

যাও, তবে, প্রিয় মিত্র, ধরাসনে যথা
পড়িয়ে, হৃদয়ে চাপি হৃদয়ের ব্যথা,
হা হুতাশে নিশিদিন করি মুখ বিমলিন,
আমার প্রাণের সখী কাটায় জীবন,
বিলোল কবরী ধূলি ধূষরবরণ!

৯

যাও, মিত্র, কহ সেই সুশীলার কানে,
দেখিলে যে দুখ-জ্বালা এ দগ্ধ পরাণে!
বলিও ভুলিনি তারে, নিভৃত হৃদয়াগারে
তাহার(ই) পবিত্র মূর্ত্তি করিয়ে স্থাপন,
হ'য়ে আছি দিবানিশি ধেয়ানে মগন!

১০

বলিও— বিদায়ে যাহা কহিলা সুন্দরী,
রাখিয়াছি সে সকল(ই) হৃদয়েতে ধরি;—
একটীও ভুলি নাই; প্রতিজ্ঞাও ভাঙি নাই;
প্রবাসে আসিয়ে শুধু ভেঙেছে হৃদয়;—
ভেঙেছে সুখের স্বপ্ন, শান্তির আলয়!

আমার মোকদ্দমা।

(৩৩পৃষ্ঠার পর)

দাদার মুখে হাসি ধরে না। তিনি বলিলেন "রামার ভগ্নী আবার ভাল লোক হ'ল কিসে? রামা সৃষ্টির পাজি, তার ভগ্নী কখনই ভাললোক হ'তে পারে না।" তারপর বিনা সময়ক্ষেপে নালিশ করাই উচিত বিবেচিত হইল। মোকদ্দমা-খরচের নিমিত্ত মাতার নিকট ১০৲ টাকা আছে শুনিয়া তিনি আবার হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু, কি পরিমাণে ব্যয় হইবে জিজ্ঞাসা করায়, গাম্ভীর্য্যসহকারে বলিলেন "সে জন্য তুমি ভেবো না। না হয় আমিও সম্প্রতি ৫০৲টাকা দিব; একটা হ্যাণ্ডনোট দিলেই হবে। নালিশ রুজুর পর কোন উপায়ে পরিশোধ কর্‌লেই চল্‌বে।"

আমি, দাদা মহাশয়ের এই অযাচিত অনুগ্রহে পরম প্রীত হইলাম। তবে, যে দাদার হস্তে এখনই একটি পয়সাও ছিল না, সেই দাদাই আবার নিজে মোকদ্দমার জন্য ৫০৲ টাকা দিবার অঙ্গীকার করিতেছেন ভাবিয়া, একটু বিস্ময় হইল মাত্র।

(৩)

দুই তিন দিন পরে, একদিন প্রাতঃকালে পাঠশালা যাইব বলিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছি, মাতা শিশু পৌত্রকে কোলে লইয়া গুন্ গুন্ স্বরে বিলাপ করিতেছেন; পিতা যে তাহার মুখে অন্নাশন দিবসে অন্ন দিতে জীবিত রহিলেন না, তজ্জন্য আক্ষেপ করিতেছেন; পত্নী বাসনগুলি হাতে লইয়া ঘাটে যাইতেছে; ভ্রাতা রমানাথ গোশালা হইতে গরুগুলি বাহিরে আনিয়া গোয়াল পরিষ্কার করিতেছে; এমন সময়ে দাদা মহাশয় ছাতাটী বগলে করিয়া, ধীরে ধীরে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি হুঁকা রাখিয়া দাঁড়াইলাম। মাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন; বৌ বাম হস্ত-সাহায্যে আধহাত ঘোম্‌টা বাড়াইয়া দিল; রমানাথ গোময়-রঞ্জিত হস্তে ছুটিয়া আসিল; চারিদিকে একটা হুল স্থুল কাণ্ড বাধিয়া গেল। দাদার পদধূলি আমাদের বাড়ীতে বড় একটা পড়িত না, কাজেই তাঁহাকে আপ্যায়িত করিবার চেষ্টায়, আমিও কতকটা ব্যগ্র হইলাম; নিজেই হুঁকা লইয়া তামাক আনিতে গেলাম। মাতার ক্রন্দনে দাদা মহাশয়ের চক্ষুও যেন ছল ছল করিয়া উঠিল। তিনি গম্ভীর ভাবে অনেক উপদেশ— অনেক শাস্ত্র কথা— মানব-জীবনের নশ্বরত্বের কথা বলিয়া বুঝাইলেন। ক্রমে মাতা শান্ত হইলে, পিতার মৃত্যু সম্বন্ধে নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিল,— আমিও সময়ে সময়ে তাহাতে যোগ দিলাম।

শেষে দাদাই মোকদ্দমার কথা ফেলিলেন। তিনি থাকিতে আমাদিগের কোন চিন্তা নাই তাহা মাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন; মা বলিলেন "কাকা, আমরা গরিব লোক, মাম্‌লামোকদ্দমা বুঝিনা, তোমার উপরেই ভার।" দাদার মুখে একমুখ হাসি—গদ্গদস্বরে বলিলেন "রেজিষ্ট্রী তমস্থকের টাকা পাথরে আছড়ালেও বিনাশ নাই; সে জন্য আবার চিন্তা কি?"

মাতা। আমরা কি জানি বাপু?

দাদা। কথা কি জান, মা, তোমার পুত্রের

ভাগ্য-লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন। আমরা ঈশ্বরের কার্য্য বুঝিতে পারি না;যাতে ভাল দেখি,তা মন্দ হয়; যাতে মন্দ দেখি, তা ভাল হয় ; তাঁর অপার লীলা, আমরা কি বুঝ্ব ? সোনার বৌ সহজে টাকা দেয়নি ব'লে তুমি চিন্তিত হয়েছ, কিন্তু আমি তাতে ঈশ্বরের শুভ কামনা দেখ্তে পাচ্ছি। সহজে টাকা দিলে—সনাতনের এত সম্পত্তির অধিকারী তোমার পুত্র কি ক'রে হয় বল দেখি ? আমি নিশ্চয় বল্ছি, ২৫০।৩০০টাকার ডিক্রী করিয়ে,তার যথাসর্ব্বস্ব নীলাম ক'রে, তোমার পুত্রকে তাতে স্থাপিত কর্‌ব, তবে ক্ষান্ত হব।

দাদা মহাশয় বুক ফুলাইয়া যখন এই সব কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন, তখন আমাদেরও সাহস হ'ল,আমিও উৎসাহিত হ'য়ে উঠ লাম; আমার চক্ষু থেকে যেন একটা আবরণ স'রে গেল; এত দুঃখের উপরেও মার মুখে হাসি দেখা দিল।

দাদার কথা মতে আমারও বিশ্বাস হইল যে মোকদ্দমায় আমার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং ইচ্ছা করিয়া অকারণে সময়ক্ষেপ করা অনুচিত বোধে, দুই দিন পরেই নালিশ করিতে যাইবার কথা স্থির হইল।

(৪)

বিশ্বম্ভর-সমাগম-সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল। সংবাদ এক হইতে দশ, দশ হইতে শত সহস্র হইয়া উঠিল; লোষ্ট্র-নিক্ষেপজাত তরঙ্গশিশু বর্দ্ধিত আয়তনে সবেগে তীরে আঘাত করিতে লাগিল;সনাতন-পত্নীর নিদ্রা ভাঙ্গিল।

সকলেই বুঝিল সনাতনের এবার সব গেল। সোনার বৌ আর থাকিতে পারিল না। ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই সে ৩০৲ টাকা আসল ও ১০৲ টাকা সুদ যে কোন উপায়ে আদায় দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া লোক পাঠাইল। দাদা মহাশয় হাসিয়া সে প্রস্তাব উড়াইয়া দিলেন; আর আমরা এমন নিঃস্বার্থ পরোপকারী পরমাত্মীয়ের কথাই বা কি বুঝিয়া অবহেলা করিব ? অপরাহ্নে আবার লোক আসিল; শুনিলাম, সনাতন-রমণী ঘটি বাটি অলঙ্কারাদি বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছে ও ২০৲টাকা পর্য্যন্ত সুদ দিতে প্রস্তুত আছে। শুনিয়া মা'র মনটা ফিরিবার উপক্রম হইল—আমিও ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। দাদা কিন্তু সম্মতি দিলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমরা জাননা ব'লে ওরূপ দুর্ব্বলতা দেখাচ্ছ! দেখিবে,নালিশ করিলে প্রতি বেলায় দশ দশ টাকা বাড়িবে। দেখ দেখি কোথায় ১৮৭॥৹ টাকা, আর কোথায় ৫০৲ টাকা।" কাজেই আমরাও দাদার কথায় সায় দিলাম; লোক ফিরিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে ঈশ্বরের চরণে প্রণাম করিয়া দাদার সহিত যাত্রা করিলাম। সোনার বৌ এবার ৫৫৲টাকা লইয়া নালিশ বন্ধ করিবার জন্য হরির মাকে পাঠাইল—যাত্রা-কালে সে অনেক অনুনয় করিল; কিন্তু পর্ব্বত-নিঃসৃত স্রোতস্বতীর ন্যায়, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম,— কথা কর্ণে স্থান পাইল না। তখন আমি সৌভাগ্য-বিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, এক দিকে সুখ সম্পদও ঐশ্বর্য্য, ধনধান্যপূর্ণ প্রাসাদ; আর এক দিকে মুষ্টিমেয় ৫৫৲ টাকা। সামান্য কয়টা টাকা মনে লাগিল না। দাদা মহাশয়-নিক্ষিপ্ত উত্তেজনা-সুরায় তখন আমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান; যতই ভাবিতে লাগিলাম, ততই দাদার কথার

প্রমাণ দেখিতে পাইলাম। দুই দিনের মধ্যে ৪০ হইতে ৫৫৲ টাকায় উঠিয়াছে; মোকর্দ্দমায় আমাদের উল্লাসের কথা না থাকিলে, সনাতন-পন্থীর এত ভীত হইবার কারণ কি?

ক্রমশঃ

আত্মা এবং অনাত্মার পরিচয়।

(শঙ্করাচার্য্যের মত।)

শরীর পরিগ্রহ করিলেই দুঃখ হয়, কেননা শরীর থাকিলেই শরীরের প্রিয়াপ্রিয় থাকিবে। কর্ম্ম হেতু শরীর-পরিগ্রহ হয়। রাগাদি হইতে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। 'অহং' বা আমিত্বাভিমান হইতে রাগাদি হয়। অবিবেক বশতঃ অভিমান জন্মে। অজ্ঞান হইতে অবিবেক জন্মে। অজ্ঞানের কোন কারণ নাই; উহা অনাদি এবং অনির্ব্বচনীয়। এই অজ্ঞান হইতে পরম্পরাক্রমে অবিবেক, অভিমান, রাগাদি, কর্ম্ম, শরীর-পরিগ্রহ এবং দুঃখ উৎপন্ন হয়। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে শরীর-পরিগ্রহ নাশ হইলেই দুঃখেরও নিবৃত্তি হয়। সর্ব্বতোভাবে নাশ না হইয়া, আংশিক নাশে দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয় না। সুষুপ্তির অবস্থাতে যদিও দুঃখ থাকে না, কিন্তু পুনরায় উত্থান করিলে দুঃখারম্ভ হয়; অতএব সুষুপ্ত্যাদি আংশিক নাশে দুঃখ নষ্ট হয় না। কর্ম্ম-নাশে শরীর-পরিগ্রহ নষ্ট হয়। রাগাদির বিনাশে কর্ম্মনাশ হয়। সর্ব্বতোভাবে অভিমান নিবৃত্ত হইলেই রাগাদির নাশ হয়। সর্ব্বপ্রকারে অবিবেক নাশ হইলেই অভিমান নষ্ট হয়। নিঃশেষরূপে অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেই অবিবেক দূর হয়। জীব ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান হইলেই এই অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূর হয়।

এই স্থলে কর্ম্মবাদীগণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইল। বেদবিহিত নিত্য-কর্ম্মাদিদ্বারা কি অবিদ্যা বিনষ্ট হয় না?

জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী। কর্ম্ম অজ্ঞানের বিরোধী নহে। সুতরাং কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না। জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়।

বিচার দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। আত্মা কি, এবং অনাত্মা কি, এই বিষয়ের বিচারই জ্ঞানলাভের কারণ।

অতঃপর আত্মানাত্ম-বিবেকের অধিকারী নির্ব্বাচন করিতেছেন। সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন ব্যক্তিই ইহাতে অধিকারী। সাধন-চতুষ্টয় যথা— নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ; শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব।

নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর জ্ঞান, অর্থাৎ ব্রহ্মই এক মাত্র নিত্য সত্য, এবং জগৎ অনিত্য ও মিথ্যা, এই প্রকার সন্দেহবিহীন জ্ঞানের নাম নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক।

ইহলোকে শরীর-ধারণোপযোগী পদার্থ ভিন্ন, মাল্যচন্দনাদি ইন্দ্রিয়সম্ভোগের বস্তুতে

বমনান্ন-মূত্র-পুরীষাদির ন্যায় অনিচ্ছা বা বিরাগকে ইহলোকের ফলভোগে বিরাগ বলে। স্বর্গলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লোকসকলে অপ্সরা-সম্ভোগাদি সুখের প্রতিও উক্ত রূপ বিরাগের নাম পরলোকের ফলভোগে বিরাগ। এই ইহলোক এবং পর-লোকের ফলভোগে বিরাগই ইহামুত্র-ফল-ভোগ-বিরাগ নামে উক্ত হইয়াছে।

শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি যথা— শম, দম,উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা। অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মনের নিগ্রহ বা সংযম, অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণমননাদি বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে মনের অনাসক্তিকে শম কহে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, এই দশ বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে দম বলে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্,এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; এবং বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ,এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। ব্রহ্মবিষয়ক দর্শন-শ্রব-ণাদি-ব্যতিরিক্ত সাংসারিক বিষয় হইতে ইহাদিগের নিবৃত্তির নাম দম। বিহিত কর্ম্ম সকলের সন্ন্যাস অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম-ত্যাগকে উপরতি কহে। শ্রবণাদি বিষয়ে লিপ্ত মনকে নিবৃত্ত করিয়া, ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে নিয়োগের নামও উপরতি। যাহাতে শরীরের বিচ্ছেদ না ঘটায়, এমন শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ-সহন, অথবা নিগ্রহশক্তি থাকিতেও পরের অপরাধ সহ্য করাকে তিতিক্ষা বলে। ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণমননাদিতে নিযুক্ত মন বাসনা-বশে অন্য বিষয়ে গমন করিলে,সেই বিষয়ের নশ্বরত্বাদি দোষ উপলব্ধি করতঃ পরমেশ্বরে মনের একাগ্রতা সাধনকে বাক্যে ভক্তি ও বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কহে।

মুক্তি-লাভে একান্ত বলবতী ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব বলে।

এই চারি প্রকার সাধনবিশিষ্ট ব্যক্তি-রই আত্মানাত্মবিবেক-বিচারে অধিকার আছে, এই প্রকার ব্যক্তির এতদ্বিষয়ক বিচার ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্য নাই।

এই সাধন-চতুষ্টয়ের অভাবেও গৃহস্থগণ আত্মানাত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে ক্ষতি কিছুই নাই; প্রত্যুত প্রভূত মঙ্গল লাভ হয়। কথিত আছে,—" গুরু-সেবাদ্বারা ভক্তিলাভ করিয়া, সেই ভক্তিসহকারে বেদান্তের বিচার করিলে, অশীতি কৃচ্ছ্র ব্রতের ফল লাভ হয়।

আত্মা— স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ, এই শরীরত্রয় এবং অন্নময়াদি পঞ্চকোষ হইতে পৃথক,এবং জাগ্রৎ,স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থা-ত্রয়ের সাক্ষী এবং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। অনিত্য, জড় দুঃখায়তন এবং সমষ্টিব্যষ্টি বিশিষ্ট শরীরত্রয় অনাত্মা।

শরীরত্রয় বা দেহত্রয় যথা স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ। পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে জাত, শুভাশুভ কর্ম্মফল স্বরূপ জন্মাদি ষড়্‌বিকার-বিশিষ্ট শরীরকে স্থূল শরীর কহে। বাল্য, কৌমার, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি বয়োদ্বারা শীর্ণ হয় বলিয়া ইহাকে শরীর কহে। তথা 'দহ' ধাতুর ভস্মীকরণার্থে 'দেহ' পদ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যাহা ভস্ম হয়। যদিও কোন কোন দেহ অগ্নিসাৎ না হইয়া ভূগর্ভে প্রোথিত হয়, তত্রাপি স্থূলাদি সকল দেহই ত্রিতাপ-দ্বারা দগ্ধ হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক

স্বীয় শরীরাদি হইতে জাত শিরোরোগাদি-জনিত দুঃখকে আধ্যাত্মিক তাপ কহে। ব্যাঘ্র তস্করাদি অপরাপর প্রাণী হইতে আগত যে দুঃখ,তাহাকে আধিভৌতিক তাপ বলে। আর বজ্রপাতাদি দৈববশতঃ দুঃখকে আধিদৈবিক তাপ কহে। শরীরমাত্রই এইত্রিতাপদ্বারা দগ্ধ হয় বলিয়া, উহাকে দেহ বলা যায়।

অপঞ্চীকৃত ভূতজাত সপ্তদশাঙ্গ লিঙ্গদেহের নাম সূক্ষ্ম শরীর। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়,পঞ্চ বায়ু, বুদ্ধি এবং মন,এই সতেরটি সূক্ষ্ম শরীরের অঙ্গ। শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা,এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। স্থূলকর্ণ হইতে পৃথক্‌, কর্ণমধ্যস্থিত শব্দ-গ্রহণ-শক্তিবিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয়, তাহারই নাম শ্রোত্রেন্দ্রিয়। বাহ্য ত্বক্‌ হইতে ভিন্ন, সর্ব্বশরীরব্যাপী স্পর্শ-শক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়কে ত্বগিন্দ্রিয় কহে। অপর তিন ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু, এবং উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। হৃদয়, কণ্ঠ, শির, উর্দ্ধোষ্ঠ, অধরৌষ্ঠ, তালুদ্বয় এবং জিহ্বা, এই অষ্টস্থানবর্ত্তী বাক্যের আশ্রয়স্বরূপ শব্দোচ্চারণ-শক্তিযুক্ত যে ইন্দ্রিয়,তাহার নাম বাগিন্দ্রিয়। এইরূপ স্থূল হস্তস্থিতদান-গ্রহণাদি-শক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়কে পাণীন্দ্রিয় কহে। অপর তিনটী সম্বন্ধেও তত্তৎ স্থূল অঙ্গস্থিত কার্য্যকরী শক্তিবিশিষ্ট সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে।

নিশ্চয়স্বরূপা অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে বুদ্ধি, এবং সংকল্পবিকল্প স্বরূপা বৃত্তিকে মন বলে।

প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পাঁচটী বায়ু। প্রাণ বায়ু হৃদয়ে থাকিয়া প্রাক্‌ গমন করে। অপান পায়ুতে থাকিয়া অধোগমন করে। ব্যান বায়ু সমস্ত শরীরে থাকিয়া দেহের সর্ব্বত্র গমনাগমন করে। উদান বায়ু গলদেশে থাকিয়া উর্দ্ধ গমন করে। সমান বায়ু নাভি-দেশে থাকিয়া ভক্ষিত অন্নাদিকে সমীকরণ করে। ইহাদিগের নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, ধনঞ্জয়, ও দেবদত্ত নামে পাঁচটী উপবায়ু আছে। নাগ উদ্‌গীরণকর, কূর্ম্ম চক্ষুরাদির উন্মীলনকর, ধনঞ্জয় শরীরের পোষণকারী, দেবদত্ত জৃম্ভনকর এবং কৃকর ক্ষুধাকর।

এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু,মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশটী লিঙ্গ শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর নামে অভিহিত,এবং ভোগের সাধনস্বরূপ। ব্রহ্ম এবং আত্মার একত্বরূপ লয় অর্থে লিঙ্গ এই পদ প্রয়োজ্য হয়; এবং উক্ত একত্বজ্ঞানে শীর্ণ হয়, এই অনেক শরীর শব্দের প্রয়োগ হয়। বাক্যাদির আকার দ্বারা লিঙ্গ দেহের বিকার এবং বৃদ্ধি হয়; সুতরাং আত্মজ্ঞানে তাহাদের সংকোচন বশতঃ লিঙ্গ শরীরও ক্ষয় হয় বলিয়া, ভস্মীকরণার্থক দহ্‌ ধাতুদ্বারা দেহ পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

যে অজ্ঞান অথবা মায়াবলে জীব এই স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরে আত্মবোধ করে এবং তাহাতে আবদ্ধ হয়, এবং যাহা ব্রহ্ম এবং আত্মার অভেদ-জ্ঞানদ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই কারণ শরীর বলে। ইহাকেও পূর্ব্বোক্ত অর্থে দেহ এবং শরীর নাম দেওয়া হয়।

অনাত্মা-স্বরূপ এই শরীরত্রয়কে পূর্ব্বে মিথ্যা, জড় এবং দুঃখময় ব্যষ্টি সমষ্টি বিশিষ্ট বলা হইয়াছে। তাহার কারণ এই-ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান, এই কালত্রয়ে

যাহার বাস্তবিক সত্তা(absolute existence) নাই,তাহাকে মিথ্যা বলে। স্বীয় এবং পরকীয় বিষয়ে যাহার জ্ঞান নাই, তাহাকেই জড় বলে, প্রীতিশূন্য বস্তুকেই দুঃখ বলে। এই লক্ষণত্রয় উক্ত শরীরত্রয়ে বর্ত্তমান আছে। আবার বহু বৃক্ষের সমষ্টিগত (collective)নাম বন; ব্যষ্টিগত (individual) নাম বৃক্ষ। সেই রূপ শরীরত্রয়ের সমষ্টিগত নাম অনাত্মা এবং ব্যষ্টিগত নাম স্থূল,সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর।

পূর্ব্বে যে অবস্থা-ত্রয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার নাম জাগ্রত,স্বপ্ন ওসুষুপ্তি। যখন ইন্দ্রিয়গণ রূপাদি স্ব স্ব বিষয় অনুভব করে,তাহাকে জাগ্রতাবস্থা বলে। যখন ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়াদির অনুভব হইতে নিবৃত্ত থাকিয়াও, জাগরণাবস্থার সংস্কারজন্য সুখদুঃখাদি অনুভব করে, তাহাকে স্বপ্নাবস্থা কহে। আর, সকল বিষয়ের জ্ঞানাভাববিশিষ্ট অচেতনাবস্থাকে সুষুপ্তি বলে। এই অবস্থাত্রয়ে বর্ত্তমান পুরুষের তিন উপাধি দেওয়া হয়, যথা — বিশ্ব, তৈজস্ ও প্রাজ্ঞ। জাগরণাবস্থায় স্থূলশরীরাভিমানী পুরুষের নাম বিশ্ব, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মশরীরাভিমানী পুরুষের নাম তৈজস্ ; সুষুপ্তাবস্থায় কারণশরীরাভিমানী পুরুষের নাম প্রাজ্ঞ।

অনন্তর পঞ্চকোষের বিশেষ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। পঞ্চকোষ যথা — অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়।

মাতাপিতাকর্ত্তৃক ভুক্ত অন্ন শুক্রশোণিতরূপে পরিণত হইয়া, তাঁহাদের সংযোগে সেই শুক্রশোণিত দেহরূপে আত্মাকে আচ্ছাদন করে বলিয়া,অন্নের বিকারজাত এই স্থূল শরীরকে অন্নময় কোষ বলে। কোষ যেমন তরবারিকে আবরণ করে, তুঁষ যেমন তণ্ডুলকে আবরণ করে, অথবা গর্ভ যেমন সন্তানকে আবরণ করে, তদ্রূপ অন্নময় স্থূল দেহ আত্মাকে আবরণ করিয়া পরিচ্ছিন্ন, জন্মাদিবিশিষ্ট, ত্রিতাপাধীনের ন্যায় প্রতীয়মান করে।

প্রাণবিকারজাত পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ বায়ু মিলিত হইয়া,আত্মাকে আবরণ করত, তাহাকে বক্তা, দাতা,গৃহীতা,গন্তা, ও ক্ষুৎপিপাসাবানের ন্যায় প্রতীয়মান করে বলিয়া, ইহাদিগকে প্রাণময় কোষ বলা হয়।

মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মিলিত হইয়া আত্মাকে আবরণ করিয়া,দ্রষ্টা,শ্রোতা,শোকমোহাদিবিশিষ্ট এবং সংশয়বানের ন্যায় প্রতীয়মান করে ; এই জন্য উহাদিগকে মনোময় কোষ বলে।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে বুদ্ধি মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ হয়। ইহার প্রভাবে আত্মা কর্ত্তা,বিজ্ঞাতা,নিশ্চয়বান এবং মন্দত্ব ও জড়ত্ববিশিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

প্রীতি ও আমোদ-প্রমোদ-বৃত্তিযুক্ত অজ্ঞান-প্রধান অন্তঃকরণ, আত্মাকে আবরণ করিয়া,আনন্দময় কোষ নামে উক্ত হয়।এতৎকর্ত্তৃক আত্মা প্রীতিহর্ষাদিবিশিষ্ট, ভোক্তা এবং পরিচ্ছিন্ন সুখবিশিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

আত্মা সত্য, জ্ঞান ও সুখ-স্বরূপ;শরীরত্রয় অসত্য , জড় এবং দুঃখ-স্বরূপ। সুতরাং শরীর-ত্রয় হইতে আত্মা পৃথক্।

জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয় পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হওয়াতে, আত্মাকে ইঁহাদিগের অধিকারী বলিয়া স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে; এজন্য

আত্মাকে ঐ অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী বলা যায়। উহারাও আত্মা নহে।

“আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার স্ত্রী, আমার গবাদি সম্পত্তি” ইত্যাদি কথা ব্যবহারার্থ বলা যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহারা যেমন আমার কিছুই নহে; সেই রূপ “আমার অন্নময় কোষ, আমার প্রাণময় কোষ, আমার মনোময় কোষ”ইত্যাদি কথা লৌকিক ব্যবহার জন্য বলা হয় মাত্র। বস্তুতঃ উহারাও আত্মার কিছুই নহে।

আত্মা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের অতীত, অব্যয় ও নিত্য পদার্থ; তাহাকে জানিলে মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হয়, ইহাই শ্রুতির মত।

অতএব আত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কাহারও কর্ত্তৃক বাধিত না হইয়া, কালত্রয়ে যাহা একরূপ থাকে, তাহাকে ‘সৎ’ কহে। যাহা অন্য কাহারও কর্ত্তৃক প্রকাশিত না হইয়া আপনাকে আপনি প্রকাশিত করে, এবং আপনাতে আরোপিত সকল পদার্থের প্রকাশ করে, তাহাকে চিদ্রূপ বলে। যাহা নিত্য এবং সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়, তাহাকে আনন্দস্বরূপ বলে। শ্রুতির মতে ব্রহ্মও বিজ্ঞান, আনন্দ এবং সত্য-স্বরূপ। সংশয়রহিত হইয়া, আপনাকে ব্রহ্ম-স্বরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জীবন্মুক্তি হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

গত কয়েক বৎসরে কাঁথির এলাকায় কয়েকটী বড় বড় ডাকাতি হইয়াগিয়াছে। ডাকাইতেরা নানা রূপ অত্যাচার করিয়া প্রচুর নগদ টাকা এবং সোণারূপার অলঙ্কারাদি আত্মসাৎ করিয়াছিল। দেশ শুদ্ধ লোক ইহাদেরভয়ে সর্ব্বদাই সন্ত্রাসিত ছিল। কিন্তু এতদিন যাবৎ ইহাদিগকে দমন করা যায় নাই। কাঁথির বর্ত্তমান পুলিস ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গানারায়ণ বিশ্বাসের চেষ্টা ও যত্নে এতদিনে তাহারা ধরা পড়িয়া, নিম্ন লিখিত মতে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

মাণিকাবাসান ডাকাতিতে নবপট্টনায়ক, ভাগবৎ পট্টনায়ক এবং পচু মাইতি, প্রত্যেকে দশ বৎসরের; রাম গোবিন্দ পট্টনায়ক, বদন দাস এবং গোবর্দ্ধন গিরি, প্রত্যেকে ছয় বৎসরের কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

বগা ডাকাতিতে—রাম গোবিন্দ পট্টনায়কও পচু মাইতি, প্রত্যেকে সাত বৎসরের; এবং বদন দাস, হটী কাণ্ডার ও সেখ আবদুল প্রত্যেকে পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড হইয়াছে।

দারুয়া ডাকাতিতে, পচু মাইতি সাত বৎসরের কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর সুবৃষ্টি না হওয়ায়, এ বৎসর ভারতের অনেক স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। উত্তরপশ্চিম, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং বিহারেই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আদেশমত আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের

জীবন রক্ষার জন্য অসঙ্কোচে অর্থব্যয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত কার্য্যে খাটিয়া জীবন রক্ষা করিতেছে। সহস্র সহস্র অসহায় ও রুগ্ন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের অন্নসত্রে আহার পাইতেছে। যে সকল দুঃস্থ লোক মানের খাতিরে বা লজ্জায় গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত কার্য্যে বা অন্নসত্রে যাইতে পারিবে না, তাহাদের সাহায্যের জন্য দেশের অবস্থাভিজ্ঞ লোকসমূহ লইয়া কলিকাতায় একটি প্রধান সমিতি, এবং প্রত্যেক জেলায় এবং মহকুমায় এক একটি শাখাসমিতি স্থাপিত হইতেছে। নানাদেশীয় সহৃদয় নর নারীর ব্যক্তিগত দানে ইতিমধ্যেই সমিতির হস্তে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জমা হইয়াছে। একমাত্র বিলাতের লোকেরাই ইহার মধ্যে চল্লিশ লক্ষেরও অধিক টাকা দানকরিয়া দয়াশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষসমিতির অধিকাংশ লোকই দেশীয় ও পদস্থ, যে টাকা ইহাঁদের হস্তে জমা হইবে,তাহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার হইবে এরূপ আশা আছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের সাহায্যের জন্য যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা স্থানীয় ট্রেজারিতে জমা দিলেই, উক্ত টাকা সমিতি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। আমাদের একান্ত অনুরোধ যে আমাদের মহকুমার দানশীল মহোদয়গণ অবিলম্বে দুর্ভিক্ষ, পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ মুক্তহস্ত হইবেন।

তিন মাস পূর্ব্বে বোম্বাই সহরে "বিউবোনিক প্লেগ" নামক এক নূতন ব্যাধি দেখা দিয়াছে। গলা ও কুঁচকি প্রভৃতি স্থানে গ্রন্থি-স্ফীতি এই রোগের প্রধান লক্ষণ। এ পর্য্যন্ত ছয় সহস্রের অধিক বোম্বাই বাসী এই রোগে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এখন প্রত্যহ গড়ে এক শত কুড়ি জন লোক করিয়া মরিতেছে। প্রাণভয়ে বোম্বাই সহরের অধিবাসীগণ নানা স্থানে পলায়ন করিতেছেন। তাঁহাদিগের সহিত এই সংক্রামক ব্যাধিও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। পুনা, করাচি, দিল্লি ও কান্দাহারে রোগ দেখা দিয়েছে। যাহাতে রোগ ভারত হইতে ইউরোপে প্রবেশ করিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে ইউরোপীয় ব্যক্তিগণ নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। এই দুরন্ত রোগের প্রসার বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট এক আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া প্রজা রক্ষার জন্য যে সকল কঠোর নিয়ম প্রচার করিয়াছেন তাহাতে আশানুরূপ সুফল ফলিলেই মঙ্গল।

কোষ্ট কেনালের ভাইটগড় লক্ সারাইবার সময় দুইটি লম্বা বাতি কাষ্ঠ আড়াআড়ি ভাবে পুতিয়া, উপরে দড়ি দিয়া বাঁধা ছিল। লক্ মেরামত শেষ হইলেপর এক জন কুলিকে সেই দড়ি খুলিবার জন্য উপরে তোলা হয়। দড়ি খোলা হইয়াছে; কিন্তু হতভাগ্য কুলি দড়ি খুলিবামাত্র কাষ্ঠের সহিত পড়িয়া গিয়া জীবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে এই অপমৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

হোরমিলার কোম্পানীর ষ্টিমার কোষ্ট কেনালের ভিতর এখন দিবস ভিন্ন আর রাত্রিতে যাতায়াত করিতে পারিবে না। ইহাতে নৌকা প্রভৃতির বিপৎপতের সম্ভাবনা কমিয়াছে; কিন্তু যাত্রীদিগের বিশেষ কষ্ট হইতেছে; দুইদিনের পথে চারিদিন লাগিতেছে।

প্রেম ও শক্তি।

উদ্যম, উৎসাহ, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, আত্মসংযম, অধ্যবসায়, শৌর্য্য, বীর্য্য, তেজস্বিতা, অকুতোভয়তা, অসমসাহসিকতা, পৌরুষ, প্রভৃতি গুণ-নিচয় শক্তির পরিচায়ক। অল্প বিস্তর এই সকল শক্তি ভিন্ন পৃথিবীর কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। যে সকল কার্য্যে এই সমস্ত শক্তির সমধিক প্রয়োজন, সেই সকল কার্য্যকেই লোকে বীরত্বের কার্য্য বলিয়া প্রশংসা করে; এবং যে সকল লোক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন, তাঁহারাই বীর বলিয়া আদৃত। ফলতঃ, শক্তি ভিন্ন, ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না।

কিন্তু প্রেম সকল শক্তির মূল শক্তি। প্রেম হইতেই অন্যান্য শক্তির বিকাশ হইতে থাকে; অথবা প্রেমই মানুষকে শক্তিমান্ করিয়া দেয়। যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না; তাহার উদ্যম, উৎসাহ, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি জন্মে না; সে অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল-প্রকৃতি হয়। আবার, প্রেম, দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ দেহেও অসীম শক্তি সঞ্চার করিয়া দুঃসাধ্য, এমন কি—অলৌকিক কার্য্যও সম্পন্ন করায়।

মানুষের সমস্ত কার্য্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কোন প্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুর অনুসরণ করা; আর প্রেম-পাত্রের তৃপ্তিসাধন, বা প্রিয় বস্তুর রক্ষণ ও বর্দ্ধন। প্রত্যেক কার্য্যের ভিতরই, ইহার অন্যতর অভিপ্রায় অবশ্যই বর্ত্তমান থাকিবে। জীবন-ধারণ হইতে আরম্ভ করিয়া, জগতের নিখিল কর্ম্মমাত্রেরই মূলে প্রেম কোনও না কোনও প্রকারে নিয়ামক ও শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে। কোন প্রিয় ব্যক্তি বা বস্তু বা অবস্থার সহিত সাক্ষাত বা পরোক্ষ ভাবে যে কার্য্যের কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই, তাহা কেহই করিতে পারে না। সে কার্য্য যতই সহজ হউক, তাহা অতীব বিরক্তিজনক ও ক্লেশকর বোধ হয়। আর প্রেমের সম্বন্ধ থাকিলে, অতি কঠোর, এবং অপরের অসাধ্য কর্ম্মও অবলীলাক্রমে করিতে পারা যায়; অথচ তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হয় না; বরং সুখ ও আনন্দই জন্মে। অপ্রেম মানুষের শরীরে যেন অসাড়তা উৎপাদন করে, মনেও জড়তা জন্মায়। প্রেম, শক্তি ও জীবন সঞ্চারিত করে।

বৈশাখের দ্বিপ্রহরে ক্ষুৎপিপাসাতুর পথিক প্রেমের শক্তিতেই অগ্নিবর্ষী সূর্য্যতাপে দগ্ধ কলেবরে প্রস্তর ও কঙ্করাকীর্ণ, ছায়াশূন্য প্রান্তর অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। প্রেমের অনুরোধেই কৃষক, রৌদ্র বৃষ্টি, শীত গ্রীষ্ম, দিবা রাত্রি বিচার না করিয়া, অর্দ্ধাশনে, নগ্নদেহে, কর্ষণ, বপন, জলসেচন ও ছেদনাদি কঠোর পরিশ্রম করিতেছে। প্রেমের প্রভাবেই জননী আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, বিলাস, এমন কি, স্বীয় জীবনের মমতা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া, সন্তানের লালন পালন করিতেছেন। সন্তানের সেবায় জননীর শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই, ভ্রান্তি নাই, বিতৃষ্ণা নাই। প্রেম-

বশেই পত্নী, পতির জন্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন। প্রেম হৃদয়ে থাকিয়া, শক্তি সঞ্চার করিতেছে বলিয়াই, বণিক অকূল সমুদ্রে, জল বায়ুর ভীষণ কবলে ভাসিতেছে,এবং আত্মীয়-বন্ধুহীন, সহানুভূতিশূন্য বিদেশে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রেমের উদ্দীপনাতেই যোদ্ধা রণক্ষেত্রে মৃত্যুকে তুচ্ছ করত শত্রুর তরবারির নিম্নে মাথা পাতিয়া,এবং অগ্নিবর্ষী কামানের সম্মুখে বক্ষ প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

প্রিয় পাত্রের জন্য, নরনারী যে অহরহ ভূয়সী শক্তির পরিচয় দিতেছে, তাহা অল্প বিস্তর সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা দেখিতে ও শুনিতে পাইতেছি। প্রিয় পাত্রের কল্যাণ, বা তৎসহ মিলন সাধনের জন্য, নরনারী কতই সাহস, উদ্যম, ক্লেশ-সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, অকুতোভয়তা এবং অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া বাহুল্য মাত্র। প্রেমিক, প্রিয় পাত্রের জন্য, অনন্যসাধ্য, অলোকসামান্য শক্তির পরিচয় বিস্তর দিয়াছে। প্রেম সৎপাত্রেই ন্যস্ত হউক,আর অসৎ পাত্রে সঙ্গত হউক, সর্ব্বত্রই অদ্ভুত শক্তির কার্য্য করিয়া থাকে। এই জন্য, প্রেমিককে লোকে উন্মাদগ্রস্ত বলে। যাহার কেবল অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা, সে কখনও কোন কঠিন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। প্রেম, সুরার ন্যায় মোহ উৎপাদন করিয়া, ঐ গণনাকারিনী বুদ্ধিকে বিনষ্ট করে। সুতরাং প্রেমিক আর নিজের সুখ দুঃখ চিন্তা করিবার অবসর পায় না। কোন কার্য্যেই তাহার ভয় থাকে না ; অদম্য সাহসে তাহার হৃদয় শক্তিমান্ হইয়া উঠে;—অবলীলাক্রমে অন্যের অসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং মন্ত্রবলেই যেন তাহা সম্পন্ন করে! অপ্রেমিক ব্যক্তিরা তদ্দর্শনে অবাক্ হইয়া মনে করে, "এ আবার কি করিতেছে? কোথা হইতে ইহার এত সাহস, এত ক্ষমতা আসিল?"

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, যুগে যুগে মহাপুরুষ এবং সাধুগণ সমাজের কুরীতি দুর্নীতি দূর করিতে অগ্রসর হইয়া, কঠোরতম পরীক্ষায় পতিত হইয়াছেন। সমাজের আবালবৃদ্ধবণিতা,দরিদ্র ভিক্ষুকহইতে রাজ্যেশ্বর সম্রাট্ পর্য্যন্ত, তাঁহাদের শত্রুতা সাধনে তৎপর। যেখানে শঠ, প্রবঞ্চক, মিথ্যাচারী, পরদারী, দস্যুও নিরাপদে মানসম্ভ্রমের সহিত বাস করিতেছে, তথায় এই সকল ভগবৎপ্রেমিক, জনসমাজের শুভান্বেষী, আত্মত্যাগী মহাত্মাগণ সকলের নিকট নিন্দা ও ঘৃণার পাত্র, এবং দণ্ডনীয় হইয়াছেন। তাঁহাদের যশের আশা নাই ; কেবল অলীক লোকাপবাদ বহন করিতে হইয়াছে। কেহই তাঁহাদিগকে সহানুভূতি প্রদান করে নাই; প্রত্যুত নিরবচ্ছিন্ন ধিক্কার, তিরস্কার এবং তাচ্ছিল্যই তাঁহাদের অঙ্গভূষণ হইয়াছে। পরিত্যক্ত, গৃহহীন, এবং নিরন্ন অবস্থায় তাঁহাদিগকে সংসারে কাল যাপন করিতে হইয়াছে; কাহাকেও আবার নানা প্রকার নিষ্ঠুর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগও করিতে হইয়াছে। এক্ষণে আমরা তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতেছি, পূজা করিতেছি, তাঁহাদের স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন করিতেছি ; কিন্তু জীবদ্দশায় তাঁহাদের সমকালীন লোকেরা কেবল অত্যাচার উৎপীড়ন ভিন্ন, অপর কোন ব্যবস্থাই করে নাই! কিন্তু সেই নিঃসহায় ব্যক্তিগণের প্রাণে ভয়, ভাবনা, শোক, দুঃখ, ক্রোধ,

নিরাশা বা অশান্তি মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় নাই। কাহারও শরীর খণ্ডশঃ ছেদন করিয়া, তাহাতে লবণ এবং লেবুর রস প্রক্ষেপ করা হইয়াছে; কাহাকেও ক্রুশকাষ্ঠে লৌহ-শলাকাবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে; কাহাকেও জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইয়াছে; কাহাকেও পোট্টলিবদ্ধ করিয়া নদী-গর্ভে নিমজ্জিত করা হইয়াছে; কাহাকেও সহস্র সহস্র ব্যক্তি ইষ্টক-নিক্ষেপে হত্যা করিয়াছে; কাহাকেও বা অনাহারে মৃত্যু-সদনে প্রেরণ করা হইয়াছে;— ফলতঃ মনুষ্য-বুদ্ধিতে যত প্রকার নিপীড়নের ভীষণ কৌশল আবিষ্কৃত হইতে পারে, তাহার কিছুই ত্রুটী করা হয় নাই। কিন্তু তাঁহারা অটল অচলের ন্যায় দৃঢ়তাসহকারে নির্ভীক, নিশ্চিন্ত চিত্তে স্বীয় স্বীয় মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া, মানব-জাতির কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন! তাঁহারা এত শক্তি কোথায় পাইলেন? সামান্য স্বার্থনাশের ভয়ে, লোকে অবলীলা-ক্রমে ধর্ম্ম ও ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতেছে; উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বিরাগ বা প্রতিবেশী-বর্গের নিন্দার ভয়ে অসঙ্কুচিতচিত্তে সত্যের অপলাপ করিতেছে। লক্ষ মনুষ্যের মধ্যে এক জনও দেখিতে পাওয়া যায় না, যে ব্যক্তি ন্যায় ও সত্যের জন্যে ত্যাগ-স্বীকার করিতে পারে। অন্নগত-প্রাণ মানব-মণ্ডলী সর্ব্বদাই ভীত, ত্রস্ত এবং সঙ্কুচিত। কিন্তু, ঐ সকল মহাপুরুষগণের এত শক্তি কোথা হইতে উৎসারিত হইয়া থাকে? সংক্রামক ব্যাধির নামে আমরা ভীত হই; কিন্তু এক্ষণও তো কত নরনারী অকাতরে ভোগ-সুখ পরিত্যাগ গ্রস্ত লোকের সেবায় জীবন বিসর্জ্জন দিতেছেন; ইঁহাদের এত সাহস্ কোথা হইতে আসিতেছে? দেশহিতৈষী ও জনহিতৈষী মহাত্মাগণ কত দুঃখ, ক্লেশ ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, স্বদেশের এবং নরজাতির দুঃখ বিমোচন করিতেছেন! তাঁহাদের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় এবং দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকি। আমরা একটী লোকের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হই না, পাছে স্বীয় পুত্র কন্যার জন্য উপার্জ্জিত অর্থের দুটী পয়সা কমিয়া যায়, আর ভবিষ্যতে তাহাদের ক্লেশ হয়; কিন্তু যে মহাত্মারা স্বয়ং দরিদ্র হইয়াও সহস্র সহস্র অনাথ অনাথার অন্নবস্ত্র ও শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা কি অলৌকিক শক্তিশালী নহেন? কিন্তু তাঁহারা এ শক্তি কোথায় পাইলেন? যে দিকেই দৃষ্টি-পাত করি, যে কোন মহৎ বা অসাধারণ কার্য্যের বিষয়েই চিন্তা করি, সর্ব্বত্রই প্রেমই মুলশক্তিরূপে রহিয়াছে, দেখিতে পাই। যেখানেই প্রেম, সেইখানেই শক্তি। সকল প্রকার কঠোর, দুঃসাহসিক কর্ম্মের মূলে প্রেম রহিয়াছে। প্রেমিক সিংহদন্তে, ব্যাঘ্রনখে, হাঙ্গর কুম্ভীরের গ্রাসে বিষধরের হলাহলে, বজ্রের আঘাতে, পর্ব্বতের বাধায়, দৈবের প্রতিকূলতায় অথবা মনুষ্যের নির্য্যাতনে ভীত হয়েন না। প্রেমিকের দৃঢ়তা ধৈর্য্য, বীর্য্য, অধ্যবসায়, ক্ষমা, কিছুরই সীমা নাই। প্রেমিক আসক্তি, বিরক্তি, ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, ভয়, ভাবনা প্রভৃতি দুর্ব্বলতার অতীত।

— ভক্তি-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, লক্ষ বৎসর জপ তপ সাধনে যাহা না হয়, ভক্তিতে এক

প্রেমেরই শক্তি ঘোষণা করিতেছে। প্রেম ভিন্ন অপর কেহই রক্তমাংসের দুর্ব্বলতা দূর করিতে পারে না; প্রেমই অলৌকিক শক্তি সঞ্চার করিয়া, রিপুর সংগ্রামে মনুষ্যকে বিজয় প্রদান করে, এবং তাহাদ্বারা অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করায়। প্রেমদ্বারাই ভগবানকে ধরিতে পারা যায়, অন্য উপায়ে নহে। প্রেমিক যাহা না করিতে পারে, অপর কেহই তাহা করিতে পারে না।

প্রেমে, কি শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক বা নৈতিক, সকল শক্তিই বিকশিত হয়। যাহার প্রতি হৃদয়ের একান্ত প্রেম থাকে, তাহাকে লাভ করিবার জন্য, বা তাহার সেবার জন্য, মনুষ্য যে কত প্রকার অসমসাহসিকতা, অকুতোভয়তা, দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, এবং কষ্টসহিষ্ণুতা, কত বুদ্ধি-কৌশল, কত চতুরতা, এবং কত মানসিক তেজের পরিচয় দিয়া থাকে, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন।

প্রেম,স্মৃতি, বাগ্মিতা প্রভৃতি শক্তিকেও বিকশিত করে। প্রেম-পাত্রের বিষয়ে কদাচ বিস্মৃতি ঘটে না, প্রিয় জনের গুণকীর্ত্তনে, কিম্বা তাহার সহিত আলাপে, মূকও অসাধারণ বাগ্মিতা এবং কবিত্বের পরিচয় দেয়। প্রিয়-বিচ্ছেদে নিরক্ষর মূর্খ ব্যক্তিও যে ভাষায় শোক প্রকাশ করে; অথবা প্রিয়-সম্মিলনে যে ভাষায় প্রাণের আনন্দ জ্ঞাপন করে, তাহার শতাংশ ব্যক্ত করিতে পারিলেও মহাকবি হইতে পারা যায়।

প্রেম দুর্ব্বল শরীরে বলাধান করে, অলসকে পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু করে; ভীরুকে সাহসী করে; জড়কে বুদ্ধিমান করে; নির্ব্বোধকে সুচতুর করে; চঞ্চল প্রকৃতিকে শান্ত এবং বিবেচনাশীল করে; স্বার্থপরকে পরসেবায় নিয়োজিত করিয়া বৈরাগ্য, সরলতা সদাশয়তা, সত্যবাদিতা, প্রভৃতি মহদ্‌গুণে ভূষিত করে। প্রেম নিরানন্দ মনে আনন্দ ও স্ফুর্ত্তি বিধান করে; দুর্ব্বল হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করে। প্রেমই বিপদে ধৈর্য্য, সম্পদে বিনয়, জীবনে মধুরতা এবং মরণে শান্তি প্রদান করে। প্রেমিক দারিদ্র্যে সুখী, নির্য্যাতনে সহিষ্ণু, নিন্দায় অচঞ্চল, পরীক্ষায় দৃঢ়। প্রেম পরিত্যক্ত দীনকে সুখী করে, রোগীকে সবল ও সুস্থ রাখে,মৃত্যু-শয্যায়ও সান্ত্বনা দিতে পারে। দুঃখীর অশ্রু মোচন করিতে,অনুতপ্তের চিত্তে শান্তি দিতে, পাপীকে উদ্ধার করিতে, প্রেম ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অসাধারণ, অদ্ভুত, এবং অলৌকিক কার্য্য প্রেমিক ভিন্ন আর কে করিতে পারে? পাপপূর্ণ সংসারে স্বর্গের সুন্দর ছবি প্রেম ভিন্ন আর কে দেখাইতে পারে? মানবাত্মায় ভগবানের অবতরণ প্রেমেই সংঘটিত হয়। প্রেম বিভিন্ন পদার্থকে এক করিয়া দেয়; জীব ও ব্রহ্মের যোগ সম্পন্ন করে, এবং প্রেমই 'সোহং' মন্ত্রের সিদ্ধি প্রদান করে; সুতরাং প্রেমের তুল্য শক্তি আর কাহার আছে? হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত কর, সকল শক্তিই লাভ করিতে পারিবে।

মৃত্যু-লক্ষণ ।

রোগীর মৃত্যু হইলে, তাহার আত্মীয় স্বজনেরা তাড়াতাড়ি মৃত দেহ কবরস্থ বা দাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহার ফলে এই হয়, যে কখন কখন মৃত বিশ্বাসে জীবিত মনুষ্যেরও দেহান্ত করা হয়। মৃত্যুর ধ্রুব লক্ষণ কি, তাহা এপর্য্যন্ত কেহ স্থির করিতে পারেন নাই। সমুদায় দেহে পচ ধরিলে, কিম্বা বল-প্রয়োগদ্বারা দেহ খণ্ড খণ্ড বা চূর্ণীকৃত হইলেই, নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে মৃত্যু হইয়াছে; অন্য যে সকল লক্ষণদ্বারা মৃত্যু অনুমিত হয়, তাহার একটীও মৃত্যুর নিশ্চিত লক্ষণ নহে। অনেকেই মনে করেন, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইলেই মৃত্যু হইল; কিন্তু এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে, যেখানে বহুদিন শ্বাসক্রিয়ার অভাবেও প্রাণ-বায়ু বহির্গত হয় নাই; রোগী পরে বাঁচিয়া উঠিয়া সুস্থ হইয়াছে।

জীবিতাবস্থায়, অনবরত হৃদয়ের স্পন্দন হয়; নিদ্রাকালেও এই স্পন্দনের বিরাম হয় না। বক্ষঃস্থলের উপরে কাণ দিয়া বা stethoscope যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, ইহা স্পষ্টই অনুভূত হয়। কিন্তু, এই স্পন্দন-ক্রিয়ার অভাব হইলেও মৃত্যু হইয়াছে, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় না। অনেক স্থলে এরূপ ঘটিয়াছে, যে বহুদর্শী সুনিপুণ চিকিৎসকগণ বিশেষ-পরীক্ষা করিয়াও হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করিতে পারেন নাই; অথচ সেই রোগী দীর্ঘকাল পরে জীবিতের চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছে, ও আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

রক্তের চলাচল বন্ধ হইলে, এবং রক্ত গাঢ় হইয়া জমাট বাঁধিয়া গেলেও মৃত্যু হয় না। এইরূপ রোগীর গাত্রে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিলেও তাহার কিছুমাত্র সাড় হয় না; অথচ সে নিশ্চিত মরিয়াছে, একথা বলা যায় না। সর্ব্ব শরীর শীতল ও কাষ্ঠবৎ শক্ত হইলেও রোগী জীবিত থাকিতে পারে, ইহারও ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। জীবিতাবস্থায় শরীরের স্থানে স্থানে পচ ধরিতে পারে,ইহাত প্রায়ই দেখা যায়; সুতরাং পচ ধরাও মৃত্যুর নিশ্চিত লক্ষণের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।

মোট কথা, রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়াছে, হৃদয়ের স্পন্দন রহিত হইয়াছে, রক্ত গাঢ় ও নিশ্চল, সর্ব্ব শরীর শীতল ও শক্ত, এবং স্থানে স্থানে পচিতে আরম্ভ হইয়াছে; মৃত্যুর এই সাধারণ লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিলেও মৃত্যু ঘটিয়াছে, একথা সাহস করিয়া বলিবার যো নাই। এমন অবস্থায়, প্রাণ থাকিতেও, অজ্ঞতাবশতঃ যে কখন কখন দেহ নষ্ট করা হইবে,তাহা বিচিত্র নহে। সচরাচর ইহা ঘটে না বটে, কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও প্রকৃত; সুতরাং সাবধান হইয়া কার্য্য করাই সকলের কর্ত্তব্য। জীবিতের কোন লক্ষণ না থাকিলেও, যদি বাস্তবিক মানুষ বাঁচিয়া থাকে, আর সেই সময়ে তাহার সৎকার করা

হয়, তাহাহইলে সে কিরূপ যন্ত্রনা অনুভব করে, তাহা বর্ণনীয় নহে; পাঠক অনুমান করিয়া দেখুন!

মৃত্যুর চলিত লক্ষণসমুদায় বর্ত্তমান থাকিলেও মৃত্যু না হইতে পারে, ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

কলিকাতায় মেরি নোয়া বেষ্ট নাম্নী সপ্তদশবর্ষীয়া একটী বিবি ওলাউঠা (কলেরা) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার "মৃত্যু" হইলে,দেবদারু কাষ্ঠের একটী সিন্দুকের ভিতর সেই মৃতদেহ রাখা হইল। সিন্দুকের ডালা ইস্কুপের পরিবর্ত্তে পেরেক দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইল, এবং সিন্দুকটী যথারীতি মৃত্তিকার নিম্নে খিলান করা গৃহে রাখিয়া,গৃহের দ্বার চাবি দিয়া বন্ধ করা হইল। ইহার প্রায় দশ বৎসর পরে (ইং সন ১৮৮১ সালে),মেরীর পরিবারস্থ আর একটী লোকের মৃত্যু হওয়ায়, তাহাকে গোর দিবার জন্য সেই দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে দেখা গেল, যে মেরী যে সিন্দুকে ছিল, তাহার ডালা মেজেয় পড়িয়া রহিয়াছে; মেরীর মাথার খুলি সিন্দুকের কতকটা বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাতে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। মেরীর বস্ত্রাদি ছিন্ন, এবং তাহা সিন্দুকের গায়ে ঝুলিতেছে। ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইল, মেরীকে যখন গোর দেওয়া হয়, তখন সে মরে নাই। তাহার মূর্চ্ছা হইয়াছিল মাত্র। পরে মূর্চ্ছার অপনোদন হইলে, সিন্দুকহইতে বাহির হইবার জন্য ভয়ানক ঝটাপটি করিয়াছিল; তাহাতেই সিন্দুকের ডালা খসিয়া যায়। মাথায় লাগিয়া,সিন্দুকের উপর পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। এমনও হইতে পারে, মেরী সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রাণের আশায় বলপূর্ব্বক সিন্দুকের ডালা খসাইয়া ফেলিয়াছিল, এবং সেই ঘোর অন্ধকারময় স্থানে বসিয়া, ভয়ে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া, তাহার পরিহিত বস্ত্র ছিন্ন করিয়াছিল, ও নিজের গলা টিপিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। পরে, পূর্ব্বোক্তরূপে দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া পড়িয়া যাওয়ায়, হতভাগিনীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল।

কলিকাতার ডাক্তার চিউ, জীবিতাবস্থায় গোর দেওয়া হইতে ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন, "ইং ১৮৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে আমি'মরিলাম' বলিয়া স্থির হইল; অতি সাবধানে পরীক্ষা করিয়াও জীবনের কিছুমাত্র চিহ্ন লক্ষিত হইল না। সুতরাং গোর দিবার আয়োজন হইল। আমার দেহ সিন্দুকের ভিতর রাখা হইল। এই অবস্থায় আমি ২০ ঘণ্টা কাল থাকি। আর ঘণ্টা তিনেক থাকিলেই সমুদায় শেষ হইয়া যাইত, চিরকালের মত সিন্দুকের ডালা আঁটিয়া দেওয়া হইত। আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সিন্দুকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হেট্ হইয়া, আমার দিকে দৃষ্টিপাত করত কাঁদিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ চীৎকার করিয়া, বলিয়া উঠিলেন,'আমি ইহার ঠোঁট নড়িতেছে দেখিলাম।' আমার যে সমস্ত বন্ধু আমায় শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছিলেন,তাঁহারা আমার ভগিনীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে তাঁহার ভুল হইয়াছে, উহা তাঁহার কল্পনা মাত্র।

সত্য সত্যই মরিয়াছি, ইহা তাঁহার নিকট সাব্যস্ত করিয়া দিবার জন্য, ডাক্তার জেনাল্ডসনকে ডাকিয়া পাঠান হইল। ডাক্তার জেনাল্ডসন, কি ভাবিয়া বলিতে পারি না, আমাকে সিন্দুক হইতে বাহির করাইলেন, এবং আপাদমস্তক বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। আমার ঘাড়ের এক স্থানে একটু নরম ফুলা দেখিয়া তিনি সেইখানে ছুরি বসাইয়া দিলেন। প্রথমে কতকটা পুঁজ বাহির হইল। তাহার পর রক্ত নির্গত হইলে, আমি নড়িয়া উঠিলাম, তাহাতে ডাক্তার নিজে চমকিয়া উঠিলেন। পরে অন্যান্য ঔষধিপ্রয়োগ ও সুশ্রূষাদ্বারা আমি ক্রমশঃ পুনর্জীবন লাভ করিয়া সুস্থ হইলাম। আমার ঘাড়ে অস্ত্রের দাগ আজিও রহিয়াছে।"

নিম্নলিখিত ঘটনাহইতে,কুকুরের প্রকৃত ও অপ্রকৃত মৃত্যু চিনিবার আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অষ্ট্রীয়া দেশে,ইং ১৮৭০ সালে, এক ব্যক্তিকে মৃত বোধে সিন্দুকের ভিতর রাখা হয়। তিন দিনের পর, সিন্দুকটী গোরস্থানে লইয়া যাইবার সময়, "মৃত"ব্যক্তির কুকুরটী যেন ক্ষেপিয়া উঠিল, এবং ক্রমাগত সিন্দুকের কাছে কাছেই রহিল; কোন মতে তাহাকে তাড়াইতে পারা গেল না। অবশেষে সিন্দুক গোরস্থানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত গাড়িতে উঠাইয়া দেওয়ার উপক্রম হইলে, কুকুর সিন্দুকের বাহকগণকে এরূপ ভাবে আক্রমণ করিল, যে তাহারা সামলাইতে না পারিয়া,সিন্দুক মাটীতে ফেলিয়াদিল। মাটীতে ধাক্কা লাগিয়া সিন্দুকের ডালা ভাঙ্গিয়াগেল এবং অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তি যেন নিদ্রাবস্থা হইতে জাগিয়া উঠিল এবং সম্পূর্ণ সংজ্ঞা লাভ করিল।

যোগবলে অনেক অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে; তন্মধ্যে শরীরকে মৃতবৎ করিতে পারা একটি। ভারতের কোন কোন সাধু পুরুষ ইউরোপীয়দিগের সমক্ষে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের রাজত্ব-কালে, হরিদাস সাধু সমাধিস্থ হইয়া উক্তরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন, একথা অনেকে অবগত আছেন। এখনও জয়পুরে এক সন্ন্যাসী আছেন; তিনি যোগ-বলে মধ্যে মধ্যে সমাধিস্থ হইয়া বহু দিন মৃতবৎ পড়িয়া থাকেন। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে তিনি একবার ঐরূপে সমাধিস্থ হইলে, দিল্লীর ডাক্তার হেম চন্দ্র সেন তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, যে তাঁহার নাড়ীর গতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া, অবশেষে একবারে বন্ধ হইল। বক্ষঃস্থলে ষ্টিথস্কোপ যন্ত্র দিয়াও হৃদ্স্পন্দনের কিছু মাত্র লক্ষণ অনুভূত হইল না। সন্ন্যাসীকে সাদা চাদর মুড়ি দিয়া, ভূমধ্যস্থ ইষ্টক-নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র গৃহে রাখা হইল; এবং গৃহের দ্বার তালা চাবি দিয়া রুদ্ধ করিয়া, চাবির উপর ডাক্তারের এবং জয়পুরের মাজিষ্ট্রেটের সিল দিয়া, তালা মোহর করিয়া দেওয়া হইল। তেত্রিশ দিন গত হইলে, পরদিবস প্রাতে গৃহের দ্বার খোলা হইল। সন্ন্যাসীকে যে ভাবে রাখা হইয়াছিল, তিনি সেই ভাবেই রহিয়াছেন দেখা গেল; কিন্তু তাঁহার আকৃতি মৃতের ন্যায়, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাষ্ঠবৎ শক্ত হইয়াছিল। তাঁহাকে বাহির করিয়া আনিয়া, মুখে দুগ্ধ ও মধু লেপন করিয়া দেওয়া হইল, এবং সর্ব্ব শরীরে ও সন্ধিস্থানসমূহে তৈলদ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন

করা হইল। বৈকালে জীবিতের চিহ্ন দেখা গেল। তখন তাঁহাকে এক ঝিনুক দুগ্ধ খাওয়ান হইল। পরদিন তাঁহাকে ডালের যুষ খাইতে দেওয়া হইল। তিন দিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়া, তাঁহার নিয়মিত খাদ্য দুগ্ধ ও রুটী খাইতে সমর্থ হইলেন। যোগীবর সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং জ্ঞানী বলিয়া জনসমাজে বিশেষরূপে সমাদৃত।*

বোধ হয়, ভারতবর্ষব্যতীত অন্য কোন দেশের লোক যোগশাস্ত্রের বিষয় অবগত নহেন,বা যোগাভ্যাস করেন না। ইউরোপে আত্মহত্যায় কৃত-সংকল্প কোন কোন ব্যক্তি অপর কোন উপায় না পাইয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া, কিম্বা জিহ্বা উলটাইয়া শ্বাস-নালী রোধ করিয়া, আত্মহত্যা করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যোগ-বিশেষে শ্বাস রুদ্ধ করিবার, ও জিহ্বা উল্‌টাইয়া রাখার ব্যবস্থা আছে। ইহাতে যোগী বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া, অনাহারে দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিতে পারেন, অথচ জীবিতের কোন নিদর্শন থাকে না, এবং শরীরের ক্ষয়ও হয় না। যাহারা আত্মহত্যার অভিপ্রায়ে জিহ্বা উলটাইয়া দেয়, সম্ভবতঃ তাহারা যোগাবস্থার সদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। অন্ততঃ জিহ্বা উলটাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃতবৎ বোধ হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা সহসা মৃত্যু-মুখে পতিত হয় না, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে মৃত্যুর দ্বাদশ দণ্ড পরে শব দাহ করিবার ব্যবস্থা আছে। যথা " গমনাগমনানুরোধাদ্দ্বাদশদণ্ডাদ্বহির্দাহঃ " (রঘুনন্দন, শুদ্ধিতত্ত্ব) অর্থাৎ যমালয়ে যাইতে ও তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে বার দণ্ড সময় লাগে, অতএব তাহা বাদ দিয়া দাহ করিতে হয়। সেই সময়ের মধ্যে রোগী পুনর্জীবন লাভ করিতে পারে। এইরূপ পুনর্জীবিত ব্যক্তিকে এতদ্দেশে "যমবাহুড়া" অর্থাৎ যমের বাড়ীর ফেরৎ বলে।

কিন্তু শাস্ত্রে যাই থাকুক, প্রথা আজকাল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকের ধারণা আছে, মৃগীরোগাক্রান্ত ও সর্পদষ্ট ব্যক্তি মৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও জীবিত থাকিতে পারে। এরূপ ব্যক্তিকে অনেক স্থলে পুনর্জীবিত হইতে দেখিয়া লোকের মনে এই ধারণা হইয়া থাকিবে। অপর সাধারণ রোগে মৃত্যুর চলিত লক্ষণগুলি উপস্থিত হইলেও তৎক্ষণাৎ মৃত্যু না ঘটিতেও পারে,এবিশ্বাস কাহারও নাই; থাকিলেও তদনুযায়ী কার্য্য হয় না। দেহান্ত করিতে বিলম্ব হইলে, সকলেই তাহা একটা মহাবিপদ এবং অপমান বলিয়া মনে করেন। "বাসি মড়া করিতে নাই"এই ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আপামর সাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল আছে। আমাদের ন্যায় উষ্ণ দেশে শবদেহ অধিকক্ষণ রাখিলে, বিকৃত হইয়া,অন্যান্য লোকের স্বাস্থ্যহানি করিতে পারে, এই আশ-

* বিলাতের Spectator সংবাদ পত্রে Premature Burial নামক পুস্তকের সমালোচনায় " মৃত্যু কি ? " শীর্ষক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, আমরা তাহারই সারাংশ সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

স্কায় বোধ হয় তাহা যত শীঘ্র সম্ভব ভস্মীভূত করা হয়,কিন্তু তাহাতে যে জীবনী-শক্তি বর্ত্তমান থাকিতে পারে, এরূপ সন্দেহ কাহারও মনে উপস্থিত হয় না। শাস্ত্রে যে অনুশাসন আছে, তাহার যুক্তি কেহ অবগত না থাকায় কেহই তাহা প্রতিপালন করেন না। যাহাকে মৃত বোধে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়,সে যদি জীবনের কোন রূপ চিহ্ন প্রদর্শন করে, তাহা হইলেও তাহার রক্ষা নাই; অমনি "দানয়" পাইয়াছে বলিয়া বলপূর্ব্বক প্রাণ সংহার করিয়া,তাঁহাকে চিতানলে দগ্ধ করা হয়। মড়া "দানয়" পায়, এ বিশ্বাস আজিও অনেকের আছে। এ সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে কোনটীর আনুপূর্ব্বিক বিবরণ পাওয়া যায় নাই বলিয়া, কেবল তাহার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম।

কবি রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১) পূর্ব্ব পরিচয়।

মহাত্মা রমাপতি বাঙ্গলা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চন্দ্রকোণার প্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তদীয় পিতামহ ৺ রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় সুকবি এবং সঙ্গীতপ্রিয় লোক ছিলেন। তাঁহার গীতানুরাগ উত্তরপুরুষগণের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হইয়াছিল। রামসুন্দর অনেকগুলি ভক্তিপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীত রচনা করিয়াছেন। প্রাচীন ওস্তাদগণের মুখে তাঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক গান সময়ে সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়। রামসুন্দরের চারি পুত্র। প্রথম রামকৃষ্ণ, ও দ্বিতীয় গঙ্গাবিষ্ণুই তন্মধ্যে সমধিক বিখ্যাত। গঙ্গাবিষ্ণুর পত্নীর নাম সীতামণি দেবী। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপা ছিলেন। পতিব্রতা সীতামণিই রমাপতির গর্ভধারিণী জননী।

গঙ্গাবিষ্ণু অতিশয় দানশীল ছিলেন। দরিদ্রকে অন্নপ্রদান তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। কথিত আছে, তৎকালে পার্শ্ববর্ত্তী প্রজাবর্গের কাহারও বাড়ীতে রন্ধনের আয়োজন করিতে হইতনা। এমন কি, কাহারও কোন আত্মীয় কুটুম্ব আসিলে, তাহারাও বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। নিয়োজিত পাচকবর্গকে অবিরাম পাককার্য্যে নিরত থাকিতে হইত। কিন্তু তথাপি আত্মপর বিবেচনায় আহারীয় দ্রব্যের কখনই ইতর বিশেষ হইত না। আশ্রিতগণের মধ্যে একটী ব্রাহ্মণ অত্যধিক রাত্রিতে আহার করিতেন বলিয়া, পাচকবর্গ একদা গঙ্গাবিষ্ণুর নিকটে আপত্তি করিয়া ব্রাহ্মণকে সতর্ক করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। গঙ্গাবিষ্ণু বলিলেন, "ব্রাহ্মণের চিরাগত অভ্যাস; ইহার অন্যথা করিতে বলিলে, প্রকারতঃ তাঁহাকে অন্যত্র গমন করিতেই বলা হয়। আপনারা অদ্যাবধি ১৲ টাকা বেতন অধিক পাইবেন। ব্রাহ্মণ যখনই আসিবেন, প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে আহার করাইবেন, বিরক্তি প্রকাশ করিবেন না।"

ভিক্ষুকদিগকে প্রার্থিত প্রদানের নিমিত্ত

একজন ভাণ্ডারী নিযুক্ত থাকিত; এবং অন্ন বস্ত্র যথেচ্ছা দান করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল। দরিদ্রদিগের প্রতি তাঁহার আন্তরিক দয়া ছিল। কাহাকেও কেবল মাত্র অন্নাদি দান করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। কাহার পরিবারের কয়টী লোক, কে কে কর্ম্মক্ষম, ইত্যাদি বিষয়ে সন্ধান লইয়া, যুক্তি ও পরামর্শদ্বারা সদুপদেশ দিয়া তাহাদিগের দুঃখবিমোচনের চেষ্টা করিতেন।

পতিত ঘোষ নামক তাঁহার এক প্রিয় ভৃত্য ছিল। পতিতকে সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিতে হইত। একদা তাহাকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে এক মলিনা দুঃখিনী রমণী, শতগ্রন্থি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া, তাঁহার সমীপে যোড় হস্তে দাঁড়াইল, ও এক খানি বস্ত্র ভিক্ষা করিল। পতিত প্রভুর প্রকৃতি জানিত; সে স্ত্রীলোকটীকে বলিল, "তুমি ভাণ্ডারী ঠাকুরের নিকট যাও, তিনি তোমাকে অন্ন বস্ত্র দিবেন"। গঙ্গাবিষ্ণু পতিতকে বলিলেন, "পতিত, রমণীর ...তি চাহিয়া দেখ, অতি কষ্টে লজ্জা নিবারণ ...রিতেছে। আমরা পুরুষ, সুন্দর বস্ত্র পরিধান ...রিয়া থাকিব, আর এই স্ত্রীলোক হীন বস্ত্রে ...পণ করিবে, ইহা অপেক্ষা আর লজ্জার কথা ... আছে? "এই বলিয়া তিনি পতিতের ...জোখানি লইয়া, তাহাই পরিধান করিয়া, ...হিত বস্ত্র খানি দরিদ্রাকে দান করি... । তাঁহার এই সহৃদয় দানে দেবতারা ... হইয়া তৎক্ষণাৎ পুরস্কারের বিধান ...লেন।

গঙ্গাবিষ্ণু যে সময়ে রমণীকে বস্ত্র দান ...েন, সেই সময়ে অদূরে এক সাহেব অশ্বারোহণে গমন করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণের উদারতা ও পরদুঃখকাতরতা সদাশয় শ্বেতকায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিল। তিনি গঙ্গাবিষ্ণুর সমীপে উপনীত হইয়া, অশ্বহইতে অবতরণ করিলেন, এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় তদীয় পরিচয় গ্রহণে পরম প্রীত হইলেন।

তৎকালে ভারতের নানা স্থানে লবণ প্রস্তুত হইত, এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে লবণের গোলা থাকিত। এই সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত ইংরেজও দেশীয় বহু সংখ্যক কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। এই সাহেব কাঁথির নিমক মহলে উচ্চপদে কার্য্য করিতেন। তখন ভারতবর্ষে যেসকল ইংরেজ আসিতেন, তাঁহারা প্রায়ই ভদ্র ও সদ্বংশজাত। তাঁহারা দেশীয়দিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, এবং নানা বিষয়ে তাঁহাদিগের যুক্তি ও পরামর্শমতে কার্য্য করিতেন। ঐ সাহেবও উচ্চপ্রকৃতির গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তিনি উলঙ্গবৎ গঙ্গাবিষ্ণুর সমীপাগত হওয়া দূষণীয় মনে করিলেন না; black naked nigger বলিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ঘৃণা করিলেন না। গঙ্গাবিষ্ণুর হৃদয়ও পাশ্চাত্যশিক্ষার কথিত আলোকে আলোকিত ছিল না — তিনিও সেই অবস্থায় অপ্রতিভ না হইয়া, প্রফুল্ল ভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন, এবং সাহেবকে তাঁহার বাটীতে যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। সাহেব অবসর অভাবে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন; এবং কথাপ্রসঙ্গে, গঙ্গাবিষ্ণুর সরকারী কার্য্য গ্রহণে কোন আপত্তি আছে কি না, জানিতে চাহিলেন। গঙ্গাবিষ্ণু বলিলেন, " মর্য্যাদাসহকারে কার্য্য করিতে পাইলে

আমি কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত আছি।” সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার নাম ধাম স্মরণি-পুস্তকে লিখিয়া লইলেন, এবং কাঁথি আসিয়াই গঙ্গাবিষ্ণুকে সম্মানসূচক দেওয়ানীপদে নিযুক্ত করিয়া, কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত পত্র লিখিলেন।

সেই সময়ে কাঁথির জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর ছিল। হিজলী-কাঁথি আসিতে হইলে, লোকে বাড়ী ফিরিবার আশা বড় রাখিত না। ভাল পথ ছিল না, চারিদিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল; ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুরও অভাব ছিল না। লবণাক্ত জলবায়ুর প্রকোপে মনুষ্যকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিত। গঙ্গাবিষ্ণু কাঁথি যাইবেন শুনিয়া, অনেকেই নিষেধ করিল; পিতৃত্যক্ত প্রভূত সম্পত্তির উল্লেখ করিয়া,তাঁহার চাকরি করা অনাবশ্যক বলিয়া, কার্য্য গ্রহণ করিতে নিবারণ করিল। গঙ্গাবিষ্ণু সাহেবের নিকট যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার অন্যথা করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না; সত্যনিষ্ঠ গঙ্গাবিষ্ণু মাতার আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া হিজলি আগমন করিলেন। তিনি এক বৎসর কাল মর্য্যাদাসহকারে প্রশংসার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

গঙ্গাবিষ্ণু কবিত্বপ্রিয় ছিলেন। গীত বাদ্যে তাঁহার হৃদয়ের প্রীতি ছিল। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি থাকায়, অতি সহজেই অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কোন ওস্তাদ রাখিয়া শিক্ষা লাভ করেন নাই; প্রকৃতি-দত্ত আশ্চর্য্য ক্ষমতা-বলে, যাহাই শুনিতেন, তাহাই আয়ত্ত করিয়া লইতে পারি-

শুনিয়া সকলেই বিমোহিত হইত। উচ্চশ্রেণীর মৃদঙ্গী বলিয়াও তাঁহার সুখ্যাতি ছিল।

সঙ্গীতানুরাগী গঙ্গাবিষ্ণুর নিকট কবিত্ববিহীন দেওয়ানীপদ মূল্যবান বলিয়া প্রতীত হইল না। নিমকির চাকুরিতে প্রচুর লাভ ছিল; এমন কি, এক একটা সামান্য চাকরী করিয়াও কর্ম্মচারিগণ প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। শুনা যায়, এক ব্যক্তি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল মাত্র ভিক্ষাদ্বারা ৭০।৮০টাকা উপার্জ্জন করিত। দেওয়ানী পদ উচ্চপদ, কাযেই লাভের আশাও তদনুরূপ। কিন্তু গঙ্গাবিষ্ণু তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি দেখিলেন, এই গুরু কার্য্যে লিপ্ত হইয়া, তাঁহার সাধের সঙ্গীতালোচনা শিথিল হইয়া যাইতেছে; কার্য্যত্যাগব্যতীত সমুদয় সময় গীতবাদ্যে নিয়োজিত করিবার উপায় নাই। তিনি আপন অভিপ্রায় সাহেবের নিকট বিজ্ঞাপিত করিলেন। গঙ্গাবিষ্ণুর কার্য্যে সাহেব নিতান্ত পরিতুষ্ট ছিলেন। তিনি কর্ম্মত্যাগ করেন, সাহেবের এরূপ ইচ্ছা ছিল না। শেষে গঙ্গাবিষ্ণুর আগ্রহাতিশয়দর্শনে সাহেব তাঁহার কোন আত্মীয়কে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অবসর গ্রহণে অনুমতি দিলেন; এবং তিনি ইচ্ছা করিলে ২।১ বৎসর মধ্যে ঐ পদ পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন, তাহাও জানাইলেন। তদনুসারে গঙ্গাবিষ্ণু আপন জ্যেষ্ঠ সহোদর রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়ানী পদে স্থাপিত করিয়া চন্দ্রকোণায় প্রত্যাগমন করেন।

রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অতি দক্ষতার সহিত বহুকাল যাবৎ কার্য্য করিয়া

দূর সন্তুষ্ট ছিলেন,যে নিমক মহালের যাবতীয় কর্ম্মচারী নিয়োগের ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত হইয়াছিল, এবং তিনিও কখনই তাহার অপব্যবহার করেন নাই।

সঙ্গীত-শাস্ত্রে রামকৃষ্ণেরও বিশেষ জ্ঞান ছিল। তিনি মধ্যম সহোদর গঙ্গাবিষ্ণুর ন্যায় সুগায়ক ও পদকর্ত্তা ছিলেন। শুনাযায়, তাঁহার কণ্ঠস্বর এত মধুর ছিল যে, লোকে তাঁহাকে গন্ধর্ব্ব কিন্নরের সহিত তুলনা করিত। তিনি যখন তানপুরা লইয়া সঙ্গীতালাপ করিতেন, তখন মূর্ত্তিমান্ মহাদেবের কথা সকলের স্মরণ-পথে উদিত হইত।

মেদিনীপুরের দক্ষিণে যকপুর গ্রামের রাজীবলোচন রায় মহাশয় কাননগুইএর কার্য্য করিতেন। মহাশয়বংশীয়গণও সঙ্গীতের আদর করিতেন এবং সঙ্গীতচর্চ্চায় সময়ক্ষেপ করিতে ভাল বাসিতেন। মহম্মদ বক্স ও আসমত উল্লা নামক দুই বিখ্যাত গায়ক যকপুরে আসিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যকপুরে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাদের সহিত পরিচিত হয়েন। রামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে চন্দ্রকোণায় যাইবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ করিলেন। তৎকালে চন্দ্রকোণার সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। সঙ্গীতচর্চ্চা এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, যে রাখাল, তন্তুবায়, ভিক্ষুক প্রভৃতি সকলেই সঙ্গীতের আস্বাদন বুঝিত, এবং মিষ্টস্বরে গান করিতে পারিত। আসমত উল্লা ও মহম্মদ বক্স চন্দ্রকোণা দর্শনে এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন, যে গঙ্গাবিষ্ণুর অনুরোধে তাঁহারা ৫।৬ বৎসর কাল তথায় বাস করিয়াছিলেন।

চন্দ্রকোণার অধিপতি রাজা চন্দ্রকেতুই চন্দ্রকোণাবাসিগণের গীতানুরাগের প্রথম বীজ বপন করেন। ক্রমে সঙ্গীতবিশারদ মহাত্মাগণের সহায়তায় সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। পরে, বন্দ্যোপাধ্যায়বংশীয়গণের চেষ্টায় তাহা শাখাপল্লববিশিষ্ট মনোরম তরুর আকার ধারণ করিয়াছিল। তৎকালে চন্দ্রকোণা সঙ্গীতালোচনার এক প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। উত্তর পশ্চিম দেশীয় কোন কালোয়াৎ এ অঞ্চলে আসিলে, চন্দ্রকোণা না দেখিয়া যাইত না। বহুদূর হইতে সঙ্গীতনিপুণ ব্যক্তিগণ চন্দ্রকোণায় সমাগত হইতেন।

যে সময়ে চন্দ্রকোণার এই গীতানুরাগ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছিল, সেই সময়ে সঙ্গীতপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে কবি গঙ্গাবিষ্ণুর ঔরসে মহাত্মা রমাপতির জন্ম হয়। সময়, স্থান, সংসর্গ, সকলই তাঁহার কবিত্ব ও সঙ্গীতপ্রিয়তা বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিল। পিতার যত্ন ও উৎসাহে বাল্যাবধিই তিনি সঙ্গীতানুরাগী হইয়া উঠেন। গঙ্গাবিষ্ণু পুত্রকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত আসমত উল্লা ও মহম্মদ বক্সও চন্দ্রকোণায় অবস্থান কালে রমাপতিকে বহুবিধ স্বর ও রাগ রাগিণী শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য মেধা দর্শনে ওস্তাদ দিগকেও বিস্মিত হইতে হইত; এবং তাঁহারা সময়ে সময়ে রমাপতির কূটপ্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারিয়া পরাস্ত হইতেন।

ক্রমশঃ।

বসন্ত ।

১

ডালে বসি মুহুর্মুহু
ডাকে পাখী কুহু কুহু,—
ওটী কোন্ পাখী ?
হরিত অরুণ বর্ণ
বসন্তের বৃক্ষ-পর্ণ ,
তাহে দেহ ঢাকি ,
আন্দোলি মলয় বায় ,
কেও পাখী ডালে গায়
কুহু কুহু কুহু !
ঝুর ঝুর , ফুর ফুর,—
বহে বায়ু কি মধুর,
কভু হুহু হুহু !
লোকে যে বসন্ত কহে,
সে বসন্ত ফুলে নহে, —
নহে তরু দলে ,—
হরিত প্রান্তরে নহে, —
নহে স্নিগ্ধ গন্ধবহে, —
নহে বাপী-জলে, —
চাঁদে বা তারায় নহে ;
সে বসন্ত সদা রহে
অই কুহু স্বরে !
অই কুচ কুচে কালো
দেহমাঝে — আছে আলো—
কুহুর নির্ঝরে !
সে আলো অন্তরে পরে ,
ও কুহকী কুহু ঝরে
বিশ্ব মাতাইয়ে !
কুহু সুধা করি পান,
শীতার্ত্ত এ বিশ্ব খান
উঠিছে ফুলিয়ে
ধরা এবে নহে মরু ,
সাজিতেছে লতা তরু
পাতায় পাতায় !
ধীরে আসি গুড়ি গুড়ি ,
উকি মারে ফুল-কুঁড়ি
তরু লতিকায় !
কানে কানে কহে অলি,
"ফুট ফুট ফুল-কলি ,
ফুট ত্বরা করি !
ছ মাসে বসন্ত যাবে ,
কুহু না শুনিতে পাবে ,
শোকে যাবে ঝরি !
ফুট লো, ছুটুক বাস ,
ফুট লো উঠুক ভাস,
দেখি আঁখি ভরি !
কোকিলের কুহু ভাষ ,
ফুলের বিমল হাস ,
ফুলের সৌরভ,—

তিন সুধা-উপচারে
বিশ্ব-পতি পুজিবারে
এসেছে মাধব ! ”

মলয়-অনিল ধীরে
বিশ্বমাঝে ফিরে ফিরে
বিভু গুণ গায় !
আইস, বসন্তসনে
আমরাও প্রাণ মনে
সঁপি বিভু পায় !
তাঁহার (ই) রচিত ফুলে,
আইস, যতনে তুলে,
পুজি পদ তাঁর !
বৎসর বাহক হ’য়ে,
যাবে তাঁর কাছে ল’য়ে
পূজা-উপচার !

২

গতপ্রায় সম্বৎসর ;
পুজিবারে বিশ্বেশ্বর
বসন্ত আইল !
তরুলতা মুঞ্জরিল,
মধুকর গুঞ্জরিল,
পিক কুহরিল !

মৃত্যু-সভা।

আঁধার রজনী ঘোর ; নিশীথ সময়ে,
সভায় বসিল মৃত্যু অনুচর ল’য়ে।
ভীষণ মূরতি তার, ঘোর কৃষ্ণকায়
মাংসহীন, চর্ম্মে ঢাকা, অস্থি দেখা যায়।
দগ্ধ কাষ্ঠ হস্ত পদ, দীর্ঘ অতিশয় ;
দড়ার মতন তায় ধমনী-নিচয়।
লম্বা চুল গোঁফ দাড়ি, তামার বরণ,
এলো মেলো, ঠিক যেন ঝাঁটার মতন।
গভীর বিবর মুখে, আকর্ণবিস্তৃত,
বড় বড় দুই পাটী দন্ত বিরাজিত ;
গোল গোল দাঁতগুলি সূচীমুখ তায়,
দূরে দূরে, কেহ নাহি লাগে কারো গায় ;
ছুটিতেছে যেন তায় রুধিরের ধার !
তরাস লাগয়ে দেখি বিকট আকার।
উপরে উত্তুঙ্গ নাসা দীর্ঘ অতিশয়,
রন্ধ্র ছুটী দেখি যেন সুড়ঙ্গের প্রায় !

কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষু জবার বরণ ;
কট্‌ মট্‌ দৃষ্টি যেন উগারে জ্বলন !
পরিধানে রক্ত বস্ত্র— রুধিরে রঞ্জিত ;
হাড়মালা হাড়বালা সর্ব্বাঙ্গে লম্বিত।
রাজ-সিংহাসনে মৃত্যু উঠিয়া বসিলা ;
গম্ভীর কর্কশ স্বরে কহিতে লাগিলা,—
“ অদ্য আমি রাজমন্ত্রী নিয়োগ করিব,
তোমাদের মধ্যে যোগ্য বুঝিয়া লইব।
এই স্বর্ণদণ্ড শোভা পাবে তার করে ;
মর্য্যাদা হইবে তার সবার উপরে।
অতএব যোগ্যতা যে আছয়ে যাহার,
বল সবে সভামাঝে করিয়া বিস্তার।”
যতেক ভীষণ রোগ মৃত্যুর কিঙ্কর,
চাহিল দণ্ডের পানে লোলুপ-অন্তর।
অতঃপর, একে একে উঠি দাঁড়াইল,
যার যে যোগ্যতা, ক্রমে বলিতে লাগিল।

সবার অগ্রেতে উঠি দাঁড়াইল জ্বর ,
ভীম দাহে দগ্ধ তনু, কাঁপে থর থর।
শিরেতে বিষম ব্যথা ; আরক্ত নয়ন ;
তৃষাকুল কণ্ঠে কয়,— "করি নিবেদন ;—
আমার দক্ষতা তব আদেশ পালনে ,
বুঝিবে, রাজন্, মৃত্যুসংখ্যার গণনে।
সামান্য কারণ মাত্র পেলে একবার ,
শরীরে পশিয়া করি জীবন সংহার।
বাতশ্লেষ্মা, সন্নিপাত, যকৃত, উদরী ,
প্লীহা, গুল্ম, শোথ,— মম কিঙ্কর কিঙ্করী।
নানা রূপে নানা স্থানে করি পর্য্যটন ,
কত ছলে করি আমি জীবের নিধন !
জিজ্ঞাসিয়ে দেখ, প্রভো, সভাসদ্‌গণে ,
কি নিপুণ আমি তব আদেশ পালনে।"
নিবেদন করি' জ্বর বসিল আসনে ;
অমনি উঠিল বাত কম্পিত চরণে।
মুখ খানি বাঁকা তার আড়ষ্ট রসনা ;
অর্দ্ধ অঙ্গ শুষ্ক ; অর্দ্ধে বিষম বেদনা।
হাত পায়ে যত গ্রন্থি, স্ফীত অতিশয় ;
যষ্টি হাতে দাঁড়াইয়া দিল পরিচয় ,—
"কি কব, রাজন্, বল, কৌশল আমার ?
বুঝিতে না পারে বৈদ্য আমার সঞ্চার ;—
কভু শিরে, কভু পৃষ্ঠে, কভু বা চরণে;
শিরায় শিরায় ভ্রমি নিপুণ গমনে !
ক্ষণেক লুকাই, ক্ষণে হইয়ে প্রকাশ,
কতই কৌশলে করি জীবের বিনাশ।
মূর্চ্ছা, স্তম্ভ, পক্ষাঘাত, আক্ষেপ, টঙ্কার,—
মম অনুচর সবে,— বিষম দুর্ব্বার !
বর্ণিতে আপন গুণ পাই বড় লাজ,
যে হয় বিচার নিজে কর, মহারাজ !"
এতেক বলিয়া বাত নীরব হইল;
পড়িতে পড়িতে যক্ষ্মা উঠে দাঁড়াইল।

সর্ব্ব অঙ্গ শুষ্ক তার ,— অস্থিচর্ম্মসার ,—
কোটরে প্রবিষ্ট চক্ষু, ভীষণ আকার !
থেকে থেকে খুক্ খুক্ কাসিতে কাসিতে,
ক্ষীণস্বরে কয় কথা, না পাই শুনিতে।
"কে করিবে অস্বীকার আমার কৌশল?
কখনো আমার চেষ্টা হয় না বিফল।
ধীরে ধীরে শোণিত শুষিয়ে করি ক্ষীণ,
দিনে দিনে করি দেহ বলমাংসহীন।
বহুদিন প্রাণ সহ অপার বাসনা
রাখি,জীবে দেই ঘোর নরক-যাতনা।
লিখে দিতে পারি আমি সোণার অক্ষরে ,
নিষ্কৃতি নাহিক কারো,— ধরি আমি যারে।
এই হস্ত, পদ, চক্ষু, দেখহ আমার ,
হই কি না যোগ্য, এবে করহ বিচার।"
বলিয়া বসিল যক্ষ্মা ; আর এক জন ,—
শত হস্ত প্রসারিত , ঘূর্ণিত লোচন ;
যোজন প্রমাণ তার করাল বদন ,
লোল জিহ্বা, রক্ত দন্ত, কঠোর বচন !
ভীষণ মূরতি তার দেখে লাগে ভয় ;
মৃত্যুরাজে সম্ভাষিয়া মহা দম্ভে কয় , —
"মম সম দক্ষ আর কে আছে হেথায় ?
কার নামে জীবগণ এত ভয় পায় ?
নগরের প্রান্তে যদি করি পদার্পণ ,
শুকায় সবার বুক ;— আতঙ্ক ভীষণ !
বৈদ্য না আইসে কাছে নাম যদি শোনে ,
সংক্রামক বলি ত্যজে প্রতিবাসিগণে।
এই যে দেখিছ বাহু শতেক আমার ,
শত হস্তে করি আমি জীবের সংহার !
অন্যে যা করিতে পারে পঞ্চাশ বরষে,
অবহেলে করি আমি দু চারি দিবসে !
এই মম দেহ, নিজে কর বিলোকন,
বিচার করহ মম যোগ্যতা রাজন্ !"

এইরূপে যত জন ছিল সে সভায়,
একে একে নিজ নিজ যোগ্যতা জানায়।
সকলের কথা, মৃত্যু ,করিয়া শ্রবণ,
কহিতে লাগিলা পুনঃ করি সম্ভাষণ,—
"শুনিলাম তোমাদের যোগ্যতা-কাহিনী;
জীবের সংহারে সবে সুনিপুণ মানি।
আছে বটে সবাকার বিক্রম প্রচুর,
নহ কিন্তু কেহ বুদ্ধি-কৌশলে চতুর।
দস্যুর সমান সবাকার আচরণ,
তাই তো বিষম ঘৃণা করে নরগণ।
অই যে **অমিতাচার,** বসে' এক কোণে,
নিস্তব্ধ বিনীত অতি, আনত নয়নে;
মিষ্টহাসী, মৃদুভাষী, প্রিয়দরশন,
বুদ্ধিমান্, সুচতুর, হৃদয়-রঞ্জন।
বিচিত্র উহার গতি, সূক্ষ্ম অতিশয়,
বিবিধ কৌশলে মোহে মানব-হৃদয়!
ভুলায় সবার মন সুখ-প্রলোভনে,
ইন্দ্রিয়-বিলাসে সদা তোষে নরগণে।
ভাবিয়া দেখহ মনে, উহারি কৌশলে,
সাধন করিছ কার্য্য তোমরা সকলে।
অতএব সূক্ষ্ম মম ন্যায়ের বিচারে,
উপযুক্ত বুঝি, মন্ত্রী করিনু উহারে" ॥

আমার মোকদ্দমা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৫)

সেই দিন সন্ধ্যার সময় সহরে পৌঁছিলাম। সেখানে, ৩॥ হাত দীর্ঘ, ৪ হাত প্রস্থ, জলসিক্ত স্থানের ভাড়া ৵১০ পয়সা দিয়া, এক পয়সার দ্রব্য চারি পয়সায় ক্রয় করিয়া, কথায় কথায় ঘরওয়ালার মধুর আপ্যায়িতে তাহার অগাধ শিষ্টতার পরিচয়ে অস্থির হইয়া, এবং দাদামহাশয়ের তামাক সাজিয়া রাত্রি কাটাইলাম। এই সকল লাঞ্ছনায়, তার উপর আবার মোকদ্দমার কথা ভাবিয়া, মন বড়ই চঞ্চল হইল; প্রাণটা হুহু করিতে লাগিল; নিদ্রা আসিল না। যে আনন্দ-সাগরে সমস্ত দিন ভাসিতেছিলাম, তাহা যেন শুকাইয়া গেল; আমি অবসাদপঙ্কে পড়িয়া ছট ফট করিতে লাগিলাম।

প্রাতে উঠিয়া বসিয়াছি, এমন সময় রামজীবন এক লাঠি কাঁধে করিয়া পঁহুছিল। রামজীবন আমার প্রতিবেশী, অতি সরল প্রকৃতির লোক; বিপদে আপদে রামজীবনের মত সহায় আর নাই। রামজীবন বলিল, "সোণার বৌ আমাকে পাঠিয়েছে;সমস্ত রাত চলে এসেছি। সে পনর গণ্ডা টাকা দিবার মত করেছে, আর এই পাঁচ গণ্ডা টাকা তোমার বিশ্বাসের জন্য দিয়েছে। মালি মোকদ্দমায় কাজ নাই;তোমার মাও তোমায় ফিরে যেতে বলেছে।"এই বলিয়া,রামজীবন চাদর হইতে টাকা খুলিতে লাগিল। আমার বড় আনন্দ হইল। রাত্রির যন্ত্রনায় আমার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, আমি এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত

হইলাম। দাদা এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই, একমনে তামাক খাইতেছিলেন। তাঁহার উত্তরপ্রতীক্ষায় আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। শেষে তিনি বলিলেন, "তা যা তোমার ভাল মনে হয়, কর। তোমার টাকা তুমি দান করতে পার; ছেড়ে দিতে পার,তাতে আমার কি? তবে লেখাপড়া শিখে মানুষ এত বোকা হয়,তা আমি এই প্রথম দেখ্লাম। ষাট্ টাকা তোমার চক্ষে বেশী লাগতে পারে; কিন্তু ১৮৭॥ টাকা ৬০টাকার কত গুণ, তা হিসাব করেছ কি? আর মোকদ্দমা ডিক্রী হইলে খরচা কি পাওয়া যায় না? সরকারবাহাদুর আদালত করে দিয়েছেন কেন? তা বেশ কথ, তোমরা মাতা পুত্র যদি এত বিচক্ষণ হয়েছ, তবে আমাকে ডাক্তে গেছলে কেন ভায়া? আমার ভারি স্বার্থ, টাকাটা ডিক্রী পেলে আমাকে ভাগ দিবে কি না! তবে লোকের বিপদ পড়্লে, মামলা মোকদ্দমা হ'লে, হিত উপদেশ না দিয়া থাক্তে পারি নে,এই জন্যই আমার আসা। যাক্,এসব হীন লোকের হীন কথায় আমি থাক্তে চাই নে।" এই বলিয়া দাদা ছাতা ও ব্যাগ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দ্রুতপাদবিক্ষেপে গমনোদ্যত হইলেন। আমি আগে এতটা ভাবি নাই—আমার নিরীহ সরকারী বুদ্ধিতে এত টা যুটিয়া উঠে নাই; সুতরাং দাদার বক্তৃতায় আমি নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। বুঝিলাম,আমার কাজটা ভাল হয় নাই। সত্যই ত দাদার কি স্বার্থ যে তিনি আমার জন্য এত চেষ্টা করিতেছেন; নিজে বিনা সুদে টাকা দিতেছেন; কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমদ্বারা আমার সহায়তা করিতেছেন? এরূপ পরোপকারীর পরামর্শ অবহেলা করা উচিত মনে হইল না। নিমেষমধ্যে বিদ্যুৎ গতিতে এত কথা আমার মনে চমকিয়া গেল; আমি ছুটাছুটি গিয়া দাদার হাত ধরিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, দাদাও ঘন ঘন আমার প্রতি চাহিতেছিলেন,ও পা ঘসিতেছিলেন; একটু বলিতেই 'গোসা করা' ক্ষুধিত বালকের মত 'না খাবনা' 'না খাবনা' গোছের আব্দার করিতে করিতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং পুনর্ব্বার নিজের নিঃস্বার্থপরতা ও সাধুতা সম্বন্ধে নানারূপ বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। কাজেই আর সে টাকা লওয়া হইল না। রামজীবন ফিরিয়া গেল; আমারও মক্কেলজীবন আরম্ভ হইল।

এই সকল কার্য্যে বেলা হইয়া গেল। আট টার সময় আমরা উকিলের বাসায় যাত্রা করিলাম। ব্যাগ ও ছাতা আমিই লইলাম। আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও উকিল দেখি নাই; পথে আসিতে আসিতে দাদার মুখে কিছু কিছু ইতিবৃত্ত শুনিয়াছিলাম মাত্র। দাদা মহাশয় বলিয়াছিলেন, " উকিলেরা ভারি বুদ্ধিমান, চতুর এবং বাহাদুর লোক; মোকদ্দমা চালাইবার কত কৌশল এবং ফন্দী যে জানে, তার সীমা সংখ্যা নাই। টাকা পাইলেই সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করিয়া দিতে পারে; হাকিমের চোকে ধূলা দিয়া, বোকা বানাইয়া কাজ হাসিল করিতে পারে। তাদের হাতে প'ড়ে অনেক পরম ধার্ম্মিক সত্যনিষ্ঠ লোককেও চোর সাজিতে হয়। উকিলেরা কাহাকেও খাতির করে না; চক্ষুলজ্জা করেনা; ভদ্রলোক বলিয়া কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। টাকা পাইলে, পরস্পরকে আক্রমণ করিতেও কুণ্ঠিত

হয় না। উকিলকে পয়সা দিতে পারিলে, মোকদ্দমার ভাবনা করিতে হয় না”। এই সকল কথা শুনিয়া অবধি, উকিল দেখিবার জন্য বড়ই কৌতহল জন্মিয়াছিল। সুতরাং সোৎসাহে উকিলের বাড়ীপানে ছুটিলাম।

দাদার মনোনীত উকিল বাবুটির নাম নবীন চন্দ্র। আমরা শীঘ্রই তাঁহার বাটীতে পঁহুছিলাম। নবীন বাবুর গৃহ দ্বিতল সুধাধবলিত; সম্মুখে পুষ্পোদ্যান, নানাবিধ সুরভি কুসুমে পূর্ণ। কম কুসুমের সৌরভ মধুলোভাকৃষ্ট মধুমক্ষিকার ন্যায়, মক্কেলগণ উকিল বাবুর যশে আকৃষ্ট হইয়া, দলে দলে বৈঠকখানা পূর্ণ করিতেছিল। আমিও দাদার পাছু পাছু বিস্ফারিত নয়নে সেই সব দেখিতে দেখিতে তথায় উপনীত হইলাম। দেখিলাম, দাদা মোহরি মহলে সুপরিচিত। মোহরি বাবু মহাসমাদরে হস্তস্থিত কলম টি কানে রাখিয়া, দপ্তরটি একটু সরাইয়া, দাদাকে নিকটে বসিতে বলিলেন। আমার হাতে ব্যাগ, কাঁধে দুইটি ছাতা, বোধ হয় তলপিদার বোধে আসন গ্রহণের অনুরোধ কেহ করিল না। কাজেই, দাদার এই সাদর অভ্যর্থনার পর, অযাচিত ভাবে বসিতে কেমন বাধ বাধ ঠেকিল।

অদূরে প্রকোষ্ঠমধ্যে উকীল বাবু আসীন। মক্কেলগণ অসঙ্কোচে সেখানে যাইতেছে, বসিতেছে। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার বড় ঔৎসুক্য ছিল; ব্যাগ ছাতা দাদার নিকটে রাখিয়া, সেই ধূলিধুসরিত শ্রীপদযুগল লইয়াই, সাহস করিয়া, মুক্তদ্বার আসনে উপবেশন করিলাম।

উকীল বাবুর নধর সুছাঁদ উজ্জ্বল চক্ষু ও উন্নত ললাট দেখিয়া মন বড় প্রফুল্ল হইল। মনে হইল, যদি পয়সা দিয়া খাটাইতে হয়, তবে এমন লোককে খাটানতেও সুখ। কিছু সময়ের জন্য আমি ত ইঁহার মুনিব হইব।

এই ভাবিয়া হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম। বাবুর হাসিভরা মুখ, যে টাকা দিতেছে, অপরের কথা ভুলিয়া তাহাকেই বাক্যসুধা বর্ষণ করিতেছে। যাহার টাকা নাই, সে শেষ অবধি বসিয়া আছে, বাবু তাহাকে দেখিয়াও দেখিতেছেন না, তাহার কথাও কানে তুলিতেছেন না। একটি শীর্ণকায় লোক কাতর ভাবে কি একটি যুক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপন দরিদ্রতা জানাইল; বাবু উত্তর করিলেন না; সে শুষ্কমুখে সজল নয়নে উঠিয়া গেল। শুনিলাম, তাহার পুত্র একটি ফৌজদারিতে পড়িয়াছে; বাবুর ফিসের পুরা টাকা সে দিতে পারিবেনা বলিয়া জানাইতেছিল, ও যুক্তি জিজ্ঞাসিতেছিল। এমন সুন্দর দেহে দয়াদাক্ষিণ্যের এত অভাব দেখিয়া, আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

রসলীলা—প্রকৃতি গায়িকা। শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায়, বি এ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ পাঁচ আনা।

রসলীলা এক খানি সঙ্গীতপুস্তক। কিন্তু এ সঙ্গীত প্রমোদ-সঙ্গীত নহে; প্রেমরসময় পরমাত্মার প্রেমানুরাগে আত্মবিস্মৃত

অনন্ত আকাঙ্ক্ষাময় জীবাত্মার প্রেমগুঞ্জরণের সুমধুর ঝঙ্কার —প্রেমোন্মাদিনী জীব-প্রকৃতির প্রেমপ্রলাপ—পরম পুরুষের সহিত জীব-প্রকৃতির নিগূঢ়, প্রকৃত, সুধাময়, সঞ্জীবন, মাধুরীপূর্ণ সম্বন্ধের চিত্র—যে সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারিলে সকল দুঃখের শান্তি হয়, সকল জ্বালা নির্ব্বাপিত হয়—পরম পুরুষার্থ সাধিত হয়, এবং জীবন জনম সার্থক হয়। যাহাতে অনন্ত পিয়াসার চির নিবৃত্তি হয়; চঞ্চলা প্রকৃতি পরম নির্ব্বাণ লাভ করিয়া সুস্থ হয়; সকল অভাব দূরীভূত হয়; সংসার-বন্ধন আপনাহইতে স্খলিত হয় এবং হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়; সেই পরমতত্ত্বের সুমধুর কাহিনী ইহাতে মধুর তানলয় সহকারে গীত হইয়াছে।

পুস্তক খানি পাঠকরিয়া সুখী হইয়াছি। উহার সঙ্গীত গুলি শুনিতে শুনিতে প্রাণ জুড়ায়, হৃদয় মাতিয়া উঠে, এবং ভগবানকে সত্য সত্যই হৃদয়-দেবতারূপে ক্ষণকালের জন্য প্রতীতি হয়। ভাগবতপ্রেমরসানুরাগী ভক্তের নিকট যে এপুস্তক খানি সমুচিত আদর পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সঙ্গীত গুলি,নির্ম্মল বিশুদ্ধ ভাগবতত্ত্বের সহিত সুগভীর প্রেমরসের মিলনে অতিশয় উপাদেয় হইয়াছে। জ্ঞানের সহিত মনোভাবের সামঞ্জস্যে—তদুপরি সুললিত পদবিন্যাসে এবং কবিত্বের চাতুর্য্য সঙ্গীতগুলি সর্ব্বতোভাবে মনোরঞ্জক ও হৃদয়োন্মাদক হইয়াছে। পরা প্রকৃতির সহিত প্রেমরসময় ভগবান যে নিত্য প্রেমলীলা করিতেছেন, প্রেমিক ভাবুক তাহা উপলব্ধি করিয়া, উন্মত্ত ভাবে হৃদয় খুলিয়া তাহাই গান করিয়াছেন।

সঙ্গীতের নমুনা দেখান অসাধ্য—তাহাহইলে সমগ্র পুস্তক খানিই তুলিয়া দিতে হয়। প্রেমরসানুরাগী পাঠক স্বয়ং তাহা আস্বাদন করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

পুস্তকের শেষভাগে "তণ্ডুল-কণা" ও "শিশির-কণা" নাম দিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুমধুর রসাল বাক্য সংযোজিত হইয়াছে। তণ্ডুলকণাগুলি দেবতার ভোগের, এবং শিশির-কণাগুলি "প্রকৃতির" পবিত্র প্রেমাশ্রুরই উপযুক্ত হইয়াছে।

সংবাদ।

মেদিনীপুর সহরে দুই জন ভদ্রবেশধারী লোক ধরা পড়িয়াছে; তাহাদের কোমরে দুই দুইটা ছোরা ও পকেটে ক্লোরোফর্ম্ম পাওয়া গিয়াছে। অনুসন্ধান চলিতেছে। ধৃত ব্যক্তিরা হাজতে আছে।

কাঁথি এলাকায় বসন্ত ও কলেরার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনেক লোক মারা যাইতেছে।

কাঁথিতে এক জন আসামীর বেত্রাঘাতের হুকুম হয়। দণ্ডের পূর্ব্বেই সে প্রহরীর নিকট হইতে ছুটিয়া পলায়। তখনই ধরা পড়িয়া, পলায়নের অপরাধে ছয় মাসের কারাদণ্ড পাইয়াছে। রক্ষকগণের কোন ত্রুটী ছিল কি না, তদন্তের জন্য পুলিশের ইনস্পেক্টরের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে।

আগামী ২০ শে জুন শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের ষষ্টি বর্ষ পূর্ণ হইবে। আমাদের মহারাণীর পূর্ব্বে কোন

রাজাই এত দীর্ঘ কাল ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করেন নাই। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনায় আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য ইংলণ্ডেশ্বরীর বিশাল সাম্রাজ্যের নানা জাতীয় প্রজাপুঞ্জ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। ভারতের এই ঘোর দুর্দ্দিনেও নানা স্থানে সভা সমিতি করিয়া, এই ঘটনার জন্য আনন্দোৎসবের উদ্যোগ হইতেছে। ইহা ভারতবাসীর প্রগাঢ় রাজভক্তির অন্যতম পরিচয়। ইতিহাসে এই ঘটনা (Diamond Jubilee) হীরক জুবিলী নামে অভিহিত হইবে।

যত দিন যাইতেছে, দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ও প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতে এবারে যেরূপ সর্ব্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, পূর্ব্বে আর কখনও সেরূপ হইয়াছে বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ নাই। দু ক্রন্দমনের জন্য এবার যেরূপ যত্ন ও উদ্যম দেখা যাইতেছে তাহাও ভারতের ইতিহাসে বিরল। ইংরাজ গবর্ণমেন্ট, যাহাতে অনাহারে আর একটি মনুষ্যও প্রাণত্যাগ না করে, তাহা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আবার ভারতীয় দুর্ভিক্ষসমিতির হস্তেও আশাতীত অর্থ জমা হইতেছে। এক ইংলণ্ড হইতে ইতিমধ্যে প্রায় ৮৭ লক্ষ টাকা আসিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, ইটালী, সুইডেন, রুশিয়া প্রভৃতি দেশের লোকেরাও ভারতীয় দুঃস্থ প্রজার জীবনরক্ষার্থ হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন। ভারত এই বিশ্বজনীন সহানুভূতির জন্য জগতের লোকের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইল। এক্ষণে দেশের লোকের কর্ত্তব্য যে যদি কোথাও দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা দেয়, যদি কোনও সুদূরবর্ত্তী গ্রামে একটি মাত্র প্রাণীরও অনাহারে জীবননাশের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ পুলিশের ও স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তাঁহারা যেন অবিলম্বে তাহা জ্ঞাপন করেন। জানিতে পারিলেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রতিকারপরায়ণ হইবেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

ভারতের এই ঘোরতর দুর্দ্দিনেও বড় লাট তাঁহার অফিস ও কেরাণী গুলি লইয়া শিমলা শৈলে গমন করিতেছেন দেখিয়া, ভারতের জনসাধারণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। বড় লাট নিজে সিমলা গমন করুন, তাহাতে কাহারও বিশেষ কোন আপত্তি নাই। কিন্তু বার্ষিক বার লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিনা কারণে অফীস গুলিকে স্থানান্তরিত করা সম্বন্ধে নানা অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। সেই সকল যুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া, শীঘ্রই নাকি বিলাতের রাজসভায় শৈলবিহার বন্ধ করিবার জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে একটী আবেদন পত্র প্রেরিত হইবে। মহাসভা জনসাধারণের এই ন্যায়সঙ্গত আবেদনে কর্ণপাত করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

প্রতিবাদ।

কান্তিতে উল্লিখিত রাজা যাদবরামের জীবনীসংক্রান্ত দুটী ঘটনা সম্বন্ধে এক খানি প্রতিবাদ পত্র পাইয়াছি। তাহাতে লেখকের নাম ধাম নাই। এরূপ পত্র মুদ্রিত করা নিয়মবিরুদ্ধ। লেখক মহাশয়ের নাম পাইলে, আগামী বারে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে। —— কাঃ সঃ।

নববর্ষ ।

১

নীরবেতে রাশি-চক্র আবার ঘুরিল,
একটী বরষ গেল চ'লে;
অনন্ত অতীত-কাল-সিন্ধুতে ডুবিল,
নদী যথা জলধির জলে।

২

আজিকে প্রভাতে রবি, নূতন বরষে
সঙ্গে লয়ে সমুদিত হ'ল;
কোটী বিহঙ্গের গানে পরম হরষে
ঊষা তারে সম্বর্দ্ধনা দিল—

৩

পুলকেতে সিহরিল প্রকৃতি সুন্দরী—
তরুলতা হাসিল মৃদুল;
নূতন সখারে বুঝি দরশন করি,
আনন্দেতে ছড়াইল ফুল!

৪

প্রভাতে ভাঙ্গিল ঘুম, মেলিনু নয়ন;—
চারিদিক প্রফুল্লতাময়;—
'একটী বরষ গেল! হইল স্মরণ,
চমকিল আমার হৃদয়!

৫

একটী বরষ মম মর জীবনের,
পলে পলে আজ ফুরাইল;
হইল নিকটতর দিন মরণের;
কাল-ভেরী আবার বাজিল।

৬

বিগত বরষে, ঠিক আজিকার দিনে,
ঠিক ঠিক আজিকার মত,
কত ফুল হেসেছিল কুসুম-কাননে,
মুকুলিতা লতা কত শত!—

৭

হেসেছিল কত মুখ এমনি করিয়া,
নববর্ষে আনন্দিত মনে;
করেছিল কত আশা হৃদয় ভরিয়া—
কত কার্য্য সাধিবে জীবনে।

৮

একটী একটী করি গিয়াছে ঝরিয়া,
একটী কুসুম তার নাই;
কত লতা, হায়, তার গেছে শুকাইয়া;
কোথা গেছে খুঁজিয়া না পাই।

৯

কত হাসি চিরতরে গিয়াছে নিবিয়া,
কাঁদাইয়া কত প্রিয় জনে;
কত আশা নিরাশায় গেছে মিলাইয়া
হা হুতাশ রেখে অশ্রুসনে।

১০

কত কার্য্য অনুষ্ঠানে হয়েছে বিফল;
কত তার রয়েছে পড়িয়া;
কত তার সিদ্ধ হ'ল, না ভুঞ্জিতে ফল,
অনুষ্ঠাতা গিয়াছে চলিয়া।

১১

'আজ করি, কা'ল করি' ভাবিতে ভাবিতে,
কত জন চ'লে গেল, হায়!
আজ যারে দেখিলাম আনন্দে হাসিতে,
কা'ল দেখি অনন্ত শয্যায়।

১২

অদৃশ্যে থাকিয়া কাল পূরিল সন্ধান,
ব্যাধ যথা মৃগে লক্ষ্য করে;
আনন্দে খেলিতেছিল,—সুখে ধোয়া প্রাণ,—
কত নর পড়িল সে শরে।

১৩

করাল কালের গ্রাস বিকট-দশন,
চারিদিকে রয়েছে যে ঘিরে ;
তার মাঝে এত দিন রয়েছে জীবন,
কি আশ্চর্য্য আছে এর পরে ?

১৪

কে জানিত নববর্ষ দেখিব আবার,
অতিক্রম করিয়া মরণে;—
এক পল কালে মম নাই অধিকার,
একবর্ষ বাঁচিনু কেমনে !

১৫

হে প্রভো করুণাময় ! তোমার ইচ্ছায়
আর এক বর্ষ কাটি গেল;
জানি না কেনযে তুমি রাখিলে আমায়;
তব ইচ্ছা কে বুঝিবে বল !

১৬

পুণ্যময়, তব প্রেমে মগ্ন যে জীবন,
রত সদা তোমার সেবায়;
যাহার জীবনে জীয়ে কত শত জন,
কত পাপী পরিত্রাণ পায়;

১৭

হায়, হেন কত নরকুলের ভূষণে
কত জনে কাঁদাইয়ে নিলে;
সংসার-সেবায় রত মম এ জীবনে
কে জানে কেন যে রেখে দিলে !

১৮

সুদীর্ঘ বরষ মোরে দিলে দয়া করি ;
কিন্তু আমি কি করিনু তায়?—
জীবনের মহাযাগ রহিনু পাসরি;
বৃথাই কাটানু দিন হায় !

১৯

আজিও অসার সেই ভবের খেলায়
মূঢ় মন রয়েছে মজিয়ে,
আজিও ভবের সুখে সুখী হতে চায়,
শান্তি চায় বিষ-পাত্র পিয়ে।

২০

বিষম মোহের ঘুমে অবশ পরাণ
আজিও তো জাগিল না হায়,—
স্বপনে প্রফুল্ল কভু, কভু ম্রিয়মান,
পড়ে আছে ধরায় ধূলায়।

২১

রোগ, শোক, মৃত্যু কত হেরিনু নয়নে,
করিনু যে কত হাহাকার;
কি ঘোর কুহকময় মায়ার ছলনে
মুগ্ধ তবু পরাণ আমার।

২২

এই বল, এই বুদ্ধি, কিছু নহে মোর,
সব তব করুণার দান,—
দেখাইলা কত বার,—একি মোহ ঘোর!—
তবু রয় আত্ম-অভিমান !

২৩

করুণার হস্ত তব,— দেখি প্রতিদিন,—
দেয় মোরে অন্ন আর জল;
করে না তো ঘৃণা মোরে দেখিয়া মলিন,
তব প্রেম বহে অবিরল !

২৪

মোহময় মৃত্যু-পাশ করিয়া ছেদন,
অমঙ্গল করি পরিহার;
মঙ্গলের পথে মোরে করে আকর্ষণ,
ধূলা-ঘর ভাঙ্গে বার বার।

২৫

হায় রে, অবোধ আমি, ভুলিনু ছায়ায়,
পুতুলের খেলায় মজিনু;
আপনি আপন হিত না বুঝিনু হায়!
মিছে শুধু কাঁদিয়া মরিনু!

২৬

তোমারি প্রেমেতে পূর্ণ অন্তর বাহির,
সুখ দুঃখ প্রেমেরই কৌশল;
অসত্যের প্রেমে চিত্ত তথাপি অধীর,
তব প্রেমে তবু না মজিল!

২৭

পদে পদে দেখি জয় তোমার ইচ্ছার,
মম ইচ্ছা চূর্ণ হ'য়ে যায়;
মোর তরে প'ড়ে থাকে শুধু হাহাকার,
তবু চক্ষু খুলিল না হায়!

২৮

ইচ্ছায় মিলিবে ইচ্ছা; প্রেম-যোগভরে,
তব সনে হইবে মিলন;
ক্ষুদ্র বিন্দু মিশে যাবে অনন্ত সাগরে,—
মধুময় হবে এ জীবন,—

২৯

কর্ম্মদোষে না হল এ মধুর সাধন,
জীবন না হইল সরস;
অসার ভাবিয়ে কাল করিনু হরণ;—
চলে গেল একটী বরষ!

৩০

অন্তর বাহিরে থাকি সদা বিরাজিত,
কত শিক্ষা দিলে গুরু হয়ে;
অবিশ্রান্ত দিবা নিশি সাধিতেছ হিত,
ত্যজ নাকো অধম বলিয়ে।

৩১

কতবার আপনার করুণা প্রকাশি,
ধন্য তুমি করেছ আমারে;
কতবার পরাণের শোক ভয় নাশি,
শীতল ক'রেছ শান্তি-ধারে।

৩২

কত বার সত্যালোক প্রকাশি উজ্জ্বল,
লক্ষ্য পথ দিয়েছ দেখায়ে,
কত বার মুছায়েছ নয়নের জল
আশার অভয়-বাণী ক'য়ে।

৩৩

এ সংসারে মজে থাকি,—মম আকিঞ্চন;
তুমি চাও আমারে লইতে;
আমি করি সদা মরণেরে আলিঙ্গন,
তুমি মোরে টানিছ অমৃতে।

৩৪

বার বার যায় মন তোমারে ছাড়িয়া,
তুমি তবু পিছে পিছে থাক;
মোহ-ঘুম-ঘোরে পড়ি ঢলিয়া ঢলিয়া,
তাই তুমি প্রেমভরে ডাক!

৩৫

যত ভাবি, দয়াময়, করুণা তোমার,
অনন্ত অতলে ডুবে যাই;
তোমার মতন সখা সুহৃদ আমার,
কোথা আর দেখিতে না পাই!

৩৬

তোমার প্রেমের রীত করি দরশন,
অবাক্ হইনু প্রেমময়!
কি ব'লে তোমারে বল করি সম্বোধন,-
তব নাম পাইব কোথায়?

৩৭

আপনার অপরাধ মলিনতা হেরি,
যতই অস্থির হয় মন;
ততই তোমার প্রেম গভীর নেহারি

বিস্ময়েতে হই নিমগন!

৩৮

জানি, আমি মহাপাপী, নারকী ভীষণ,
পাপময় জীবন আমার;
অনন্ত প্রেমের সিন্ধু করি দরশন,
নিরাশায় ভীত নহি আর।

৩৯

প্রাচীন বরষ! তবে যাও চ'লে যাও,
পাপ তাপ লয়ে যাও ধু'য়ে!
যাও দুঃখ, যাও শোক, নিরানন্দ যাও;—
যাও যাও অতলে ডুবিয়ে!

৪০

এস নববর্ষ, তোমা করি আলিঙ্গন,
এস গেয়ে "জয় বিভু জয়";
আনন্দ আশারে লয়ে কর আগমন,
ল'য়ে এস বিশ্বাস অভয়।

৪১

প্রেমময়! এই ভিক্ষা তোমার চরণে
নব বর্ষে মাগিছে তনয়;—
তব প্রেম-মুখ যেন সদা জাগে মনে,
ও চরণ সদা হৃদে রয়।

৪২

বরষ না হ'তে শেষ, যদি, এ জীবন
এলোক হইতে চ'লে যায়,
হউক মঙ্গল-ইচ্ছা তোমার পূরণ,
খেদ যেন নাহি থাকে তায়!

পার্লিয়ামেণ্ট বা ইংরেজদিগের জাতীয় মহাসভা।

যে মহাসভা বর্ত্তমান সভ্য জগতের রাজনীতির শিক্ষাগুরু; যে সভার বাদানুবাদ এবং কার্য্যাবলী জগতের শিক্ষিতমণ্ডলী আগ্রহের সহিত পাঠ করেন; যাহা পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ লোকের ভাগ্যদণ্ড পরিচালনা করিতেছে; সেই সভা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিতেছি।

এই সভার দুইটী বিভাগ আছে;— লর্ড বা অভিজাতগণের সমিতি, এবং কমন্স্ বা জনসাধারণের প্রতিনিধি সভা। লর্ড-সভার সভ্যসংখ্যা প্রায় ৫০০ পাঁচ শত। তন্মধ্যে ৪০০ চারিশত ইংলণ্ডের অভিজাতগণের বংশানুক্রমিক অধিকার অনুসারে এই সভায় স্থান পাইয়া থাকেন, এবং অবশিষ্টগণ স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ডের অভিজাতগণের প্রতিনিধি। কমন্স্ সভার সভ্যসংখ্যা ৬৭০ ছয়শত সত্তর; তন্মধ্যে আয়রলণ্ড হইতে ১০৫ একশত পাঁচ, এবং অবশিষ্ট সভ্যগণ স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ডের জনসাধারণদ্বারা মনোনয়ন প্রথানুযায়ী নিযুক্ত হন। ইঁহারাই ইংরাজ সাম্রাজ্যের পরিচালক এবং হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা।

এক্ষণে যেমন আমাদের দেশের যুবকগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া, কোনও রাজকার্য্যেপ্রবেশ করিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ইংলণ্ডের প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্রেই এই মহাসভায় প্রবেশ করিতে পারিলে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিমাত্রেই পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিতে আয়াস ও আকাঙ্ক্ষা করেন। ধনশালী বণিক, বিদ্যালয়ের

অধ্যাপক, ব্যারিষ্টার বা আইনব্যবসায়ীগণ, সংবাদপত্রের সম্পাদক, এমন কি, শিক্ষিত এবং গণ্য মান্য কৃষকগণও এই সভার সভ্য হইয়া থাকেন। এই মহাসভার সকল সভ্যই স্বদেশের সহিত একীভূত, যেন স্বদেশ হইতে ইঁহাদের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই—দেশের ক্ষতিতে আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং দেশের লাভে আপনাদিগকে পরম লাভবান মনে করেন। স্বদেশ-প্রেম ইঁহাদের রক্ত-মাংসের সহিত জড়িত। কোন ইংরাজ স্বার্থ-লোভে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক স্বদেশের স্বার্থ শত্রুহস্তে বিসর্জ্জন করিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত এরূপ কেহ শুনেন নাই; বরং স্বদেশের জন্য আত্ম-ত্যাগের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ইঁহাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করিতেছে। ইঁহারা কেহই বেতন পান না, কেবল ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন, তাঁহারাই বেতন পাইয়া থাকেন।

এইসভা ইংরাজ রাজনীতির পরিচালক এবং জটিল রাজনৈতিক প্রশ্ন সকলের মীমাংসক ইহাকে অতিক্রম করিয়া রাজার কোন কাজ করিবার অধিকার নাই। এই সভার সভ্যগণের মধ্য হইতে ইংলণ্ডের রাজা মন্ত্রী-সভা গঠন করিয়া থাকেন। ইঁহারাই জগদ্ব্যাপী ইংরেজ সাম্রাজ্য এবং বহুবিস্তৃত বাণিজ্য পরিদর্শন ও পরিরক্ষণ করিতেছেন। মহারাণীর রাজ্যে কখনও সূর্য্য অস্ত যায় না, অর্থাৎ পৃথিবীর সকল অংশেই ইহার অধিকার আছে; এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতির বাণিজ্য-পোত একত্র করিলেও ইংরেজ বাণিজ্য-পোতের সমকক্ষ হইবে না।

সত্তর; কিন্তু সভা-গৃহে কেবল ৪৩০ চারি শত ত্রিশটী মাত্র আসন রহিয়াছে; সুতরাং সমস্ত সভ্য যদি এক দিনে উপস্থিত হন, তাহা হইলে সকলের বসিবার স্থান হইবে না। কাজে কাজেই সভ্যগণকে সভাগৃহে স্থান লইবার জন্য একটু চেষ্টা ও আয়াস করিতে হয়। সভার অধিবেশন সাধারণতঃ অপরাহ্ণ ৩ টার সময় আরম্ভ হইয়া থাকে; কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন হইলে, কখন কখন ২.টার সময়ও অধিবেশন আরম্ভ হয়। এরূপ হইলে, তাহাকে প্রাতঃকালিক অধিবেশন (Morning Sitting) বলে।

অধিবেশনের পূর্ব্বে,অতি প্রাচীন কাল হইতে, ঈশ্বরোপাসনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবার রীতি আছে। এই উপাসনায় যোগ দান করিলে, পারলৌকিক লাভের কথা ছাড়িয়া দিলেও, হাতে হাতে একটী ঐহিক লাভ হইয়া থাকে। এই মহাসভার সভা-পতির (Speaker) সম্মুখস্থ বাক্সের উপর কতকগুলি কার্ড থাকে। কার্ডের উপর Prayers অর্থাৎ "উপাসনা" এই কথা লেখা থাকে। উপাসনা শেষ হইলে, সভ্যগণ এক এক খানি কার্ড লইয়া, তাহাতে আপনার নাম লিখিয়া,তাঁহার মনোনীত আসনের পশ্চাতে সংলগ্ন করিয়া রাখেন। যিনি যে আসনে স্বীয় নামাঙ্কিত কার্ড রাখিয়া যাইতে পারিলেন, সে দিনের জন্য সে আসনটী তাঁহারই হইল। তিনি কার্ড খানি রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেও, অপর কোন সভ্যের সে আসনে বসিবার অধিকার নাই। কার্ডের নামাঙ্কিত ব্যক্তি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে

যে সকল সভ্য ঈশ্বরনিষ্ঠ বলিয়া খ্যাত, উপাসনা-স্থলে তাঁহাদিগকে বড় দেখা যায় না। রাজ-মন্ত্রীগণ বা নেতাগণ, যাহাদের উপর রাজ্য-ভার ন্যস্ত, এবং যাহাদের একটী কথায় কত প্রলয় সংঘটিত হইতে পারে, তাঁহারাই উপাসনার সময় বড় উপস্থিত হন না। ট্রুথ্ নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং পার্লিয়ামেণ্টের গণ্য মান্য সভ্য লেবুসিয়ার সাহেব ঈশ্বর-নিষ্ঠ বলিয়া খ্যাত না হইলেও উপাসনার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অতি মনোনিবেশপূর্ব্বক পুরোহিত মহাশয়ের (বর্ত্তমান সুবিখ্যাত Archdeacon Farrar) প্রার্থনা ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া থাকেন। ব্রাড্‌ল সাহেব সন্দেহবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি উপাসনার সময় সভা-গৃহের বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিতেন। উপাসনা শেষ হইলেই উপাসনা-স্থলে প্রবেশ করিয়া, একখানি কার্ড গ্রহণপূর্ব্বক আপনার স্থানে রাখিয়াদিতেন। উপাসনা-স্থলে উপস্থিত না হইয়া, কার্ড-গ্রহণে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারিতেন; কিন্তু ব্রাড্‌ল সাহেবের চরিত্র, স্বদেশ-প্রেম, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা এবং গুণবত্তার উপর অনেকের শ্রদ্ধা থাকায়, কেহ এ আপত্তি করেন নাই। তিনি বহুবৎসর ধরিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া আসিলেও প্রতিদিন তাঁহাকে আয়াস করিয়া আসন লাভ করিতে হইত। সংক্ষেপতঃ এই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, কোন সভ্যেরই কোন নির্দ্দিষ্ট আসনের উপর দাওয়া নাই। যিনি যে দিন যে আসন পাইলেন, সে আসন সেই দিনের জন্যই তাঁহার। ক্রমশঃ

——(:)০(:)——

আমার মোকদ্দমা !

(৭৬পৃষ্ঠার পর হইতে)

ক্রমশঃ জনতা শেষ হইল, বৈঠক পাতলা হইয়া গেল। দাদাও উঠিয়া আসিলেন; আমি একটু সরিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিলাম। উকীলের কথাবার্ত্তা দাদার সঙ্গেই চলিতে লাগিল, যেন তাঁরই মোকদ্দমা; আমি কেবল হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। তমস্থকের নালিশ শুনিয়া, উকিল বাবু বেশি কথা শুনিতে চাহিলেন না;হাত বাড়াইয়া তমস্থকটী লইলেন। দাদার ইঙ্গিতে আমি কলের পুত্তলিকার মত,দুইটী টাকা লইয়া,বাবুজির সম্মুখে অর্পণ করিলাম;— পনর দিনের আয়,আমার প্রবেশ লাভ করিল। ভাবিলাম, এবার প্রাণ ভরিয়া মনের কথা বলিব। এই ভাবিয়া,কিরূপে পিতামহাশয় ৩০টী টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন, কিরূপে সনাতন-পন্থী ভ্রাতার বুদ্ধিতে পড়িয়া টাকা দিতে অসম্মত হয়,ইত্যাদি প্রাণের কথা গুলি বলিতে আরম্ভ করিলে, উকিল বাবু মহা বিরক্তি সহকারে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন আর দাদাও একটা দাব্‌ড়ি দিয়া থামিতে বলিলেন। আমি নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। চিরকাল বালকদিগকে তিরস্কার করিয়া আসিতেছি,- নিজের তাড়া খাওয়াটা বড়

ইন্‌স্পেক্‌টিং পণ্ডিত আর সব্‌ইন্‌স্পেক্টর বাবুরা পাঠশালা পরিদর্শনের সময়, নিজে নিজেই ভুল করিয়া, তা সামলাবার জন্য দুই এক বার আমার মত শিক্ষকদিগকে তিরস্কার করেন, তখন কেহ উপস্থিত থাকে না, কিম্বা যারা থাকে, তারাও তত বুঝিতে পারে না ব'লে, আমরা সে সব বড় গায়ে মাখি না। কিন্তু এত লোকের সাক্ষাতে এই রকম দাবড়িটা খেয়ে মনটা বড় খারাপ হ'ল, লজ্জায় চুপ করে রইলাম। মনে হ'ল—মন্দ নয়, "নায় কড়ি দিয়ে ডুবে পার"।

এই সময়ে মোহরি বাবুটি আসিয়া জানাইল যে পূর্ব্ব দিনের কথিত ফৌজদারী মোকর্দ্দমাটী আসিয়াছে। দেখিতে দেখিতে, দুইটি নাদুস্ নুদুস্ চেহারা বৈঠক খানায় প্রবেশ করিল। উকীল বাবু আমার আর্জ্জি লিখিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আজই কি দিন ?" সেই দুইটির একটি লোক "হাঁ" বলিয়া উত্তর দিল, এবং ২০টি টাকা বাবুজির নিকট দিয়া, কাগজ তাড়াটি বাড়াইয়া দিল। ২টাকার দশগুণ ২০ টাকার ঝঙ্কারে উকীল বাবু বোধ হয় গরীবের ২টাকার কথা বিস্মৃত হইলেন। আমার আর্জ্জি খানি এক ধারে সরিয়া পড়িল; তাহাদের সেই কাগজের তাড়াটী বাবুর সম্মুখে প্রসারিত হইল। আমার আর্জ্জির ভার মোহরির উপরেই পড়িল। আমার বড়ই কষ্ট বোধ হইল; আপত্তি করিতে ইচ্ছা করিলাম; দাদা ইশারা করিয়া নিবারণ করিলেন; কাজেই আর সাহস হইল না।

মোহরি বাবু আর্জ্জি লিখিলেন। বলিলে মোহরি হাসিয়া উঠিলেন; দাদাও তাহাতে যোগ দিলেন। হাসির অর্থ আমার বোধগম্য হইল না।

(৬)

পরদিন আমার আর্জ্জি দাখিলের দিন। এগারটার সময়ে কাছারি যাত্রা করিলাম। আদালতের জনতা, ব্যস্ততা, কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া আমি যেন থ হইয়া পড়িলাম। পাঠশালায় বসিয়া সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া, বেত হেলাইতে হেলাইতে মনে হইত আমি একজন লোক। আমার দিকে বালকবৃন্দ চাহিয়া চাহিয়া আমার নিগ্রহ অনুগ্রহের প্রতীক্ষা করিত, আমি ভাবিতাম আমার সমান কে? কিন্তু হায়!এ কি ? কেহই আমার দিকে লক্ষ্য করে না,—পার্শ্বদিয়া একটা পিপীলিকা চলিয়া গেলে যেমন কেহ গ্রাহ্য করে না, তেমনি আমার দিকে কেহই চাহিয়াও দেখিল না। সেই সর্ব্বেসর্ব্বা আমি নিতান্ত নগণ্যবৎ চাহিয়া রহিলাম।

শীঘ্রই "দরখাস্তকারী দরখাস্তকারী" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পেয়াদারা হাঁকিতে লাগিল; বাদী বিবাদীর নাম ডাকা হইতে লাগিল। কাহারও হস্তে কাগজ,কাহারও হস্তে কোর্টফি, কাহারও হস্তে দরখাস্ত,সকলেই দ্রুতপদে সত্বর গমনে আদালতগৃহের পানে ছুটিতেছে। পেয়াদার চীৎকার, কলমকর্ণ মোহরিদলের বাচালত্ব, লোক জনের ছুটাছুটী দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। এত লোক, এত গোলমাল কখনও দেখিনাই; বুক যেন গুর্ গুর্ করিতে লাগিল। এই আদালতে আমাকে দাঁড়াইয়া মোকর্দ্দমা করিতে হইবে

উপস্থিত হইল।

দাদার ভাব কিন্তু অন্যরূপ। তাঁহার মুখে হাসি,গালে পান;যাহাকেই দেখিতেছেন আলাপ করিতেছেন, আর অনেক লোকও তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেছে। তিনি সঙ্গে না থাকিলে আমাকে এতক্ষণ পলাইতে হইত; আমি তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিলাম।

আদালতের অদূরে একটা লম্বা তিন কুঠরি ঘর দেখাইয়া দাদা বলিলেন"ঐটি উকিল খানা, ঐখানে উকিল বাবুরা বসেন।" আমার দেখিবার বড় ইচ্ছা হইল; দাদাকে লইয়া সেই পথে গেলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম, সেখানেও মক্কেলেরা উকিল গুলি দেখিতে পাইব। কিন্তু দেখিলাম তা নয়, কেবল সাক্ষা উকিলগুলি বসিয়া আছেন; চোকে চসমা, মাথায় শামলা, যাত্রাদলের জুড়ির মত চাপকান চোগায় ঢাকা তেজঃপুঞ্জ রং বেরংএর উকিল দেখিয়া বড় আনন্দ হইল তাঁহাদের মধ্যে নবীন বাবুও ছিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, নবীন বাবু আমার সহিত কথা বলিবেন; কিন্তু একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। শুধু তাই নয়, যখন আর্জি দস্তখত করাইতে গেল, দেখিলাম বাবুজি আমাকে এক বারে চিনিতেই পারিলেন না।

তারপর আর্জি দাখিল হইল। সেই সঙ্গে উপদেবতাগণের যাহার যেরূপ পূজার বিধান আছে, তাহাও সম্পন্ন হইল। সেই পূজা, প্রদানের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া ছিল বলিয়া একজন পেয়াদা আসিয়া মোহরিকে তলব করিল। মোহরী বলিলেন।" দেখেছ বিশ্বম্ভর বাবু!" এই বলিয়া, মোহরী পেয়াদার সহিত গেল। দূর হইতে দেখিলাম, একটি বাবু আসিয়া মোহরীকে কি বলিলেন। তারপরের কার্য্যটা লোকনয়নের অন্তরালেই সাধিত হইল।

কবি রমাপতি বন্দোপাধ্যায়।

বৈদ্যনাথ দোবে নামক এক প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ৪।৫ মাস কাল গঙ্গাবিষ্ণুর বাড়ীতে থাকিয়া রমাপতিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি রমাপতিকে শিষ্য স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল রমাপতিকে আপনার ন্যায় ওস্তাদ করিয়া চন্দ্রকোণা ত্যাগ করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বীয় পারিবারিক দুর্ঘটনায় তাঁহাকে ৪।৫ মাস পরেই স্বদেশে গমন করিতে হইয়াছিল।

বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত গায়ক শঙ্কর ভট্টাচার্য্য মল্লভূম কাদাকুলি নিবাসী ধ্রুপদী কুড়ারাম মুখোপাধ্যায় এবং মৃদঙ্গী রামমোহন চক্রবর্ত্তী গঙ্গাবিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ সঙ্গতকার বলিয়া প্রশংসা করিতেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে চন্দ্রকোণায় আসিয়া গঙ্গাবিষ্ণুর সহিত গীতবাদ্য করিতেন। রমাপতি তাঁহাদের নিকটেও কিছু কিছু শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠভ্রাত রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের আদেশক্রমে রমাপতি কাঁথির নিমক মহলের মীরমুন্সী ও সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত হইয়া কিছুদিন কার্য্য করিয়াছলেন। কিন্তু এই সকল পদ অধিক দিন তাঁহার প্রীতি জন্মাইতে পারে নাই। নিমকি আমলে সহজলভ্য প্রচুর অর্থে কর্ম্মচারিগণের নৈতিক জীবন শিথিল হইয়াছিল। অবকাশকালে অনেকেই নৃত্যগীতাদিতে যোগ দান করিত; কিন্তু ইহাতে সুরাপান প্রভৃতি নিকৃষ্ট আমোদের আধিক্য থাকায়, রমাপতি তাহাতে মিশিতেন না। সুতরাং ঐ পদে নিযুক্ত থাকিয়া, সঙ্গীতচর্চ্চার আশানুরূপ সুযোগ হইত না। এই সকল কারণে তিনি অল্পদিন পরেই কার্য্যত্যাগ করেন।

কাঁথি ছাড়িয়া, রমাপতি কয়েক বৎসর সঙ্গীতালোচনায় নিরত থাকিয়া অর্জ্জিত বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি নানা স্থানে পর্য্যটন করেন, এবং বিভিন্নদেশীয় উচ্চ শ্রেণীর ওস্তাদের সহিত মিলিত হইয়া, নানাবিধ সুর ও উৎকৃষ্ট সঙ্গীত শিক্ষা করিতে সমর্থ হন।

রমাপতির সুর অতি সুললিত ছিল, এবং অন্যের মধুর সুরও তিনি বড় ভাল বাসিতেন। একদা তিনি আপন বৈঠক খানায় বসিয়া আছেন, অদূরে বকুল বৃক্ষে একটী বালক উচ্চকণ্ঠে গান করিতেছে, শুনিতে পাইলেন। বালকের স্বর তাঁহার হৃদয়কে আকর্ষণ করিল। তিনি অবিলম্বে বালকটীকে নিকটে আনাইয়া, তাহার পরিচয় লইলেন, এবং তাহাকে আপন বাসে রাখিয়া নিজে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই বালকই গায়ক ও সেতারি বিশ্বম্ভর দাস নামে সাধারণের নিকট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

রমাপতির সুর কিরূপে মন্ত্রেরমত চিত্ত আকর্ষণ করিত, তাহা একটী ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায়। তিনি প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া, ঈশ্বরের মহিমা-কীর্ত্তন ও প্রাতঃকালীন রাগরাগিণীর আলাপ করিতেন। প্রতিদিন একটী বিষধর শ্বেত-সর্প জানালার পার্শ্বে বসিয়া, তাঁহার গীত শ্রবণ করিত। তিনি দেখিতেন, তাঁহার উঠিবার পূর্ব্বেই সর্পটী উপস্থিত হইয়াছে। তিনি কাহারও নিকটে সর্পের কথা প্রকাশ করেন নাই। কিছুদিন পরে, কয়েক দিবসের জন্য তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে এক ভৃত্য সেই সর্পটীকে তাঁহার শয়নাগারের জানালার পানে যাইতে দেখিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। এই সংবাদে রমাপতি যারপর নাই দুঃখিত হন, এবং এই ঘটনা ইতিপূর্ব্বে কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই বলিয়া, অনুশোচনা করেন।

রমাপতির সুখ্যাতি সঙ্গীতপ্রিয় বর্দ্ধমান রাজের নিকট পঁহুছিলে, তিনি তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। গুণগ্রাহী রাজা তাঁহার গীত শুনিয়া, অতিশয় প্রীত হইয়া, তাঁহাকে তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। রমাপতির দানবৃত্তি পিতার ন্যায় ছিল। গঙ্গাবিষ্ণুর মত অন্ন বস্ত্র দানেও তাঁহার প্রীতি জন্মিত। তাহার উপর পৈতৃক শারদীয়াদি পূজাতেও যথেষ্ট ব্যয় ছিল। এই সকল কারণে তাঁহার আর্থিক অবস্থার সচ্ছলতা ছিল না। কিন্তু তথাপি পেশাদার গায়কের মত বেতন লইয়া, চাকরি করিতে তাঁহার রুচি হইল না। তাঁহার ধারণা ছিল যে

বেতনগ্রাহী গায়ক হইলে, বংশের অমর্য্যাদা হইবে, এবং ওস্তাদগণও তাদৃশ সম্মান করিবেন না; এবং সেই সঙ্গে তাঁহার সযত্ন শিক্ষিত সঙ্গীতেরও আদর থাকিবে না। তাঁহার মধুর গীত রাজার চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনিও রমাপতিকে সহজে ছাড়িতে চাহিলেন না। পরিশেষে জমিদারী সেরেস্তার কোন কার্য্য গ্রহণে রমাপতির আপত্তি নাই জানিয়া, অবিলম্বে তাঁহাকে হিসাব নবিশির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু সে কার্য্যেও তিনি অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। হিসাব নিকাশের নীরস কঠোরতা তাঁহার কবি-হৃদয়ের কোমলতার নিকট বিসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। এই পদে রমাপতি নিপুণতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। কিছুদিন পরে তিনি অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বর্দ্ধমানে অবস্থানকালে তিনি প্রতিদিন এক একটী নূতন নূতন সুরের গান রচনা করিয়া, রাজাকে শুনাইতেন। শুনাযায়, একদা রাজবাটীতে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইয়াছিল। রমাপতি যে সকল গান স্বরচিত বলিয়া রাজাকে শুনাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটী গান যাত্রাকালে গোবিন্দের মুখে শুনা গিয়াছিল। গান শুনিয়া রাজা বিস্মিত হন এবং রমাপতির উপর তাঁহার সন্দেহ জন্মে। যাত্রা শেষ হইলে, ঐ গান গোবিন্দ কোথায় পাইয়াছেন জিজ্ঞাসা করেন। গোবিন্দ আপনাকেই রচয়িতা বলিয়া বলায়, রাজা রমাপতিকে ডাকাইয়া তাহা অবগত করেন। গোবিন্দ অধিকারীও একজন প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ছিলেন।

রাজা বিষম সমস্যায় পড়িয়া ঐ গানের প্রকৃত রচয়িতা নির্দ্ধারণে অসমর্থ হয়েন। ঐ গান একটী হিন্দি সুর ভাঙ্গিয়া রচিত হইয়াছিল। তৎকালে ঐ সুরের গান বাঙ্গলা ভাষায় চলিত ছিল না। রমাপতি গোবিন্দের আচরণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, কোন্ আদর্শ-গীত হইতে ঐ গান রচিত হইয়াছে, গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করেন। গোবিন্দ কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। পরে রাজা উভয়কেই অনুরূপ গান রচনা করিতে বলিলে, রমাপতি অবিলম্বে দুইটি সুন্দর গান প্রস্তুত করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন।

রমাপতি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুললিত সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। একদা পঞ্চকোট রাজ্যের জনৈক সুবিজ্ঞ কালোয়াত আসিয়াছিল। তিনি পাঁচ হাজার উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ গান করিতে পারিতেন বলিয়া, "পঞ্চহাজারী" নামে অভিহিত হইতেন। এই আগমন উপলক্ষে পঞ্চকোটে এক বৃহতী সভার অনুষ্ঠান হইয়া, নানাদেশীয় গণ্য মান্য ওস্তাদগণ সম্মিলিত হয়েন। মহাত্মা রমাপতিও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। "পঞ্চহাজারি" প্রথমেই এক মধুর রাগিণী আলাপ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে স্তম্ভিত করেন। তাহার পর এক অপূর্ব্ব সুরের অবতারণা করিয়া পার্সিতে একটী গান গাহিলেন। ক্রমশঃ

বঙ্গের সুরা-সমস্যা।

ইংরেজ আমলেই বর্ত্তমান আকারে এ দেশে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার, বিশেষ ভাবে প্রচলিত হইয়াছে। হিন্দুগণ যে কখনও মদ্য ব্যবহার করিতেন না এমন নহে। বৈদিক সময়ে সোমরস পান করিয়া প্রাচীন আর্য্যগণ যথেষ্ট মত্ততা প্রকাশ করিতেন; দেবতা দিগকে আনন্দকরী সোম রসের অর্ঘ্য প্রদান করিতেন। সোমের গুণবর্ণনা ও পানোপযুক্ত সোমরস প্রস্তুত করিবার প্রণালী, বহুসংখ্যক ঋগ্বেদের সূক্তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু কালক্রমে তাঁহারা সুরাপানের অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিয়া, দৃঢ় ভাবে তাহা নিবারণ করিয়া গিয়াছেন। স্মৃতিতে সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, চৌর্য্য ও গুরুপত্নীগমন একই পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। পঞ্চ মহাপাতকের মধ্যে সুরাপান দ্বিতীয় পাতক, এবং সুরাপায়ীর সংসর্গ পঞ্চম পাতক রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন হিন্দুদের মধ্যে, সেইরূপ মুসলমানদিগের মধ্যেও সুরাপান বিশেষ ভাবে বিগর্হিত বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভারতের দুই প্রধান জাতির কোন জাতিই সুরাপানের পক্ষপাতী ছিল না। উভয় জাতিতেই সুরাপায়ী ধর্ম্মতঃ লোকতঃ পতিত বলিয়া পরিগণিত হইত। ইংরেজদিগের আগমনেই আধুনিক হিন্দু ও মুসলমানেরা, সুরাপান যে কোন কোন সমাজে ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া পরিগণিত নহে, ইহা সর্ব্ব প্রথমে জানিতে পারিল। ইংরেজেরা দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া, আবকারী সহায়ে আবার দেশমধ্যে সুরাপান বহুল ভাবে প্রচলিত করিয়াছেন। এই জন্য বলি, যে ভারতে বর্ত্তমান আকারে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বিশেষ ভাবে ইংরাজ অধিকারেই প্রচলিত হইয়াছে। মুসলমানদের সময়েও মাদক দ্রব্যের উপরে একটা রাজস্ব আদায় হইত। সেই সূত্র অবলম্বন করিয়াই, ইংরেজরাজ আপনাদের আবকারীর প্রতিষ্ঠা করেন। আইন আকবরীতে দৃষ্ট হয়, যে আকবর বাদসাহের সময়ে, অন্যান্য করের মধ্যে, মাদক দ্রব্যের উপরে, ও লবণের উপরে যে কর ছিল, তাহা রহিত হইয়া যায়। সুতরাং আকবরের পুর্ব্ববর্ত্তী বাদসাহগণ যে সুরা-শুল্ক আদায় করিতেন, তাহার প্রমাণ আছে। আকবরের পরে পুনরায় সুরা-শুল্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরাজ যখন বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন, তখন সুরাশুল্ক রাজস্বের তালিকাভুক্ত ছিল। এই সময়ে সুরা-ব্যবসায়ীদিগকে সুরা বিক্রয়ের জন্য গড় পড়তা প্রতি মাসে-প্রায় দশ টাকা কর দিতে হইত। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে সর্ব্ব প্রথমে ইংরাজের আবকারী আইন প্রচলিত হয়। ইংরাজ বলিলেন, "যে সে লোকে যদি মদ্য প্রস্তুত করে, তবে দেশমধ্যে সুরাপান অত্যন্ত প্রচলিত হইয়া যাইবে। অতএব এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য আবকারী আইনের দ্বারা আপামর সাধারণে যাহাতে সুরা প্রস্তুত করিতে না পারে; এবং যাহারা নিতান্তই সুরাপান করিবে, তাহারা যাহাতে অতি অল্প মুল্যে সুরা ক্রয় করিতে না পায়,

এরূপ বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য।" এই কর্ত্তব্যের বশবর্ত্তী হইয়া প্রথম আবকারী আইন জারী করিলেন। আবকারীর দ্বারা এ মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে কি না, বিগত শত বৎসরের ইতিহাসই তাহার সাক্ষী।

বিগত ৫৫ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলায় আবকারীর আয় ৩ লক্ষ হইতে ১ কোটী ৩৩ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে, যথা ;—

মোট আবকারী আয়

১৮৪০ — ৪১	৩২২৭১১ টাকা
১৮৫০ — ৫১ "	৫৪৩৪৫৮ "
১৮৬০ — ৬১ "	৪৯২৬৪৯৯ "
১৮৭২ — ৭৩ "	৬৯৬১৩০২ "
১৮৮২ — ৮৩ "	৯৭৮১৮৫০ "
১৮৯২ — ৯৩ "	১১৫৯২৬৬৫ "
১৮৯৫ — ৯৬ "	১৩৩৭৭৯৮০ "

বিগত বিংশতি বৎসরের হিসাব ধরিলে দেখাযায় যে কোন কোন মাদক দ্রব্যের আয় দশবৎসরে দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে, যথা ;—

দেশীয় মদ	মোট আয়
১৮৭৫ — ৭৬	২৫১০০৬৪ টাকা
১৮৮৫ — ৮৬	৪৫১০২৯৮ "
১৮৯৫ — ৯৬	৫৯১১৮৪০ "
আফিম,	
১৮৭৫ — ৭৬	১২১৫৫৬৮ "
১৮৮৫ — ৮৬	১৮৫৭৯৭৮ "
১৮৯৫ — ৯৬	২৩৬৫১২৮ "
গাঁজা	
১৮৭৫ — ৭৬	১১২০৩৪৯ "
১৮৮৫ — ৮৬	১৯৪৬৬২৭ "
১৮৯৫ — ৯৬	২৬৮০৮১৯ "

এই ত গেল সমুদায় বঙ্গ প্রদেশের আবকারী আয়ের শ্রীবৃদ্ধি-কাহিনী। মেদিনীপুরের আবকারী আয় অর্থাৎ মাদকতা বৃদ্ধির হার ইহা অপেক্ষা বেশী বই কম নহে, যথা ;

মোট আবকারী আয়

১৮৫২ — ৫৩	৬১৯২৭ টাকা
১৮৬০ — ৬১	১০০৪৬৪ "
১৮৭২ — ৭৩	১১২০৯৫ "
১৮৮২ — ৮৩	২০২৩৫৮ "
১৮৯২ — ৯৩	২৩৪১০০ "
১৮৯৫ — ৯৬	২৬৯৫৩৩ "

অতএব দেখা যাইতেছে যে বিংশতি বৎসরে মেদিনীপুরের আবকারী আয় প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ রাজা কহেন, এই আয় বৃদ্ধিতে তোমরা ভীত হইও না। কারণ ইহা দেশের মাদকতা বৃদ্ধির প্রমাণ নহে। জনসংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে, ও যে পরিমাণে লোকের ধন সম্পদ বাড়িতেছে, তদনুসারে আবকারীর আয়ও একটু বাড়া বিচিত্র নহে। কিন্তু জনসংখ্যা ও ধনপরিমাণ কি সত্য সত্যই এদেশে আবকারী আয়ের একই হারে বাড়িয়াছে?

১৮৭২ সালে মেদিনীপুরের জনসংখ্যা ২৫৪০৯৬৩ ছিল। দশ বৎসর পরে উহা কমিয়া ২৫১৭৮০২ হয়। ১৮৯২ সালে আদম স্নুমারীতে মেদিনীপুরের জনসংখ্যা ২৬৩১৫১৬ নির্দ্ধারিত হয়। ১৮৭২ এবং ৮২ সালের মধ্যে মেদিনীপুরের জনসংখ্যা ৩৩ হাজার কমিয়া যায়, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ৯৮ হাজার ৬৭৩ টাকার আবকারী আয় বাড়িয়া যায়। ১৮৭২ এবং ৯২ সালের মধ্যে মেদিনী পুরের

জন-সংখ্যা শতকরা ৪জন হিসাবে বাড়িয়াছে; কিন্তু আবকারীর আয় শতকরা শতমুদ্রা হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।অতএব জন-সংখ্যার বৃদ্ধির দ্বারা আবকারী আয়ের শ্রীবৃদ্ধির উপযুক্ত কারণ দেখাইতে পারা যায় না। দেশের সৌভাগ্য সম্পদ কতটা বাড়িয়াছে, ইহা নির্দ্ধারণ করা বড় কঠিন। তবে ইনকম ট্যাক্সের হিসাব হইতে মোটা মুটি এই বিষয়ের একটা অনুমান করিতে পারা যায়। ১৮৭১-৭২ সালে মেদিনীপুরে মোট ৫৬৫০৮ টাকার ইনকম ট্যাক্স আদায় হইয়াছিল। ১৮৯১—৯২ সালে ৫৭৭২৮ টাকা আদায় হয়; অর্থাৎ শতকরা কিঞ্চিদধিক ২৲ টাকা হারে এই বিংশতি বৎসরের মধ্যে ইনকম ট্যাক্সের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্য দিকে আবকারী আয় শত করা শত মুদ্রা হারে বাড়িয়াছে।

মেদিনীপুরে অহিফেন অত্যন্ত প্রচলিত। ১৮৭৫—৭৬ সালে অহিফেন হইতে মেদিনীপুরের আবকারী আয় ৭৯৬৯২ টাকা ছিল। ১৮৮৫—৮৬ সালে ১২১৬৩৭ টাকা হয়। ১৮৯৫—৯৬ সালে ১৪১২৭০ টাকা হইয়াছে।

মেদিনীপুরে এমন স্থান আছে,যেখানে অহিফেন অত্যন্ত প্রচলিত। সদর সব্‌ডিভিসনে দাঁতন ও নারায়ণ গড় থানায়, গোপালপুর ও কেশিয়ারী এই দুই গ্রামে আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেই অল্পাধিক অহিফেন সেবন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে এই দুই গ্রামে দুইটী গুলির দোকান ছিল; কিন্তু কিছুদিন হইল,গুলিখোর দিগের সৌভাগ্যে দোকান দুইটী উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহারা ঘরে ঘরে আপনাপন ব্যবহারোপযোগী গুলি প্রস্তত করিবার অধিকার পাইয়াছে। মেদিনীপুরে প্রতিমাসে ১১ মণ আফিং খরচ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বৎসরে ১০ মণ আফিং খরচ হইত। আফিমের চল্‌তি বেশী;কিন্তু মদের কাটতিও কম নহে। সদর ভাটিও খোলাভাটি মেদিনীপুরে দুইই প্রচলিত। সদর সবডিভিসনে সদর ভাটি,ও অন্যত্র খোলাভাটি প্রচলিত। খোলাভাটির সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে।১৮৯০ হইতে ৯৫ সাল,এই পাঁচ বৎসর গড়ে মেদিনীপুরে প্রতি বৎসর ১৬টা করিয়া খোলাভাটি মাতালদিগকে মদ যোগাইত। গত বৎসরে (১৮৯৫—৯৬) ২২ টা খোলাভাটী খোলা ছিল। সদর ভাটি হইতে প্রতিদিন ৩ মণ মদ রপ্তানি হইয়া থাকে। মেদিনীপুর সহরে ৪টী মদের দোকান আছে। ইহার একটী মাসে ৪০০ টাকা কর দিয়া থাকে। ব্যবসায়ের লাভ কত,সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু ইহাতেও গভর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট নহেন। গরীব লোকেরা বড়ই পাচই ভক্ত;এই সূত্র অবলম্বনে যদি সরকারের দু দশ টাকা আয় বাড়িয়া যায়,তাহাতেই বা ক্ষতি কি? পূর্ব্বে যেমন মদ, তেমনই পাচই ও লাইসেনি দোকানে বিক্রী হইত। কিন্তু সম্প্রতি গরীব লোকেরা যাহাতে আপনাপন ঘরে বসিয়াই যথেচ্ছা পাচই পান করিতে পারে, সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে তাহার আয়োজন করিয়াছেন। এখন মাসে পাঁচ পয়সা দিলেই প্রত্যেক গৃহস্থ আপনার ঘরে পাচই চোয়াইয়া যত ইচ্ছা পান করিতে পারিবে। এ উপায়েও যদি আবকারীর আয় বৃদ্ধি না হয়, তবে আর কিসে হইবে? কিন্তু রাজার পক্ষে যাহা লাভজনক, প্রজার পক্ষে তাহা মরণান্তক হইয়া উঠিয়াছে।

এ বিপদ নিবারণের উপায় কি ? এক, এদেশে ও বিলাতে বর্ত্তমান আবকারী শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করিয়া, তাহা সংশোধন করিতে হইবে। অপর, দেশের মধ্যে লোকের মনে মাদক সেবনের অনিষ্ট মুদ্রিত করিয়া, দৃষ্টান্ত ও প্ররোচনাদ্বারা মাদক দ্রব্য ব্যবহার বন্ধ করিতে হইবে। এই উভয় উপায় অবলম্বনে কৃতকার্য্য হইলে ঈশ্বরকৃপায় দেশের মাদকতা-বৃদ্ধি নিবারিত হইতে পারে।

কেন দেখিলাম ?

কেন দেখিলাম ?—
আঁখি নাহি পালটিতে
যে আলো নিবিয়ে গেল,
হায়, সে ক্ষণিক আলো কেন দেখিলাম ?
নিশ্বাসে মধুর বাস
টেনে নাহি নিতে নিতে
শুকা'ল যে ফুল, তাহা কেন দেখিলাম ?
যে চাঁদ উদিতে মাত্র
অনন্ত রাহুর গ্রাসে
পড়িল, সে চাঁদ, আহা, কেন দেখিলাম ?
যে তারা ফুটিতে মাত্র
খসিল আকাশ হ'তে,
সে তারা ক্ষণেক তরে কেন দেখিলাম ?
পূর্ব্বাকাশে উঁকি মেরে
ডুবিল অনন্ত মেঘে
যে রবি, হায় রে তাহা কেন দেখিলাম ?
যে নদী নির্ঝর হ'তে
ঝরিয়ে বহিয়া মাত্র
শুকাইয়া গেল, তাহা কেন দেখিলাম ?

কেন দেখিলাম ?—
দেখে মজিলাম ?
না দেখে আবার, আহা, কেন মরিলাম ?
ছিল ভাল নাহি দেখা,
সুখের সে ক্ষীণ রেখা
যাবে মিলাইয়ে, তার হবে পরিণাম
এ অনন্ত দুখ জালা,— নাহি জানিতাম !
যদি জানিতাম,
কেন দেখিতাম
সেই আলো, সেই ফুল, সে চাঁদ, সে তারা,
সেই রবি, সেই নদী, হ'য়ে আত্মহারা ?—
কেন দেখিতাম ?—
কেন মজিতাম ? —
কেন মরিতাম ? —
দেখিয়ে মজিব, মজিয়ে মরিব,
যদি জানিতাম ?
তাই ভাবি—ভাগ্য-দোষে বিধি যদি বাম,
তবে সে মোহিনী মূর্ত্তি কেন দেখিলাম ?

পুস্তকাদির সমালোচনা।

বিশ্বজীবন।— জীবন-বৃত্ত-বিষয়ক ধারাবাহিক পত্র। শ্রীমহেন্দ্র নাথ হালদার প্রণীত।

এই পত্রের ২য় ও ৩য় সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংখ্যায় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, এবং তৃতীয় সংখ্যায় পণ্ডিত প্রেম চন্দ্র তর্কবাগীশের জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

এই দুখানি পত্র পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। জীবনচরিত পাঠে সকলেরই জীবন-গঠনে বিস্তর সহায়তা পাওয়া যায়। আবার স্বদেশীয় মহৎ ব্যক্তিগণের জীবন-চরিত জাতীয় ভাব উদ্দীপনার, এবং স্বদেশের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি বর্দ্ধনের সুযোগ করিয়া দেয়। ভারতে মহৎ জীবনের কোন কালেই অভাব ছিল না, এখনও নাই; কিন্তু জীবন-চরিত লেখা এদেশে কখনও রীতি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জাতীয় ইতিহাস এবং জীবনচরিত না থাকাতে দেশের কতদূর ক্ষতি হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। আজ কাল এ বিষয়ে আমাদের দেশের অনেক লেখক মনোযোগ প্রদান করিতেছেন দেখিয়া বড়ই আনন্দ পাইতেছি। সমালোচ্য পত্র খানি যদিও জীবন চরিতের অভাব পূর্ণ করিবে না,তথাপি সাধারণ লোক, বিশেষতঃ বালকদিগের পক্ষে যে ইহা বিশেষ উপকারী হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহেন্দ্র বাবু এই অনুষ্ঠানের জন্য সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

পত্রের লেখা ভাল্ই হইয়াছে। তথাপি আমরা ইহার ভাষা আরও একটু সরল করিতে সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি। অল্প সীমার মধ্যে যাহা কিছু লেখা হইয়াছে, তাহাতে অনেক বিষয় জানা যায়, এবং পড়িতেও আমোদ জন্মে। জীবন-চরিতের বিশেষ লক্ষ্য বিষয়গুলি অল্পের মধ্যে সকলই উল্লিখিত হইয়াছে।

এরূপ পত্রের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। আমরা ইচ্ছা করি, যে সকল গৃহে কিছুমাত্র লেখা পড়ার চর্চ্চা আছে, তথায় ইহারও এক এক খানি স্থান লাভ করুক। প্রত্যেক বালকেরই ইহা পাঠ করা উচিত। যাঁহারা অল্পব্যয়ে মহৎ লোকের জীবন বিষয়ে কিছু কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদেরও ইহার এক এক খানি গ্রহণ করা উচিত। মহেন্দ্র বাবুর এই কার্য্যে প্রত্যেক বাঙ্গালীর উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

পত্রের দ্বাদশ সংখ্যার মূল্য ছাত্রগণের জন্য ১৲ টাকা ও অপর সাধারণের জন্য ১৷৷০ টাকা; ডাক মাশুল ।৵০। ১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট প্রাপ্তব্য।

জমীদারী ও পরিমিতি।—শ্রীঅক্ষয় কুমার রায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য তিন আনা। পাঠশালার বালকদিগের উপযোগী করিয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে প্রণালীতে পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, তাহাতে ইহা বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে বলিয়া বোধ হয়। সংজ্ঞাগুলি চিরপ্রচলিত প্রথানুযায়ী

ভাষার আড়ম্বরে দুর্ব্বোধ্য না করিয়া, চলিত কথায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জমীদারী ও পরিমিতি সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতি সহজ প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে। ত্রিভুজ ও আয়ত ক্ষেত্রাদির কালির নিয়ম গুলি শুভঙ্করী ধরণে আর্য্যা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আশা করি, টেক্‌ষ্ট্‌ বুক কমিটী এই পুস্তকের সমাদর করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিতে বিমুখ হইবেন না। পুস্তকের গুণের আদর না হইলে, কেহই উন্নতির চেষ্টা করে না। আমাদের বিবেচনায়, গ্রন্থকারের এই প্রণালীর নূতনত্ব, ও তরলমতি শিশুগণের পক্ষে সুবোধ্য করিবার চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

কয়েকটী তত্ত্ব।

কোন ইউরোপীয় ডাক্তারের মতে যাহারা তামাক খায়, তাহাদের ডিপ্‌থিরিয়া রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

ডাক্তর ম্যাক্‌সোয়েল তাঁহার ৫০ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপে প্রকাশ করিতেছেন, যে অধিক পরিমাণে মাংস খাইলে কর্কট (Cancr) রোগ জন্মে।

কেহ কেহ বলেন, দিবারাত্রির অন্য সময় অপেক্ষা প্রাতে ৪টা হইতে ৬টার মধ্যে উদ্ভিদসকল সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়।

মানুষের বাম হস্ত অপেক্ষা দক্ষিণ হস্ত প্রায়ই বৃহৎ ও অধিকতর কার্য্যক্ষম। কিন্তু দক্ষিণ পদ অপেক্ষা বাম পদই সাধারণতঃ বৃহৎ ও বলবত্তর।

যেখানে খড় কিম্বা অন্যান্য জঞ্জাল পড়িয়া থাকে, সেখানে বর্ষাকালে কোঁড়ক জন্মে ; অনেকেই ইহার তরকারি রাঁধিয়া খাইয়াথাকেন, কিন্তু ইহার গুণ অবগত নহেন। অনেকের মতে ইহাতে ঠিক মাংসের মতন সারাল ও পুষ্টিকর পদার্থ বর্ত্তমান আছে।

বিলাতে পূর্ব্বে মশা ছিল না। এক্ষণে কিন্তু স্থানে স্থানে দেখা দিতেছে। মশা তাড়াইবার জন্য বাড়ীর উঠানে এবং আশে পাশে এরণ্ড গাছ লাগাইতে ডাক্তারেরা পরামর্শ দিতেছেন। যে স্থানে এরণ্ড গাছ জন্মে, সেখানে নাকি মশা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে যেরূপ মশার উৎপাত, পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয়, বিশেষতঃ যখন লাভ বই লোকসান নাই।

সংবাদ।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরকজুবিলী উপলক্ষে আগামী ২১শে ও ২২শে জুন সরকারী আফীসগুলি বন্ধ করিবার আদেশ

হইয়াছে। ব্যাঙ্কের কার্য্য শুদ্ধ ২২শে তারিখেই বন্ধ থাকিবে। বঙ্গদেশের প্রজাবর্গের স্বাক্ষ-

প্রেরিত হইতেছে। শুনিতে পাই, সেই অভিনন্দন পত্র কাঁথিতে আসিয়াছিল। কাঁথির গণ্য মান্য লোক সকল তাঁহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন।

মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব লোকপ্রিয় জজ্ প্র্যাট সাহেব লিগ্যাল রিমেম্ব্রেন্সার ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পদোন্নতিতে ও সম্মানবৃদ্ধিতে মেদিনীপুরবাসী সুখী হইয়াছে।

বিগত ৩রা এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুর কালেজ হলে অত্রত্য সুযোগ্য কালেক্টর মিঃ ব্রাইট্ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে একটী সাধারণ সভা আহ্বান করেন। সভাতে সকল সম্প্রদায়ের লোকই উপস্থিত ছিলেন। রাজা, জমিদার, উকীল, মোক্তার, হাকিম, মহাজন, আমলা প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি উৎসাহের সহিত সভাতে যোগ দান করিয়াছিলেন। সভাস্থলে প্রায়৫০০০৲ টাকা স্বাক্ষরিত ও প্রায় ২৫০৲ টাকা সংগৃহীত হয়। ব্রাইট্ বাহাদুর একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলে, মেদিনীপুর জজ আদালতের উকীল বাবু ত্রৈলোক্য নাথ পাল বাঙ্গালা ভাষায় একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। অবশেষে সন্ধ্যার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

মেদিনীপুর কালেজের প্রিন্সিপাল বাবু হরি চরণ রায় চট্টগ্রাম কালেজে বদলি হইয়াছেন। ঐ পদের বর্ত্তমান সময়ে বেতন ২০০৲ টাকা অবধারিত আছে। বিগত ১০ই এপ্রিল তারিখে অত্রত্য মিউনিসিপ্যাল কমিসনর মহাশয়গণ ঐ ২০০৲ টাকা ঐ পদের বেতন স্থিরতর পূর্ব্বক, বিজ্ঞাপন দেওনের মত [illegible]

[illegible] সনরগণ আপনাদের দায়িত্ব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যাহাতে বিদ্যালয়টীর সুবন্দোবস্ত হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইলে তাঁহারা মেদিনীপুর জেলার অধিবাসিগণের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন।

শুনিয়া সুখী হইলাম,মেদিনীপুরে একটী নূতন সভা গঠিত হইয়াছে। এই সভার নাম "মেদিনীপুর হিত সাধিনী সভা"। ইহার উদ্দেশ্য,— মেদিনীপুর জেলার হিত সাধন করা, এবং এই জেলায় যে সকল অনিষ্ট হইতেছে বা হইবে, তাহা নিবারণ করা। বিগত ১২ই এপ্রিল ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একটী অধিবেশনে নিয়মাবলী ও কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকৃত হইয়াছে। জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শাখা সভা সংস্থাপন করা হইবে। শাখা সভার সাহায্যে ও অন্যান্য উপায়ে মূল সভা কার্য্য করিবেন। জেলার প্রত্যেক অধিবাসীর কর্ত্তব্য মেদিনীপুর হিত-সাধিনী সভার সহায়তা করেন। আমরা আশা করি, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে যে সকল বিজ্ঞ ও উৎসাহী ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের দ্বারা হিতসাধিনী সভার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সভার উদ্দেশ্য মহৎ;সভ্যগণ শনৈঃশনৈঃ কার্য্য করিয়া উদ্দেশ্যসাধনপক্ষে প্রয়াসী হইলে, তাঁহারা মেদিনীপুর জেলাবাসী ব্যক্তি মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইবেন। এইরূপ সভাসমিতির দ্বারাই দেশের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ফরিদপুর সুহৃদ্-সভা,যশোহর-খুলনা সম্মিলনী, উত্তর পাড়ার হিতকারী সভা, পুনা সার্ব্বজনিক সভা প্রভৃতি সভা দেশের কতই না উপকার করিয়াছেন। এই হিত-সাধিনী সভার স্থায়িত্ব

সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। উকিল, ডাক্তার, জমীদার, স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি অনেকগুলি মান্য গণ্য ব্যক্তি ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত আছেন। অবগত হইলাম, ২৫ জন সভ্যদ্বারা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। মেদিনীপুরের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণলাল মজুমদার ইহার সভাপতি, প্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র প্রতিনিধি সভাপতি, প্রসিদ্ধ উকীল ও মেদিনীপুর-ইতিহাস-প্রণেতা বাবু ত্রৈলোক্য নাথ পাল সম্পাদক। এতদ্ব্যতীত দুই জন উৎসাহশীল যুবক ইহার সহকারী সম্পাদক। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, সভ্যমহোদয়গণ উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে হিত-সাধিনী সভার কার্য্য করিয়া জেলার উন্নতি বিধানে সবিশেষ মনোযোগী হইবেন।

গত ৩রা এপ্রিল ১০ টার সময় বেনাপুরা আউট পোষ্টের পূর্ব্ব উত্তর ২॥ মাইল অন্তর চেঙ্গল গ্রামে তেজ চন্দ্র পাল জমিদারের বাটীতে একটী ডাকাতি হইয়াছে। ডাকাতের দলে প্রায় ৪০। ৫০ জন লোক ছিল। উহারা সদর খিড়কি দরজা কাটিয়া ও ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করত লোহার সিন্দুক কাটিয়া ও পেটরা বাক্স ভাঙ্গিয়া প্রায় ৬৮৩৭৸৴০ টাকা মূল্যের মাল লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ডাকাতদের কাহারও পাজামা কাহারও মাথায় পাগড়ি, কাহারও মাল কোচ্ছা মারা কাপড় পরা, কাহারও গালপাট্টা বাঁধা ছিল। উহাদের মধ্যে অনেকের হাতে মোটা লাঠি কুড়াল আদি ছিল। কেহ কেহ লণ্ঠণ লইয়া গিয়াছিল।

৬ই এপ্রিল রাত্রে বেনাপুরা আউট-পোষ্টের এলাকায় বগগাই গ্রামের রাধা গোবিন্দ কুণ্ডু ও তাহার জেঠতুত ভাই রাধাবল্লভ কুণ্ডুর ঘরে ডাকাইতি হইয়াছে। দলে ২৫,৩০ জন লোক। ডাকাতেরা কপাট ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করত বাক্স, পেটারা ভাঙ্গিয়া ৩৮২৶০ টাকা মূল্যের মাল লইয়াছে। ডাকাতদের হাতে বড় ছোরা, কুড়াল, তলওয়ার ছিল; গালপাট্টা বাঁধা, মাল কোচ্ছা মারা কাপড় পরা ও মাথায় পাগড়ি ছিল , এবং তাহারা হিন্দিতে কথা কহিয়াছিল।

এই মাসেই পাঁশকুড়া থানার লস্করপুর গ্রামে নবকৃষ্ণ পাণিগ্রাহির বাটীতে ডাকাতি হইয়াছে। ডাকাতদের হাতে লাঠি,এবং মাল কাচ্ছা মারা কাপড় পরা ছিল। উহারা হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী বলিয়া জানা গিয়াছে। কাহার কাহার মাথায় লাল পাগড়ি। দলে প্রায় ৬০ জন লোক। বাক্স, সিন্দুক ভাঙ্গিয়া প্রায় ১৫৮৮৶৵মূল্যের মাল লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে, এই ডাকাতির পর প্রতি-বেশী শ্রীনাথ চন্দ্র পড়্যার ঘরে ঐ সময় ডাকাতি করিয়া ১৮৶মূল্যের মাল লইয়াছে।

লাহোর আর্য্যসমাজে পণ্ডিত লেখরাম নামে একজন প্রচারক ছিলেন। তিনি মুসলমানদিগের ধর্ম্মমতের খণ্ডন করিয়া কয়েক খানি পুস্তিকা প্রণয়ন ও কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। জনৈক মুসলমান স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে বলিয়া পণ্ডিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রায় একমাস কাল পণ্ডিতের বাটীতে থাকিয়া গত ৬ই মার্চ্চ ইদের দিন সন্ধ্যাশালে লেখ-

রামের মাতা ও বনিতার চক্ষুর সম্মুখেই দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান লেখ্‌রামের উদরে বিষম ছুরিকাঘাত করিয়া সেই বাটী হইতে পলায়ন করে। তৎক্ষণাৎ পণ্ডিতকে মেয়ো হাঁস্‌পাতালে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করা হয়। চিকিৎসায় কোনও ফল হয় নাই। রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় পণ্ডিতের মৃত্যু হইয়াছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য লাহোরবাসী হিন্দু মুসলমানে ভয়ানক মনোবাদ উপস্থিত হইয়াছে। পণ্ডিতের আত্মীয়বর্গের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ লাহোরবাসী হিন্দুগণ সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে অকাতরে অর্থদান করিতেছেন। লেখ্‌রামের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ কয়েক সহস্র মুদ্রা চাঁদা উঠিয়াছে। হত্যাকারীকে ধরিয়া বিচারালয়ে আনিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট্‌ ও হিন্দুগণ সমবেত চেষ্টা করিতেছেন। এখন পর্য্যন্ত তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতা বড়বাজারে কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৃষ্টি হইবে কি না, বাজি রাখিয়া যে স্নরতি খেলা হইত, তাহার বিরুদ্ধে অনেক দিন হইতে আন্দোলন হইতেছিল। আন্দোলনে ফল হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট্‌ আইন করিয়া সম্প্রতি সেই স্নরতি খেলা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতার মাড়োয়ারি সমাজ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

প্রতিবাদ।

দোরো পরগণার বৈষ্ণবচক নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজ গোপাল প্রধান মহাশয়, রাজা যাদবরাম রায়ের জীবনী-সংক্রান্ত দুটী বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছেন। স্থানাভাব বশতঃ সম্পূর্ণ চিঠীখানি মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন, কান্তিতে যে হরিচরণ দাস ভাসিয়া আসিয়াছিলেন, এবং গম্ভীর প্রধান কাষ্ঠাজীব ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা ভ্রমাত্মক হইয়াছে। যে সময়ের কথা বলা হইয়াছে, তখন হরিচরণ দাস পুরুষানুক্রমে জমীদার ছিলেন।

তিনি আরো লিখিয়াছেন, যে গম্ভীর প্রধানের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্ব হইতেই সম্মানিত জমীদারি কার্য্য প্রভৃতি করিতেছিলেন। ... হইলে, বিক্রমচন্দ্র প্রধান দোরো পরগণার স্থায়ী কর্ম্মচারী রূপে প্রেরিত হন, এবং কার্য্যদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ এক খণ্ড মহাত্রাণ ভূমি প্রাপ্ত হয়েন। তথায় গোলাবাটী নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গম্ভীর প্রধান মজুরের দ্বারা পার্শ্বস্থ জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছিলেন; এমন সময় রাজা যাদবরাম তথায় নৌকাযোগে উত্তীর্ণ হয়েন। অন্য যানাভাবে গম্ভীর স্বীয় মজুরগণের দ্বারা বাহিত এক দোলা যন্ত্রে করিয়া তাঁহাকে কাছারী বাটী আনয়ন করান। তাহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া আর এক খণ্ড বিস্তীর্ণ জঙ্গল দান করিতে চাহেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মহাত্রাণ আবাদ হয় নাই বলিয়া বিক্রম চন্দ্র প্রধান তাহা লইতে অস্বীকার করেন।

শ্রুত কিম্বদন্তী অবলম্বনে লিখিত; তাহাতে ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে, তাহা পূর্ব্বেই স্বীকার করা হইয়াছে। ব্রজগোপাল বাবু ইহাতে উক্ত বংশীয় ব্যক্তিগণের সম্মানের হানি হইতেছে মনে করিয়া দুঃখিত হইয়াছেন; কারণ উক্ত বংশীয়েরা অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহিত বিবাহাদি সূত্রে আবদ্ধ এবং সম্মানিত বলিয়া পরিগণিত।

কাহাকেও ছোট করিবার উদ্দেশ্যে কান্তিতে কোন কথা লেখা হয় নাই; সুতরাং এরূপ ভ্রমে কাহারও অসম্মানের কারণ ঘটিতে পারে না। যাহা হউক, আমরা আশা করি, ব্রজগোপাল বাবু এ বিষয়ে আর কোন মনো-দুঃখ রাখিবেন না। আর তিনি যদি এই উপলক্ষে আমাদিগকে রাজা যাদবরামের জীবনী সংক্রান্ত কোন বিষয়ে বিশেষ সংবাদ দিতে পারেন, কৃতজ্ঞতা সহকারে তাহা গ্রহণ করিব। কি ঘটনায় রাজা গম্ভীর প্রধানের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া জমী দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা বিশেষ জানিতে আমাদিগের কৌতূহল রহিয়া গেল।

কান্তি সম্পাদক।

অকৃত্রিম প্রেম।

(প্রাপ্ত)

১

অই যে একটি ফুল ফুটিয়া কাননে,—
সুষমার ডালি ধরি,
কাননে বিরাজ করি,
মাতাইছে মধু-লোভে মত্ত অলিগণে;
জানকি, স্বজনি, তুমি, ও চারু প্রসূনে?

২

অই যে একটী শশী উদিয়া গগণে,—
সঙ্গে কত অগণন,
শোভিছে নক্ষত্রগণ,
ভাসিছে কিরণ-জালে নিখিল ভুবনে;
কেন হাসে শশধর, জান চন্দ্রাননে ?

৩

সংসার-ললামভূতা অপরা ভামিনী,—
কোমল মধুর ভাষে,
ঈষৎ সুচারু হাসে,
সখী-পাশে কহে সুর-সুন্দরী-রূপিনী;
কুসুম ইন্দুর বার্ত্তা শুন সুবদনি !

৪

কাননে কুসুম-প্রেম বিচল সতত;
ফুটি ও কুসুমোদ্যানে,
মজাইছে অলিগণে,
কুলটা নারীর ভাব আচরে নিয়ত;
কিন্তু কুমুদিনী সদা ইন্দু-প্রেমে রত।

৫

পতিরতা পতিব্রতা সতী কুমুদিনী;
উদিলে শশী আকাশে,
সুখ-সিন্ধু-নীরে ভাসে,
পতির বিরহে ধনী মুদিতনয়নী;
তাই হাসে শশধর, ইন্দুনিভাননি !

৬

একাধারে সমর্পিত যার প্রেমমণি,—
সে নারী অবনীতলে,
উজ্জ্বল নক্ষত্র জ্বলে,
ধন্য সেই নারী-রত্ন ভুবন-মোহিনী;
ধন্য তার প্রেম-সুধা প্রাণ-সঞ্চারণী।

শ্রী [illegible]শি ভূষণ বন্দোপাধ্যায়।

প্রেম ও মানব-প্রকৃতি।

শরীরের পক্ষে যেমন ক্ষুৎপিপাসা, মানব-মনের পক্ষে প্রেমও তেমনি একটী স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। ক্ষুধায় অন্ন চাই, পিপাসায় জল চাই; প্রাণের ক্ষুৎপিপাসারূপ এই অদম্য আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্যও তেমনই প্রেমপাত্র চাই। ক্ষুৎপিপাসায় অন্ন জল না পাইলে শরীর দুর্ব্বল, নিস্তেজ, ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে; এবং সে অবস্থায় অন্য কোন কর্ম্ম করিতে পারা যায় না; মনের মত প্রেমের পাত্র না পাইলে, মনও তেমনই বিষণ্ণ নিরানন্দ এবং নিরুদ্যম হইয়া পড়ে; এবং কোন প্রকার কর্ম্মেই তাহার উৎসাহ থাকে না। অন্ন জল শরীরে বল, পুষ্টি ও কান্তি প্রদান করে; প্রেম-পাত্রের মিলনও মনে তেজ, আনন্দ, উৎসাহ প্রভৃতি আনয়ন করে। অন্ন জলের সংস্থান না হইলে মানুষ সুস্থির হইতে পারে না; প্রেম-পাত্র না পাইলেও তাহার মন প্রাণ সুস্থির হয় না।

ক্ষুধায় যাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত, পিপাসায় যাহার কণ্ঠ শুষ্ক, তাহার কি অন্নজল ভিন্ন অপর কোন পদার্থে তৃপ্তি জন্মিতে পারে? এরূপ ব্যক্তির নিকট সংসারের অপর তাবৎ পদার্থই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; কোন পদার্থই আর তাহার মনোরঞ্জন করিতে পারে না। কি প্রকৃতির শোভা, কি প্রচুর ধন রত্ন, কি অজস্র প্রশংসাধ্বনি, কি অপর কোন পদার্থ, কিছুই তাহার ভাল লাগে না। যাহার এ সংসারে ভাল বাসিবার কোন পদার্থ নাই; কোন ব্যক্তি, বস্তু বা অবস্থার প্রতি যাহার হৃদয়ের আকর্ষণ নাই, তাহার প্রাণ ভরা গভীর বিরাগ। তাহার জীবন উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন, নীরস এবং ভারবহ। এই বিশাল বিশ্বে সে কিছুই সুন্দর দেখিতে পায় না, কোন জিনিস পাইবার জন্য তাহার আগ্রহ নাই, কোন পদার্থ লাভ করিয়া তাহার উল্লাস নাই; কাহারও প্রশংসায় তাহার হৃদয় নৃত্য করে না; কাহারও নিন্দায় তাহার প্রাণে বেদনা জন্মে না অধিক কি, এই বিশ্ব মহাপ্রলয়ের কুক্ষিগত হইলেও তাহার কিছু মাত্র দুঃখ হয় না।

এ সংসারে ভোগের পদার্থ অনেক আছে। কিন্তু মানুষ অগ্রে অন্নসংস্থানের জন্যই ব্যস্ত হয়। যাহার অন্নের চিন্তা ঘুচিয়াছে সে অন্যান্য বস্তু সম্ভোগ করিতে অভিলাষী হইতে পারে। তখন তাহার উত্তম বেশভুষা, সুন্দর গৃহ, কোমল শয্যা প্রভৃতি বিলাস-সামগ্রীর চিন্তা করিবার অবসর হয়। কিন্তু নিরন্ন ব্যক্তির বিলাসের চিন্তা সম্ভব বা স্বাভাবিক নহে। ক্ষুৎক্ষাম অন্নসংস্থানহীন ব্যক্তি বিলাসসামগ্রীর তারতম্য বোধ করিতেও সমর্থ হয় না। তেমনি, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তি বা বস্তুতে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া প্রাণের অদম্য আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করিতে পারিয়াছে, সেই এ জগতের অপরাপর সুখদুঃখের বিচারে সক্ষম হয়। শূন্য-হৃদয় প্রেমকাঙ্গালের পক্ষে এ বিচার নিতান্তই অসম্ভব। সে এ জগতের অপর কোন সুখই অনুভব করিতে পারে না, কাজেই

এ জগৎ তাহার পক্ষে নীরস ও অন্ধকারময় বোধ হইতে থাকে। প্রিয়বিচ্ছেদে শোকার্ত্ত ব্যক্তি যে জগতের কোন পদার্থ দেখিয়া প্রফুল্ল হয় না, তাহার কারণ আর অন্য কিছুই নহে; হৃদয়ের প্রীতিপাত্র হারাইয়া, তাহার হৃদয়ে যে ভীষণ শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আর কেহ পরিপূর্ণ করিতে পারে না। সে শোকানল যতক্ষণ জ্বলিবে, ততক্ষণ জগৎ শ্মশানতুল্য, মহাশূন্যতার হাহাকারে পরিপূর্ণ—ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সে যার কাঙ্গাল, তা এ জগতে নাই, তবে জগৎ শূন্য নয় তো কি?

মনকে প্রেমের পদার্থ দাও, নতুবা তাহাকে সুস্থির রাখিতে পারিবে না। যেখানে ভাল বাসার পদার্থ নাই, সে স্থানে থাকিয়া কাহারও সুখ হয় না। প্রাণ সে স্থানকে শ্মশানের মত পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। প্রেমের দায়েই মানুষ দেশ দেশান্তরে যায়; জল জঙ্গল অতিক্রম করিয়া অনেক ক্লেশ সহ্য করে। প্রেমের উপলক্ষ যেখানে নাই, কোন প্রকারে যেখানে প্রেমপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা নাই, মানব সে স্থানকে হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ অরণ্যাপেক্ষাও অধিকতর বিদ্বেষ করে,—সে স্থানে বাস নরকবাসের তুল্য দুঃখকর বোধ করিয়া, যেখানে তার মনের মত জিনিষটী,—প্রেমের পাত্রটী—পাইবার আশা করে, তথায় চলিয়া যায়। রাজপ্রাসাদ ও অতুল ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করিয়া, প্রেমপাত্রের উদ্দেশে অনেক লোক গৃহত্যাগী হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের সময় উদরের জ্বালায় লোকে খাদ্যাখাদ্যবিচার বিস্মৃত হয়, জাতিবিচার ভুলিয়া যায়; লজ্জা ভয় দূরে নিঃক্ষেপ করে, কুলমানের চিন্তা পরিত্যাগ করে; ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানে জলাঞ্জলি দেয়; আত্মীয় স্বজনকে বিস্মৃত হয়; এমন কি, অপত্যস্নেহ পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে উন্মূলন করিয়া ফেলে; ইহার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে, প্রাণের এই অদম্য আকাঙ্ক্ষার তাড়নায়, কত নর নারী অবলীলাক্রমে ধন জন, বন্ধু বান্ধব, লজ্জা ভয়, গৃহ সমাজ, জাতি কুল বিসর্জ্জন করিয়াছে; তাহারও প্রচুর দৃষ্টান্ত অহরহ ঘটিতেছে। প্রেম এমনি পদার্থ বটে!

উদরের জ্বালা নিবৃত্ত করিবার জন্যই অন্নচিন্তা নতুবা কে আর অন্নের জন্য লালায়িত হইত? প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার জন্যই ভালবাসা; নতুবা কেই বা ভালবাসিত? ভালবাসাটা সখের জিনিষ নহে; সাধ করিয়া কেহ ভাল বাসিতে যায় না। প্রেম বিনা প্রাণের তৃপ্তি হয় না; প্রেম ভিন্ন সুখ হয় না— প্রেমই সুখের মূল মন্ত্র।

মানবমাত্রেই কোন না কোন পদার্থকে প্রেম করে। কেহ বিদ্যা ভালবাসে, কেহ ধন ঐশ্বর্য্য ভালবাসে, কেহ ভোগবিলাস ভালবাসে, কেহ কোন জীবকে ভালবাসে, কেহ বা ভগবানকে ভালবাসে। অপত্যস্নেহ, দাম্পত্য প্রেম, বিদ্যানুরাগ, স্বদেশানুরাগ, বিলাসপ্রিয়তা, এমন কি, ব্যভিচার পর্য্যন্ত এই স্বাভাবিক প্রেম-বৃত্তির বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে;— কেবল প্রেম-পাত্রের প্রভেদ মাত্র। ফলতঃ কোন না কোন পদার্থকে প্রেম না করিয়া মানুষ বাঁচিতেই পারে না।

প্রেমই মানুষের জীবনী শক্তি। প্রেমের শক্তিতেই মানব-সমাজ রক্ষিত। যদি এক

মুহূর্ত্তের জন্যও প্রেম পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয়, মানুব জাতি উৎসন্ন হইয়া যাইবে। কেহই আর কোন কর্ম্ম করিবে না, কিছুতেই তৃপ্তি পাইবে না। মুহূর্ত্ত মধ্যে মানব মণ্ডলী উন্মাদাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, ঘোর হাহাকার করিতে করিতে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

জগতে যাহার কোন পদার্থে প্রেম নাই, কোন অবস্থায় আসক্তি বা অনুরাগ নাই, কোন জীবের প্রতি যাহার বিন্দু মাত্র ভালবাসা নাই, সে হয় আত্মহত্যা করে, নয় উন্মাদ হয়। যত আত্মহত্যা পৃথিবীতে ঘটে, অনুসন্ধান করিলে, তাহার প্রত্যেকেরই মূলে মহাবিরাগ লক্ষিত হইবে। প্রেমহীন ব্যক্তি মানব-মণ্ডলীর জীবন-চেষ্টার কোন অর্থ বুঝিতে পারে না; সমগ্র পৃথিবী তাহার উপেক্ষার ভাজন;সকলকেই সে মনে মনে উপহাস করে, অথবা প্রতারক বলিয়া সন্দেহ করে। এই রূপেই মানুষ পাগল হয়।

কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি যাহার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে, সেই পদার্থের বিয়োগেও এ সংসার তাহার নিকট নিতান্ত নীরস, শূন্যময়, ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হয়;— এই অবস্থাতেও লোক পাগল হইতে বা আত্মহত্যা করিতে পারে। ফলতঃ আকাঙ্ক্ষানুরূপ প্রিয় পদার্থের অভাব অথবা বিচ্ছেদই, এ পৃথিবীর সমুদয় আত্মহত্যা ও উন্মাদের মূল।

মানুষ ভ্রান্তিবশতঃ মনে করে, যে বাহ্য ভোগের পদার্থেই মানুষ সুখী হইতে পারে। দেহরক্ষার জন্য অন্নজলাদি, এবং ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য নানা প্রকার সামগ্রীর প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু সেই সকল পদার্থেই যদি মানুষ প্রাণের তৃপ্তি লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে ধনীর গৃহে আর কোন প্রকার দুঃখ, অশান্তি, আত্মহত্যা, উন্মাদ, কুলত্যাগ, কিম্বা সন্ন্যাসগ্রহণ দেখা যাইত না। ফলতঃ শারীরিক তৃপ্তি অপেক্ষা মানসিক তৃপ্তিই মানবের সুখের জন্য অধিকতর প্রয়োজনীয়। সেই মানসিক তৃপ্তি প্রেমেই সম্ভব, আর কিছুতেই নহে।

যদি প্রেম-পাত্র পাওয়া যায়, "মনের মত রতন" যদি মিলে, তবে তাহাকে লইয়া সকল দুঃখই ভুলিতে পারা-যায়, সকল অবস্থাই সুখকর হয়। প্রেমে হৃদয় তৃপ্ত হইলে, মানুষ আর কিছুরই জন্য ব্যাকুল হয় না। দুঃখ দূর করিবার শক্তি প্রেমের তুল্য আর কিছুরই নাই। প্রেম দুঃখকেও আনন্দময় এবং সৌভাগ্যসূচক করিয়া তোলে। প্রেমপাত্রের জন্য সামান্য দুঃখ দূরে থাকুক, মৃত্যুও সুখকর বোধ হয়। যে কখনও কাহাকেও প্রেম করিয়াছে, সেই জানে প্রেম-পাত্রের জন্য দুঃখ ভোগে কত তৃপ্তি, কত আনন্দ।

জীবন-সঙ্গীত।

১

গেয়োনা নিরাশ প্রাণে বিষাদের স্বরে,—
" দুঃখময় এ সংসার,
জীবন দুঃখের ভার;
ভবলীলা সুধু কর্ম্ম-ফল-ভোগ তরে,—
কারাগারে বন্দী যথা দণ্ডভোগ করে।"

২

বোলো না " জীবন সুধু নিশার স্বপন;
সকলি অসার,— মিথ্যা জনম জীবন;
এই যে বিশাল বিশ্ব,
এ সুধু ভ্রমের দৃশ্য,—
সুখ দুঃখ হাসি কান্না সকলই স্বপন;
পরিণাম সবাকার কেবল মরণ।"

৩

বিধির নিঠুর খেলা নহে এ জীবন,
অর্থহীন বাতুলতা নহে এ সৃজন;—
অনন্ত জ্ঞানের লীলা
এ বিশ্ব প্রেমের মেলা
অনিত্যে নিত্যের খেলা, বিচিত্র মিলন;
মরণের পারে আছে অনন্ত জীবন!

৪

বিধাতার অভিপ্রায় মানব-জীবনে
পরম কল্যাণময়, ভাবিলে না মনে;
শুধু সুখ দুঃখ গণি
হারালে পরশ মণি,
লক্ষ্যহীন পথভ্রান্ত সংসার-গহনে;
সতত জ্বলিছ তাই নিরাশা-দহনে।

৫

এই দেহে বাস করে দেবতা অসুর,
উভয়ে উভয়ে চায় করিবারে দুর;
ভুলাতে জীবের মন
অসুরের প্রলোভন—
অনিত্য সুখের আশা রয়েছে প্রচুর;
দেবতা ডাকিছে শুধু কোমল মধুর।

৬

দুই দিকে দুই জন টানিছে জীবেরে,
নিরন্তর যুঝে দোঁহে মানব-অন্তরে;—
পার যদি নাশিবারে
ঘোর শত্রু সে অসুরে,
পার যদি দেব ভাব জাগাতে অন্তরে,
বুঝিবে পরম তত্ত্ব— জন্ম যার তরে।

৭

দুর কর ভবিষ্যের সুখের কল্পনা,
দুর কর অতীতের নিষ্ফল শোচনা;
কর তবে দৃঢ় পণ
মহোৎসাহে কর রণ;
মোহময় রিপুদলে করহ তাড়না,
নির্ভয় অন্তরে কর কর্ত্তব্য সাধনা।

৮

রয়েছে অনেক কার্য্য করিতে সাধন;—
পলে পলে প্রতিক্ষণ যায় যে জীবন,—
ঘুমাতে সময় নাই
ত্বরা করি চল ভাই
নিদ্রিত পাইলে শত্রু ছাড়ে কি কখন?
রণক্ষেত্রে নিদ্রা যায় সে যোদ্ধা কেমন?

৯

অই যে সম্মুখে দেখ সিংহনাদ করি,
রিপু জিনি বিজয়-পতাকা করে ধরি
অই মহাজনগণ
করিছেন আবাহন
চল যাই আমরাও অই পথ ধরি
ঈশ্বরে স্মরিয়ে চল চল ত্বরা করি।

১০

যা থাকে কপালে,হবে, ভেবো না ভেবো না,
কর্ত্তব্য সাধনে ভয় করো না করো না;
অবিরাম কর রণ,
আশু হও প্রতিক্ষণ,
বীর দর্পে কর কার্য্য চঞ্চল হয়ো না;
বিধাতা সহায় সদা,ভুলো না ভুলো না।

পার্লিয়ামেণ্ট বা ইংরাজ জাতির মহাসভা। — (২)

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে কোনও সভ্যের নির্দ্দিষ্ট আসন নাই; কিন্তু সভ্যদিগের মধ্য হইতে মহারাণী যাঁহাদিগকে মন্ত্রিত্ব পদে বরণ করেন এবং যাঁহারা ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী-সভার সভ্য ছিলেন তাঁহাদিগেরই নির্দ্দিষ্ট আসন আছে, এবং লণ্ডনের লর্ড মেয়র যদি কখনও সাধারন সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন, তবে তাঁহারও আসন নির্দ্দিষ্ট থাকে। মধ্যস্থলে Speaker অথবা সভাপতি আসীন হন; তাঁহার সম্মুখে একখানা সুবৃহৎ টেবিল, এবং টেবিলের উপর কাগজ পত্র রাখিবার জন্য কয়েকটী বাক্স থাকে। মন্ত্রীগণ অথবা অপোজিসনের অধিনেতৃগণ এই টেবিলের উপর কাগজ পত্র রাখিতে পারেন। মন্ত্রীগণ তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় গুলি পূর্ব্ব হইতে প্রস্তত করিয়া মহাসভায় লইয়া যান এবং সমুদায় কাগজ পত্র এই টেবিলে রাখেন, কিন্তু অন্যান্য সভ্যগন সেই সুবিধা পান না; তাঁহাদিগকে কাগজ পত্র হাতে করিয়াই বসিতে হয়। ইহাতে সভার কাজ কর্ম্মের অসুবিধা না হইয়া বরং সুবিধা হইয়া থাকে; কেননা সভ্যগণ সভার কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছু কার্য্য করিতে পারেন না। আমেরিকার প্রতিনিধি-সভার সভ্যগণের সম্মুখে এক এক খানি ডেস্ক থাকায় তাঁহারা কেহ কেহ আপনাদের পত্রাদি লেখেন, সুতরাং অনেক সময় তাঁহারা সভার কার্য্যে অমনোযোগ দেন কিন্তু ইংলণ্ডের মহাসভায় তাহা করিবার উপায় নাই। মহাসভায় যে কার্য্য হউক না কেন, সভ্যগণকে বাধ্য হইয়া শুনিতে হইবেই হইবে। তবে যদি কেহ নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে তাহার উপর কাহারও হাত নাই। সভাপতির দক্ষিণ পার্শ্বে বর্ত্তমান মন্ত্রীগণ আসীন হন, এবং বাম পার্শ্বে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীদিগের স্থান।

উপাসনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সভাপতি তাঁহার স্বকীয় পদের বিচিত্র বসনে আবৃত হইয়া সভাগৃহের দিকে গমন করেন। তাঁহার মস্তকে সুদীর্ঘ পরচুলা, বৃহৎ বৃহৎ বোতাম সংযুক্ত আপাদলম্বিত সুবৃহৎ কোট, পায়ে গোড়ালি বিহীন পাদুকা, এবং হস্তে একটী লম্বমান অসি। অতি প্রাচীন কাল হইতে তিনি সভায় আসন পরিগ্রহ করিবার সময় এইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন। তাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে কতকগুলি অস্ত্রধারী পুলীশ কর্ম্মচারী গমন করিতে থাকেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক জনও থাকে। চ্যাপ্লেন বা পাদ্রী মহাশয় হস্তে উপাসনা-পুস্তক গ্রহণ করিয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। অগ্রে অগ্রে পার্লিয়ামেণ্ট গৃহের ভারপ্রাপ্ত প্রধান পুলীশ কর্ম্মচারী (Sergeant-at-arms) সভাপতির দণ্ড হস্তে লইয়া গমন করেন। ভৃত্যগণ Speaker আসিতেছেন, টুপী খোল, টুপী খোল, বলিয়া চীৎকার করেন, এবং পার্লিয়ামেণ্ট গৃহের বারন্দায় (Lobby,-তে) যদি কখনও কেহ গোলমাল করে তবে সভাপতি মহাশয়ের আগমন মাত্র সব নিস্তব্ধ হইয়া যায়; এবং পুলিশ কর্ম্মচারীগণের চীৎকারেই হউক অথবা সভাপতি মহাশয়ের সম্মান প্রদর্শনা-

র্থই হউক সকলেই মস্তক হইতে টুপী উন্মোচন করেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে সকল রীতি অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে বর্ত্তমান ইংরেজগণ সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। এই মহাসভার অতীত বৃত্তান্ত বিবিধ ঘটনায় পূর্ণ। এখানে কত অগ্নিময়ী বক্তৃতা বজ্র নির্ঘোষে নিনাদিত হইয়া স্বেচ্ছাচারের উপর স্বাধীনতার পতাকা প্রোথিত করিয়াছে। ইংরাজ জাতির নিকট ইহার প্রত্যেক ঘটনা অতি পবিত্র ও প্রিয়; সুতরাং এই সভা সম্বন্ধে কোনও প্রাচীন প্রথা ইঁহারা ত্যাগ করিতে সম্মত নহেন।

সভাপতি সভাগৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র সভ্যগণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মস্তকের টুপী উন্মোচন করিয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করেন। সভাপতি মহাশয়ও দুই তিন বার মস্তক অবনত করিয়া সভ্যগণকে প্রত্যভিবাদন করেন। দর্শক এই সভায় প্রবেশ করিয়া একটি অভিনব দৃশ্য দেখিতে পাইবেন। ইউরোপের অন্যান্য দেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ সভায় আসীন হইয়া মস্তকে টুপী রাখিবার অধিকার পান না, কিন্তু এইখানে তাহার বিপরীত। মস্তকাবৃত করিয়া বসিয়া থাকা এই খানকার নিয়ম; টুপী খুলিয়া বসা বরং নিয়মের ব্যতিক্রম বলা যাইতে পারে। তবে অনেক গণ্য মান্য সভ্য টুপী খুলিয়াও বসিয়া থাকেন। মহামান্য গ্লাড্‌ষ্টোন, ডিজ্‌রেলি, রসেল, ও মহাসভার পূর্ব্বতন নেতা স্মিথ্ সাহেব সভায় অনাবৃত মস্তকে উপবেশন করিতেন। যদি কোনও সভ্য বক্তৃতা করিতে উঠেন, অথবা সভাগৃহ পরিত্যাগ করিবার মানসে তাঁহার স্থান ত্যাগ করেন, তাহা হইলে টুপি খুলিয়া রাখেন; যদি এক সভ্য আর এক সভ্যকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলেও তাঁহার মাথার টুপি খুলিয়া ফেলিতে হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সভাপতির দক্ষিণ দিকের প্রথম বেঞ্চে বর্ত্তমান মন্ত্রীগণের স্থান, এবং তাঁহার বামদিকে অপোজিসন্ বা গভর্ণমেণ্টের বিরোধীগণের স্থান। ইঁহাদিগের নেতাগণ পরস্পরের সম্মুখে আসীন হইয়া এক দল আর এক দলের ভাব এবং কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষন করিতে থাকে। এক দিকে গ্লাড্‌ষ্টোন আর এক দিকে ডিজ্‌রেলী। গ্লাডষ্টোনের মুখ উৎসাহে পরিপূর্ণ যেন অন্তরের প্রত্যেক ভাবটী মুখচ্ছবিতে প্রকাশিত। সরলতা, সাধুতা, অদম্য উৎসাহ, গভীর স্বদেশ-হিতৈষণা, ও বিশ্বাসের গভীরতা তাঁহার প্রত্যেক লোমকূপ হইতে বহির্গত হইতেছে। এমন কি বধির মনুষ্যও তাঁহার মুখ দেখিয়া, তাঁহার অন্তরে কি ভাব খেলা করিতেছে তাহা বলিতে পারিত। অপর দিকে বিরোধীগণের নেতা ডিজ্‌রেলী তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি যেন একটী প্রস্তরের মূর্ত্তি বসিয়া থাকিতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতেছে, বক্তৃতাতে সভাগৃহ কম্পিত হইতেছে, কিন্তু ডিজ্‌রেলীর মুখের কোনও পরিবর্ত্তন নাই। যেন তাঁহার একটী লোমও স্পন্দিত হইতেছে না।

সভা আরম্ভ হইবার পর (question time) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময় উপস্থিত হয়। যে মন্ত্রী যে বিভাগের উপর

মন্ত্রিত্ব করিতেছেন তাঁহাকে তাঁহার বিভাগ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সকল সভ্যের অধিকার আছে। এই প্রশ্নগুলি প্রতিদিন সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মুদ্রিত হয় এবং মুদ্রিত হইয়া (notice) নোটীশ পেপারে সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হয়। প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সকল বিষয়েই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে। কেহ বা বৈদেশিক রাজনৈতিক বিষয়ে প্রশ্ন করেন, কেহ বা ভারতবর্ষের করভার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া থাকেন। কোন্ স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, কোন্ স্থানে পুলীশ কর্ম্মচারী তাঁহার কর্ত্তব্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, এমনকি কোন রাস্তার ধারে বৃক্ষ সকল যত্নাভাবে শুকাইয়া যাইতেছে এমন প্রশ্নও জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে। কখন কখন এই অধিকারের অপব্যবহারও হইয়া থাকে। সভ্যগণ ফৌজদারী আদালতের সাক্ষীর মত মন্ত্রীগণকে জেরায় ক্ষত বিক্ষত করেন। গ্লাডষ্টোনের মত শ্রদ্ধাভাজন এবং মহামান্য ব্যক্তিগণও সভ্যদিগের জেরার হাত হইতে নিষ্কৃতি পান না। আইরিষ মেম্বরগণ চিরকালই গবর্ণমেণ্টের বিরোধী দল ভুক্ত। তাঁহারাও সময়ে সময়ে মন্ত্রীগণকে জেরা করিতে ছাড়েন না। তবে বৈদেশিক রাজনীতি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে মন্ত্রীগণ অস্বীকার করিলেও করিতে পারেন; কারণ তাঁহাদের একটী সামান্য কথায় মহা অনর্থ ঘটিতে পারে। বাস্তবিক যে দেশের প্রতিনিধিগণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ক্ষমতা নাই সে দেশের গবর্ণমেণ্টকে প্রকৃত রূপে নিয়মতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট বলা যায় না। সভ্যদিগের এই ক্ষমতা থাকাতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের পরম উপকার সাধিত হইতেছে। এই রূপে দুই এক ঘণ্টা অতীত হইলে পর সভ্যগণের বক্তৃতাদি আরম্ভ হইয়া থাকে। যাঁহারা ইংরেজ চরিত্র জানেন তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে এই মহাসভার কার্য্য অত্যন্ত ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য সহকারে সম্পাদিত হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে বক্তা এখানে ভাল বক্তৃতা করিতে না পারেন তাঁহাকে অত্যন্ত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। বক্তা বক্তৃতা করিতে উঠিলেন, সভ্যগণের তাহা ভাল লাগিতেছে না, অথবা সভ্যগণ মনে করিতেছেন, সে রূপ বক্তৃতার প্রয়োজন নাই, তখন যাহাতে বক্তা মহাশয় বক্তৃতা ছাড়িয়া আপন আসন গ্রহণ করেন, সভ্যগণ সেই চেষ্টা করিতে থাকেন। এখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অসদ্ভাব নাই। বক্তাকে বসাইয়া দিবার জন্য কখন কখন সভ্যগণ কাশিতে আরম্ভ করেন, কেহ কেহ বা কুকুর বিড়াল প্রভৃতি জন্তুগণের ডাক ডাকিতে থাকেন। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

সভার কার্য্য এইরূপে চলিতে থাকে। ৭॥ সাড়ে সাতটার সময় সভ্যগণ প্রায়ই বায়ু সেবনার্থ বাহির হইয়া যান, কেহ বা পুস্তকালয়ে গিয়া পুস্তক এবং মাসিক পত্রিকাদি পাঠ করিতে করিতে নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যান। পার্লিয়ামেণ্টে অনেক গুলি আহারের ঘর আছে, সেখানে খাদ্যের বন্দোবস্ত থাকে। আহারের সময় অনেক মহিলাও নিমন্ত্রিত হন। এদিকে কিন্তু সভাগৃহে কার্য্য বন্ধ

হয় নাই। মন্ত্রীগণ এবং তাঁহাদিগের পক্ষীয় অনুরক্ত সভ্যগণ কাজেই কর্ম্মানুরোধে বসিয়া থাকেন। সভার কাজ করিতে হইলে অন্ততঃ চল্লিশ জন সভ্যের প্রয়োজন, চল্লিশ জনের কমে কাজ হয় না। প্রায়ই রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত কার্য্য চলিতে থাকে। শনিবার দিন আরও অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কার্য্য হইয়া থাকে। গ্লাড্‌ষ্টোন্‌ যখন আয়র্‌লণ্ডে হোম রুল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন, তখন এক এক দিন রাত্রি শেষ হইয়া যাইত। কোনও এক শনিবারে কার্য্য আরম্ভ হইয়া ক্রমাগত ৪১ ঘণ্টা কাজ চলিয়াছিল। যদি কখনও সভায় মত ভেদ (Division.) হইবার উপক্রম হয়, তখন উভয় পক্ষই যে যেখানে থাকেন সত্বর আসিয়া গৃহ পরিপূর্ণ করেন। প্রত্যেক দলের এক এক জন কর্ম্মচারী থাকেন' তাঁহাকে হুইপ (Whip.) বলে। এই হুইপগণ যাহাতে আপন আপন দলের সভ্যগণ সভায় উপস্থিত থাকিয়া যথা সময়ে ভোট্‌ দেন, তদ্বিষয়ে নেতাগণকে সাহায্য করিয়া থাকেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যখন মহামান্য গ্লাড্‌ষ্টোন্‌ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন,তখন লর্ড রিচার্ড গ্রসভেনার সিনিয়ার হুইপের কার্য্য করিতেন। হুইপের কার্য্য অত্যন্ত শ্রম সাপেক্ষ। তাঁহাকে সভা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে হয়। লর্ড্‌ রিচার্ড ইংলণ্ডের একজন প্রভূত ধনশালী ব্যক্তি হইলেও তিনি অম্লান বদনে এই শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে কষ্ট বোধ করেন নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, ইংলণ্ডের সকল শ্রেণীর লোকই স্বদেশীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে কত ঘনিষ্ঠরূপে অনুরক্ত। ইহাতে তাঁহার কোনও সংসারিক লাভ না থাকিলেও তিনি আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা ত্যাগ করিয়া এই কার্য্যে দিবানিশি পরিশ্রম করিতেন।

আমার মকদ্দমা।

(৮৮পৃষ্ঠার পর)

নালিশ রুজু করিতে ২৬৲ টাকা খরচ হইল। দাদা বলিলেন এইটী খাঁটি খরচ; এই নালিশ অন্য লোকে করিলে, ৩২টাকার এক পয়সা কমে হইত না। তবে আমি দাদার আত্মীয়, তাঁর সঙ্গে আমলা মুহুরি সবারই ভাব, সকলেরই ভালবাসা, তাই অধিক বাজে খরচ আমার লাগিল না।

২৬৲ টাকা আমার পক্ষে বড় সুলভ নহে। ছয় মাস পরিশ্রম করিয়াও তাহা রোজগার করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। মোকদ্দমার প্রারম্ভেই একদমে এত টাকা খরচ দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল; মাও কাতর হইয়া পড়িলেন। কাজেই পিতার শ্রাদ্ধে অধিক ব্যয় করিতে সাহস হইল না। মহাজনীর টাকায় শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিব ভাবিয়া যে সুখ স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, সে আনন্দ কোথায় ভাসিয়া গেল; মোকদ্দমার দায়ে মাতার সাধ, আত্মীয় স্বজনের অভিলাস, নিজের বাসনা পূর্ণ করিতে পারিলাম না।

তার পর দাদা হাণ্ডনোটের টাকা চাহিলেন। তবে সে জন্য আমাকে চিন্তা করিতে হইলনা। তিনি নিজেই আপন সম্বন্ধী তারাদাসের নিকট টাকা ঠিক করিয়া আসিলেন। কথা থাকিল ১০০৲ টাকার তমসুক লিখিয়া রেজিষ্ট্রী করিয়া দিতে হইবে; সুদ লাগিবে না। ঐ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা দাদার পাওনায় শোধ গিয়া বাকী টাকা তাঁহার নিকটেই থাকিবে; মোকদ্দমায় যখন যাহা দরকার, সেই টাকা হইতেই খরচ হইবে। তমসুক লেখা হইল। মুহুরি কি কারণে জানি না ভুল করিয়া বন্ধক নামা তমসুক লিখিয়া ফেলিল। দাদা বলিলেন "আচ্ছা, তবে না হয় বন্ধক নামাই হ'ক, আমরা যখন ২৫০।৩০০৲ টাকার ডিক্রী পাব, তখন তারাদাসের কটা টাকা ফেলে দিলেই হ'বে।" দাদা আত্মীয়তা করিয়া এই কথা বলায় আমি তাহার অন্যথা করিতে পারিলাম না। কাজেই বাস্তু জমিনাদির বন্ধক নামাই লিখিত হইল।

তারাদাস আর আসিলেন না; তাঁহার দেখা পাওয়া গেলনা। দাদাই, 'বরের মাসী, কনের পিসী', হইয়া কার্য্য সমাধা করিলেন। মুহুরি তারাদাসের ইচ্ছা বলিয়া তমসুকে টাকা প্রতি মাসিক ৵১৫ তিন পয়সা সুদ বসাইবার কথা বলায় আমি তমসুক দিতে অসম্মত হইলাম। দাদা বুঝাইলেন যে তাহাতে ক্ষতি নাই; যাহাই লেখা থাকুক না মুখের কথা যা থাক্‌ল, তার ত আর অন্য রূপ হইবার কথা নয়; তারাদাস লোক ভাল, সে এক কথার মানুষ। দাদাই আমার যুক্তি দাতা, তাঁর কথাই বেদ বাক্য; সুতরাং আর দ্বিরুক্তি করিলাম না; তমসুক রেজিষ্ট্রী হইয়া গেল।

দিনের পর দিন চলিয়া গেল। যথা সময়ে আদালত হইতে সমন লইয়া পেয়াদা বাবু পঁহুছিলেন। পেয়াদা বাবুর মেজাজ গরম, মুখ তুলিয়া ভাল করিয়া আমার সহিত কথা কহিলেন না। আমি তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়া আনিলাম, নল করিয়া বাবুর হাতে কল্‌কে দিলাম; বাবুর দয়া হইল না, মুখ বাঁকাইয়া 'চাষাড়ে তামাক' বলিয়া কল্‌কে ফেলিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে দাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাদা হাসিতে হাসিতে বাবুজির সহিত জম জমাট গল্প আরম্ভ করিলেন;— পিয়াদা বাবুর মুখেও হাসি দেখা দিল; আমার হৃদয় হইতে যেন একটা গুরু ভার নামিয়া গেল।

দাদা উচ্চৈঃস্বরে আমাকে বলিলেন, " জান্‌লে ভায়া, হাকিমের চেয়ে হাকিমের হুকুম, সেই হুকুম জারির কর্ত্তা চাপরাসি বাবুরা, এঁদের তুষ্ট না করলে কোন কাজই হবে না। মোকদ্দমা ডিক্রী ডিশমিস্ ধর্‌তে গেলে এঁদেরই হাতে"। পেয়াদার মুখ প্রফুল্ল হইল; কিরূপে কতবার এক পক্ষের নিকট পুরস্কার লইয়া অপর পক্ষের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, খর স্রোতে সেই গল্প চলিতে লাগিল।

কাজেই হাকিম অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী এই হুকুম জারির কর্ত্তার সন্তোষ সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম। বাড়ীতে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পেয়াদা বাবু মোটা চালের ভাত খাইতে পারেন না;দুধ না হইলে তাঁহার চলে না; ভাল জল খাবার, বড় মাছ, যেরূপে হউক সংগ্রহ করিতেই হইবে। এই সকল উপ-

করণ না হইলে ষোড়ষোপচারে পুজা হইবে না অগত্যা পুকুরের পূর্ব্ব সঞ্চিত পুরাতন রুই মাছটী ধরা হইল। খোকার অনুরূপ আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দুধ টুকু বাবুকেই দেওয়া গেল; দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী বাজার হইতে মিঠাই আর সরু চালের আমদানি করা হইল।

বাবুজি আহার করিয়া আমাকে চরিতার্থ করিলেন; এবং গভীর নিদ্রায় ক্লান্তি দুর করিলেন। তার পর আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে এতদুর হাঁটিয়া আসিয়াছেন, সেই পরিশ্রমের জন্য দুইটী টাকা বুঝিয়া লইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে সমন জারির জন্য বহির্গত হইলেন।

আমরা সনাতনের বাড়ীতে পঁহুছিলাম। সোনার বৌ একটী কলসী লইয়া জল আনিতে যাইতেছিল; আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল। পেয়াদা বাহিরে বসিয়া মহা তম্বি আরম্ভ করিল,—সোনার বৌ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

ক্রমে ২।১ জন লোক আসিল, কিন্তু সোনার বৌয়ের পক্ষে কেহ হইল না; সকলেই দাদার কথা ও পেয়াদার কথাতেই সায় দিতে লাগিল। সোনার বৌ একে পাড়াগেঁয়ে স্ত্রীলোক,তাহাতে আপনার লোক নিকটে নাই;— সে যে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। পেয়াদা বলিল "যে রূপে হ'ক হাজিরা শমন জারি কর চাইই চাই, বাহিরে আসিয়া শমন নোটিশ না নিলে আমি সহজে ছাড়িব না; রিপোর্ট ক'রে সর্ব্বনাশ করে দিব"। অমনি চারি দিক হইতে "তা আর বল্‌তে আছে" ধ্বনিতে গগন পূর্ণ হইল, পেয়াদার জয় জয় কার চলিতে লাগিল।

পেয়াদার সেবায় খরচ করিবার সময় মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু সোনার বৌয়ের লাঞ্ছনা দেখিয়া আমার মনে হইল আজই মকদ্দমা ফতে করিয়া লইলাম। সকলেই রামদাসের বুদ্ধির নিন্দা করিতে লাগিল;—সিদ্ধান্ত হইল সনাতনের পুত্রগুলির আর রক্ষা নাই।

এই সকল কাণ্ড চলিতেছে এমন সময়ে রামদাস আসিয়া উপস্থিত হইল। এত লোক জন দেখিয়া রামদাস রাগে গর্ গর্ করিতে লাগিল; পরদা নশিন স্ত্রীলোকের উপর এই সকল জুলুম করিয়াছে বলিয়া পেয়াদার নামে ফৌজদারি করিবার ধমক দিল। পেয়াদা কিন্তু তাহা গ্রাহ্যও করিল না; বলিল "ঢের ঢের রামদাস দেখিছি; শর্ম্মা কারুকে ভয় করে না। আমাদের আর আইন কানুন কি? এই চাপরাশের জোরে আমরা দিনকে রাত করি, রাতকে দিন করি"। রাম দাস তার পরেও দু একবার আস্ফালন করিল,কিন্তু পেয়াদার অটল,গম্ভীর, সতেজ ভাব দেখে আর বাড়াবাড়ি করিতে সাহস করিল না; নরম হইয়া পেয়াদা বাবুর তোষামোদ আরম্ভ করিল।

পেয়াদা কথায় ভুলিবার লোক ছিল না। রামদাসের নরম ভাব দেখিয়া রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল, এবং সরকারি কার্য্যের বাধা দিয়াছে বলিয়া রামদাসের নামে আফিডেবিট করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। রামদাসও বড় সহজ লোক নয়; কিন্তু পেয়াদার নিকট

জারি জুরি চালাইতে পারিল না; ধীরে ধীরে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অবিলম্বে ফিরিয়া আসিল, এবং রামদাসের হস্ত পেয়াদার হস্তে মিশিয়া বিদ্যুৎ বেগে কি এক পরিবর্ত্তন সাধিত করিল যে পেয়াদা ঠাণ্ডা হইয়া রাম দাসের হস্তে শমন নোটিশ দিয়া জারির রসিদ করিয়া লইল। তার পর আমরা পেয়াদাকে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলাম।

বাড়ী আসিয়া দেখি মাতা ও পত্নীর মুখে হাসির আলোক ফুটিয়াছে। প্রতিবেশীগণের সহিত সোনার বৌ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা চলিতেছে। দাদাকে দেখিয়া মা বলিলেন "কাকা তুমি ছিলে ব'লে আমার মুখ উজ্জ্বল কর্‌লে; মাগির যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল ফল্‌ল"।

সমন জারির পর কয়েক বার মকদ্দমা রফা হইবার কথা হইল, কিন্তু মীমাংসা হইল না, তর্কে বিতর্কে বিবাদ প্রবল হইতে প্রবলতর হইল, খর বেগে স্রোত বহিতে লাগিল।

বিচারের দিন রামদাস ভগ্নীর পক্ষে উকিল নিযুক্ত করিয়া জবাব দিল যে তমস্থক জাল, বিশ্বম্ভরের সহিত রামদাসের এক মকদ্দমা হইয়াছিল, সেই মোকদ্দমা আমার পিতা খরচ দিয়া চালাইয়াছিলেন। তাহাতে বিশ্বম্ভর পরাজিত হইয়া আক্রোশসাধনের অভিপ্রায়ে পিতা মহাশয়ের নামে কৃত্রিম তমস্থক সৃজন করিয়া রাখিয়াছিলেন; সনাতনের মৃত্যুর পর বিশ্বম্ভর নিজে খরচ দিয়া এই নালিশ করাইয়াছে।

জবাব শুনিয়া আমি ত ভয়ে শুকাইয়া গেলাম, দাদাও যেন কতকটা জড়সড় হইয়া পড়িলেন। সে দিন মকদ্দমা চালাইতে না পারিয়া সময় লওয়া হইল, বিচারের নিমিত্ত অন্য দিন ধার্য্য হইল।

আমরা বাড়ী পঁহুছিবার পূর্ব্বেই রামদাস গ্রামে আসিয়া নানা কথা রটনা করিয়া দিল। প্রকাশ্য ভাবে বলিতে লাগিল যে তমস্থকের টাকা ত ফাঁকি দিবেই, অধিকন্তু তমস্থকের সাক্ষীদিগকে আর আমাকে আর দাদাকে ১৪টা বৎসর মেয়াদ খাটিয়ে ক্ষান্ত হবে। চারিদিকে এই কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল অনেকে আমাদের এই আকস্মিক বিপদে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মাতার ভয়ের সীমা নাই, আমি বাড়ী পৌঁছিলে আমাকে দেখিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; পত্নী নিকটে আসিয়া বিরস মুখে গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। আমি ত কি বলিব স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে লাগিলাম; বিষাদের নিবিড় ছায়া যেন সকলের হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, সে রাত্রি কাহারও নিদ্রা আসিল না।

পর দিন অপরাহ্নে দাদা আসিলেন। তাঁহার আর সঙ্কুচিত ভাব নাই; তিনি পূর্ব্ববৎ প্রফুল্ল; তাঁহাকে দেখিয়া আমাদেরও যেন একটু সাহস হইল। মাতার কাতরতা দেখিয়া দাদা বলিলেন তোমাদের ভয়ের কারণ নাই, কে ফৌজদারী সোপর্দ্দ হয় তা দেখ্‌তে পাবে; যা যা করতে হ'বে আমি তা সব ঠিক করেছি।

তারপর কিরূপে কত লোক তাঁহার যুক্তিতে সফলকাম হয়েছে, কত লোকে তাঁহার সহায়তায় বহুমূল্য সম্পত্তি লাভ

করেছে ইত্যাদি নানা বিষয়ের গল্প করিয়া তিনি আমাদের বিষণ্ণভাব উড়াইয়া দিলেন। আবার পূর্ব্ব চিত্র ফুটিয়া উঠিল, আনন্দে হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল।

কর্ম্ম-বন্ধন।

কণ্টকে আবৃত পথ, বন্ধুর বিষম,
কঠিন পাষাণময় বিস্তৃত প্রান্তর!
কোন্ দিগন্তের পানে টানে নিরন্তর
নিয়তি রাক্ষসী মোরে, নিঠুর নির্ম্মম,
কর্ম্মরজ্জু আকর্ষণে! ভীম পরাক্রম
মায়াবিনী সে নিদয়া; দারা বিশ্ব তার
ইঙ্গিতের বশীভূত! মিনতি আমার
অরণ্যে রোদন সম, নিষ্ফল, অক্ষম!
শ্রান্ত অতি, তৃষাকুল, আহত চরণ,
অবসাদে ম্রিয়মাণ জীবনের সাধ;
নয়নে আঁধার হেরি, শূন্য দশ দিক্,
কাতরে, সঘনে, যাচি মুকতি,—মরণ!
টুটেনা তবুও মোহ, করমের বাঁধ,
ঘোচেনা যাতনা এই দহন অধিক!

বঙ্গের সুরাসমস্যা।

প্রতিবাদ।

মহাশয়, গতমাসের কান্তিতে "বঙ্গের সুরা সমস্যা" শীর্ষক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহাতে সুরাপান সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। প্রবন্ধ লেখকের মতে সুরাপান বৈদিক আর্য্যদিগের অনুমোদিত;কিন্তু কালক্রমে তাঁহাদের বংশধরেরা সুরাপানের অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিয়া স্মৃতিতে তাহা নিবারণ করিয়া গিয়াছেন। প্রবন্ধ লেখকের এই শাস্ত্র ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে,সুরাপানের ঔচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে বেদ ও স্মৃতির মতবিরোধ আছে। বেদের মত সুরাপানের অনুকূলও স্মৃতির মত সুরাপানের প্রতিকূল; কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের মতে যেখানে বেদ ও স্মৃতিতে মত ভেদ দৃষ্ট হইবে সেখানে বেদের মতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে।

"শ্রুতি স্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী" সুতরাং প্রবন্ধ লেখক যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া সুরাপান অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন সেই যুক্তিই সুরাপানের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিতেছে।

সম্ভবত বৈদিক আর্য্যগণ সোমরস ব্যবহার করিতেন একথা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সোমরসের মাদকতা গুণ ছিল কিনা তাহার নিশ্চিত প্রমাণ কি আছে? বেদের কোথাও সোমরসের মাদকতা সম্বন্ধে কিছু উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। সুতরাং বৈদিক আর্য্যগণ সোমরসপায়ী হইলেও তাঁহারা প্রবন্ধ লেখক কথিত "মত্ততাপ্রকাশ" করিতেন

কিনা তাহা কিরূপে প্রমাণিত হইবে আমরা বুঝিতে পারি না ।

স্মৃতিতে সুরাপান মহাপাতক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে তাহাও সত্য । কিন্তু প্রবন্ধলেখক সুরা ও মদ্য এই দুইটী শব্দকে একার্থবোধক মনে করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । প্রচলিত বঙ্গভাষায় অবশ্য সুরাওমদ্য এই দুই শব্দ একার্থবোধক হইতে পারে। কিন্তু স্মৃতিতে সুরা ও মদ্য দুইটী শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। স্মৃতির মতে "গৌড়ী পৌষ্টী তথা মাধ্বী বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা" অর্থাৎ গুড়, পিষ্ট বা অন্ন ও মধু বিকৃত হইয়া যে মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহাই সুরা। অন্যান্য মাদক-দ্রব্য মদ্য হইলেও সুরা নহে ; এবং স্মৃতিতে এই বিশিষ্টার্থবোধক সুরার পানই মহাপাতক বলিয়া গণ্য ।

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সোমরসের মাদকতা সম্বন্ধে আমরা কোন প্রমাণ পাই নাই। যদি তর্কচ্ছলে সোমরসের মাদকতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সুরা পান সম্বন্ধে স্মৃতির মত, সোমরস সম্বন্ধে বেদের মতের বিরুদ্ধ হইতেছে না। কারণ উপরি উক্ত সংজ্ঞানুসারে সোমরস কিছুতেই সুরা হইতে পারে না।

সুতরাং প্রবন্ধলেখক কথিত সোমপায়ী আর্য্যদিগের "মত্ততা প্রকাশের" অনিষ্ট কারিতা জ্ঞান স্মৃতিকার দিগের"সুরা" পান নিষেধের কারণ হওয়া সম্ভব নহে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে স্মৃতিকার সোমরসকেও "সুরা" বলিয়া অভিহিত করিতে পারিতেন।

হিন্দু শাস্ত্রকার দিগের মতে মদ্যপান শূদ্র ভিন্ন অপর জাতিদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ, যথা,

"নরাশ্বমেধৌ মদ্যঞ্চ কলৌ
বর্জ্যং দ্বিজাতিভিঃ।"

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিষিদ্ধ না হইলেও শূদ্রদিগেরও মদ্য ব্যবহারের কোনও বিধি কোনও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। "মদ্যমদেয়ং অপেয়ং অগ্রাহ্যং ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ। এ বিষয়ে স্মৃতির মত বেদ বিরুদ্ধ নয়। অনবধানতা-বশতই হউক বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, প্রবন্ধ লেখক বিশেষ প্রমাণ না দেখা-ইয়া বৈদিক আর্য্যগণের প্রতি "মত্ততা প্রকাশ" আরোপ করিয়া তাঁহাদের উন্নত চরিত্রে যে কলঙ্কার্পণ করিয়াছেন, আশা করি তিনি তজ্জন্য অনুতাপ করিবেন।

এই শাস্ত্রীয় ভ্রম ব্যতীত "বঙ্গের সুরা সমস্যা" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের মনে আর দুইটি প্রশ্নের উদয় হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখ-ক অব্‌কারী আয়ের বৃদ্ধি দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বিংশতি বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। কিন্তু এই বিংশতি বৎসরের মধ্যে আব্‌কারী করের হার আদৌ বৃদ্ধি হইয়াছে কিনা তৎ-সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন নাই, আশা করি তিনি এবিষয়ে আমাদের সংশয় অপনোদন করিতে পারিবেন।

প্রবন্ধ লেখক দেশ মধ্যে মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের প্রসার হ্রাস করিবার যে দুইটি উপায় অবলম্বন করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা কতদূর কার্য্যকর হইবে, তদ্বিষয়েও আমাদের সন্দেহ আছে। যাঁহারা ইংলণ্ডের

ইতিহাস মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা আবকারী প্রসার হ্রাস সম্বন্ধে ইংরাজ জন সাধরেণের সহানুভূতি পাইবার আশা করিতে পারেন না। প্রবন্ধ লেখক আবকারী শাসন প্রণালী কিরূপ সংশোধন করিত চান তাহার কোনও আভাস দেন নাই; সুতরাং সে রূপ সংশোধন সম্ভব কিনা তদ্বিষয়ে আমরা কোনও মত প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আশা করি প্রবন্ধ লেখক মহাশয় এ বিষয়ে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

উপসংহারে প্রবন্ধ লেখক মহাশয় "সুরা-সমস্যার" ভেদ করিবার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু। ভগবান্ তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে সহায় হউন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

কবি রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৯০ পৃষ্ঠার পর)

ঐ গানের স্বর যেমন মধুর রচনাও তেমনি সুন্দর। ওস্তাদগণ সকলেই একবাক্যে কালোয়াতের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পঞ্চকোট রাজেরও আনন্দের সীমা রহিল না। কালোয়াত প্রফুল্ল নয়নে স্মিত-মুখে রাজার দিকে চাহিয়া বলিলেন " ইয়ে সুর অব্‌ বি তক বাঙ্গলেমে আয়া নেহি "। এই বলিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার আকার প্রকারে অহঙ্কারের চিহ্ন প্রকাশিত হইতে লাগিল।

রমাপতি এক পার্শ্বে ধীর ভাবে বসিয়া ছিলেন। তিনি কোন বিষয়ে মনোযোগ না করিয়া অবিলম্বে ঐ সুরের একটী হিন্দি ও একটী বাঙ্গালা গান রচনা করিলেন। পঞ্চহাজারীর কথা শেষ হইলে রমাপতি তানপুরা লইয়া সেই দুইটী গান গাইতে উদ্যত: হইলে কেহ কেহ তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিল। কিন্তু রমাপতি তৎপ্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিলেন। পঞ্চহাজারীর গর্ব্বিত ভাব অল্পক্ষণ পরেই বিলুপ্ত হইল। তিনি মোহিত হইয়া সেই সুরের হিন্দী ও বাঙ্গলা গান শুনিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার আশ্চর্য্য শিক্ষার জন্য প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পঞ্চহাজারী এই সুরে ভারতের নানা দেশ পরাজয় করিয়া ছিলেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল বাঙ্গালায় ইহার আদৌ প্রচলন হয় নাই; কিন্তু এই সুরের গান পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় চলিত হইয়াছে, এবং বাঙ্গালী ওস্তাদ বিশুদ্ধ ভাবে তাহা গাইতেছে দেখিয়া তাঁহার আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। তিনি এই মাত্র যে অহঙ্কার করিতে ছিলেন তাহা চূর্ণ হইয়া গেল দেখিয়া নিতান্ত অপ্রতিভ হইলেন এবং রমাপতির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সভাস্থ সকলের মুখ প্রফুল্ল হইল, স্বয়ং পঞ্চকোটরাজ রমাপতিকে 'মহামূল্যরত্ন, বলিয়া সমাদর করিতে লাগিলেন; কিন্তু রমাপতির আকারে কিছুমাত্র অহঙ্কারের ভাব

প্রকটিত হইল না। তিনি বিনয় নম্র বচনে পঞ্চহাজারীকে বলিলেন" মহাশয়, আপনিই আমার ওস্তাদ, আপনার কথাই প্রকৃত এ রাগ বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই। আমি ইতি পুর্ব্বে ইহা কাহারও নিকট শিক্ষা করি নাই। আপনার গান শুনিয়াই আমি এই গান দুইটী রচনা করিয়াছি। আপনিই গুরু, আপনাকে প্রণাম"

কালোয়াৎ রমাপতির ভদ্রতা ও নম্রতা দর্শনে পুলকিত হইলেন। সভাস্থ সকলে রমাপতির প্রতি পুর্ব্বাপেক্ষা প্রীত হইয়া হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

রমাপতির পত্নীর নাম করুণাময়ী দেবী। তাঁহার পিতা শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। পিতার যত্নেই করুণাময়ী সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এই গুণবতী রমণীকে পত্নী স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া রমাপতির জীবন' 'সোণায় সোহাগা' 'উজ্জ্বলে মধুর' হইয়াছিল। করুণাময়ী প্রকৃতই করুণার আধার, স্নেহ মমতার মুর্ত্তি স্বরূপা ছিলেন। স্বামীর ন্যায় তাঁহার হৃদয় কবিত্বপূর্ণ ছিল, এবং তাঁহার যোগে রমাপতির কবি জীবনের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। রমণী পতির কঠোর জীবনে ললিত সৌন্দর্য্য বিকাশিত করে। আবার সেই রমণী যদি প্রকৃতই অর্দ্ধাঙ্গিনী হয়, উভয়ের হৃদয় যদি একই ভাবে একই স্রোতে ভাসিয়া যায়, তবে কষ্টময় জগৎ নন্দন কানন হইয়া উঠে। পারিজাত ফুটিয়া চারিদিক সৌরভে পূর্ণ করে। রমাপতির ভাগ্যে সেই সুখ বিবাহিত জীবনের সেই পুর্ণতা লাভ ঘটিয়াছিল।

করুণাময়ী সঙ্গীত রচনায় নিপুণা ছিলেন, শুনা যায় প্রেমিক দম্পতি একত্রে একই সুরে সঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে মনোরম গীত প্রণয়ণ করিতেন। এই রূপে বহুসংখ্যক গীত যুগল রচিত হইয়া এখনও করুণা--রমাপতির পবিত্র দাম্পত্য প্রেম জগতে প্রচার করিতেছে। নিম্নে দুইটী উদাহরণ দেওয়া হইল। নিশীথ রজনীতে বেহাগ রাগিণী তাল আড়ায় শবকে লক্ষ্য করিয়া রমাপতি গাহিলেন

কোথায় কর গমন, ওহে মৌন ব্রত জন।
বল দেখ নাহি দেহ, সাধিলে উত্তর কেন ॥
হেন হয় অনুভূত; তব বশীভূত ভুত।
করি তোমায় অভিভূত হরিল শ্রীধন ॥ ১
কোথায় তুরঙ্গ পদ, তব গমন আস্পদ
করী কর বিহনেতে স্বজন বাহন--
কারে দিলে রাজ কর্ম্ম কে লইল অসি চর্ম্ম,
অমাত্যাদি তেয়াগিয়ে কেন হে নির্জ্জন ॥ ২
ছিলে যবে সিংহাসনে, গণ্য ছিলে সিংহসনে
এখন অগত্যা সার, হ'ল তৃণাসন।
যাত্রাতে মঙ্গলাচার, ছিল পুর্ণ ঘট যার
এশূন্য ঘটেতে তার ঘটে কি তেমন ॥ ৩
চলিয়াছ মাভৈ রবে, ত্যজি অতুল বৈভবে,
করেছ যার কৈতবে, বহু পর্য্যটন।
কহে রমাপতি দীন, এনিধন তাঁর অধীন
আছে যাঁর ইচ্ছাধীন সৃজন পালন ॥ ৪

সেই সুরে সেই সময়ে নবজাত শিশুর উদ্দেশে করুণার হৃদয়ে অনুরূপ গীতের বিকাশ হইল। তিনি রচনা করিলেন।

কোথা হতে এলে তুমি, কেবা কোথাকার হে
বল কোন খানে হবে, গমন তোমার হে ॥
কাহারো কর্ম্মসাধনে, কিম্বা স্বীয় প্রয়োজনে।
এলে এ নব ভুবনে, হোয়ে স্বেচ্ছাচার হে ॥ ১
কেন বা এ কর্ম্মক্ষেত্রে, তুমি পদার্পণ মাত্রে

রোদন সলিল নেত্রে; করিলে সঞ্চার হে।
হেন অনুমানি মনে, ছিলে যার অবলম্বনে
অকস্মাৎ সেই ধনে হেরে শূন্যাকার হে॥ ২
হও কোন ধর্ম্মাসীন, সংসারী কি উদাসীন,
কহ হে মমতাধীন, সন্ধি আপনার হে।
তোমার কে আছে বিভু, কিম্বা তুমি কারো প্রভু
হেরিয়াছ এভু কভু, অথবা সংসার হে॥ ৩
কি জাতি, কি ধর নাম, কোথা পরিণাম ধাম,
কি ভাবিছ অবিশ্রাম, কহ তথ্য তার হে।
লহ করুণার মর্ম্ম, না করহ হেন কর্ম্ম
যাতে ইহ পরধর্ম্ম যায় আপনার হে॥ ৪

শ্রীরাধা বেশ ভূষার বিভূষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, রজনী প্রভাতোন্মুখ; শ্যাম সমাগমের আশা রাধিকার হৃদয়ে ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। রমাপতি রাধিকার মুখে সেই অবস্থা বর্ণনা করিয়া বেহাগ একতালায় গাহিয়াছেন—

সখি, শ্যাম না এল,
অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী,
বুঝি বিভাবরী অমনি পোহাল।
শর্ব্বরী ভূষণ খদ্যোতিকা তারা,
ঐ দেখ সখি আভা হীন তারা,
নীলকান্তমণি হলো জ্যোতি হারা'
তাম্বুলের রাগ অধরে মিশাল।
ঐ দেখ সখি শশাঙ্ক কিরণ,
উষার প্রভায় হলো সঙ্কীরণ,
সঘনে বহিছে প্রাতঃ সমীরণ,
কুসুমের হার শুকাল--
শিখি সুখে রব করিছে শাখায়,
পুলকিত হেরি অভ্র সখায়,
পতির বিচ্ছেদে উন্মাদিনী প্রায়,
কুমুদিনী হাস্ত বদন লুকাল।
বিহঙ্গম গণ করে উদ্বোধন;
বন্ধু দরশনে চিত্ত বিনোদন,
আমার কপালে বিরহ বেদন,
বুঝি বিধি ঘটাল।
তাপিত হৃদয় রমাপতি কয়,
এ বিরহ রাই তোমাবলে নয়,
দেখ বৃক্ষচয় হল অশ্রুময়,
শর্ব্বরীর সুখ বিলাস ফুরাল,

কোমল হৃদয়া করুণাময়ী বিরহ বিধুরা শ্রীরাধার এই বিসদৃশ অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন শ্যামের শুভাগমন সম্বাদে রাধিকাকে উল্লসিত করিবার অভিপ্রায়ে সেই সুরে বর্ণনা করিয়াছেন।

সখি শ্যাম আইল,
নিকুঞ্জ পূরিল মধুপ ঝঙ্কারে,
কোকিলের স্বরে গগণ ছাইল।
সুলক্ষণ চিহ্ন নাচিছে বামাঙ্গ,
স্পন্দন করিছে আনন্দে অপাঙ্গ,
পুলকিত রবে ডাকিছে বিহঙ্গ,
কুরঙ্গ কুরঙ্গী আনন্দে মাতিল।
মলয় অনিল প্রলয় রহিত
বিরহ বিলয় প্রলয় সহিত
সহসা অহিত হইতে রহিত
তারে কে শিখাল!
এই হ'তে ছিল চাতকের ধ্বনি
জল দে জল দে বলিয়া অমনি
আজি বুঝি তার দুঃখের রজনী
সজনি পোহাল।
ফলিল তাহার আশা তরুবর
হেরিয়ে নবীন নীল জলধর
আশাংশু চকোর শুধাংশু কিঙ্কর

বিবিক্ত কালে বিধুরে পাইল
ব্যথিতাকরুণা সকরুণে কয়
নিশান্তরে রাই প্রভাত নিশ্চয়
তাই দুঃখান্তে সুখের উদয়
বিয়োগ নিশির ভোগ ফুরাল ॥

কেহ কেহ এই গানটীও রমাপতির রচনা বলিয়া থাকেন। 'ব্যথিতাকরুণা, সকরুণে কয়' এর পরিবর্ত্তে 'প্রণয় ভাজন রমাপতি কয়' এইরূপ রচনা কোন কোন পুস্তকে দেখা যায়; কিন্তু আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে রমাপতির সমকালীন ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ গান করুণাময়ীর রচিত বলিয়াই অবগত হইয়াছি। ক্রমশঃ

সংবাদ।

মেদিনীপুর জেলার সকল স্থানের সংবাদাদি কান্তিতে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়; তজ্জন্য কান্তির গ্রাহক এবং অনুগ্রাহক-বর্গের নিকট প্রার্থনা যেন কোন ঘটনা তাঁহাদের গোচর হইলে তাহা আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করেন। যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের নিয়মিত সংবাদদাতা হইবেন তাঁহারা বিনা মূল্যে কান্তি পাইবেন।

কাঁথি মুন্সেফী আদলতে প্রতি মাসের ১৫ই তারিখে যে সকল নীলামের দিন হইবে তাহা আদালত হইতে লইয়া কান্তিতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত জেলার মহিমাবর শ্রীযুক্ত জজ সাহেব বাহাদুর আমাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন। ইহাতে সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে। আমরা এই অনুগ্রহের নিমিত্ত সাহেব মহোদয়কে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

নীলাম সম্বন্ধে যাহাতে কোনরূপ ভুল না হয় আমরা তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিব। যদি কোন ভ্রম লক্ষিত হয় তাহা আমাদিগকে জানাইলে আমরা ভবিষ্যতে যাহাতে ঐরূপ না হয় তাহার চেষ্টা করিব।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত উইলিয়ম সাহেব অসুস্থতা বশতঃ ছয় মাসের অবসর গ্রহণ করায় আমাদের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্রাইট সাহেব ছয় মাসের জন্য উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি যেরূপ কার্য্যকুশল, তাহাতে এই গুরুতর কার্য্য তিনি সুখ্যাতির সহিত নির্ব্বাহ করিবেন এইরূপ আশা করা যায়। মেদিনীপুরের জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ফ্রেঞ্চ সাহেব এক্ষণে জেলার মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব মেদিনীপুর ফৌজদারী আদালতের শ্রেস্তার মধ্যে তত্রত্য মোক্তার-গণের প্রবেশ করা বন্ধ করিয়াছেন। নানা কারণে মোক্তারগণের শ্রেস্তায় যাওয়ার আবশ্যক হইয়া থাকে। শুনা যায় একজন নূতন মোক্তার শ্রেস্তায় বসিয়া আমলাদিগের সহিত হাস্য পরিহাস করিতে ছিলেন দেখিয়া ব্রাইট সাহেব ঐরূপ আদেশ দিয়াছেন।

একজনের দোষে দশ জনার শাস্তি হওয়া উচিত নহে। আশা করি মাজিষ্ট্রেট ফ্রেঞ্চ বাহাদুর এ বিষয়ে পুনর্ব্বিবেচনা করিবেন।

মেদিনীপুরের জজ সাহেব লক্ষ্মী নারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে পাতি সাব্যস্ত করিয়া তাহার আদালতে আসা বন্দ করিয়া দেওয়ায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় হাইকোর্টে আপীল করিয়া ছিলেন। হাইকোর্টেও ঐ রায় বাহাল রহিয়াছে। তবে নিজের ও মনিবের কার্য্যে আদালতে আসিতে পারিবেন, এই আদেশ হইয়াছে।

অনেক দিন হইতে এখানকার খাশ-মহালের ভার এক জন সবডেপুটি কালেক্টরের হস্তে ন্যস্ত ছিল। গত এপ্রিল মাস হইতে সেই নিয়ম উঠিয়া গিয়া এক জন কানন গোঁ বা এক শত টাকা বেতনের অন্য কোন কর্ম্ম-চারি খাশ তহশীল অফিসার হইবেন স্থির হইয়াছে। এই বেতনে সকল সময়ে সুযোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাইবে কি? খাস তহশীল অফিসারকে সময়ে সময়ে প্রজাগণের স্বার্থ ঘটিত গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে হয়। আমাদের ধারণা বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনে কার্য্যের সুশৃঙ্খলার ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা।

বিগত ২০শা মে উড়িয়া কোষ্ট কেনালের মধ্যে ভাইটগড় লকের খালাশীগণ অনুপস্থিত থাকাতে টিণ্ডেল একজন মাঝির সাহায্যে লকের দেয়ালের মধ্যস্থিত লোহার কপাট কলে উঠাইয়া নৌকা বাহির করিতে ছিল। সেই সময়ে কলের একটা লোহা ছিটকাইয়া মাঝির মস্তকে সজোরে আঘাত করে;তাহাতে মাঝি অচেতন হইয়া পড়ে। মাঝিকে তৎ-ক্ষণাৎ বাড়ী লইয়া যাওয়া হয়। তৎপরে তাহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। লকের খালাশীগণ অনুপস্থিত থাকাতেই এই বিপৎপাত ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। শুনা যায় তাহারা অনেক সময় এইরূপ আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্যের ক্রটী করিয়া থাকে এবং তাহাতে সাধারণের অত্যন্ত অসুবিধা ঘটে। বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব অতি বিচক্ষণ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের এরূপ আচরণের কথা সাহেব বাহাদুরের কর্ণগোচর হয় না বলিয়াই ইহার প্রতিবিধান হয় নাই। আমরা আশা করি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় এবিষয়ে মনোযোগী হইয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

কাঁথি সহর হইতে ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী শীপুর গ্রামে সম্প্রতি একটী দ্বাদশ বর্ষীয় বালক বেগুন ক্ষেত হইতে হনুমান তাড়াইতে গিয়া হনুমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। হনুমান নখ ও দন্তের দ্বারা বালকের পেট চিরিয়া দেয়। বালকটী কাঁথির হাঁসপাতালে আনীত হইয়াছিল। ডাক্তার বাবু ৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া বালকের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করেন; ফল হয় নাই। হাঁসপাতালেই মৃত্যু হইয়াছে।

বিগত ১৩ ই মে বৃহস্পতিবার রাত্রিতে কাঁথির এক ক্রোশ দক্ষিণে বক্সীসপুর গ্রামের রঘুনাথ পতিরকে কে খুন করিয়াছে। রঘুনাথের স্ত্রী বলে যে এক প্রতিবেশী ঐ রাত্রিতে ৯।১০ টার সময় তাহার স্বামীকে ডাকিয়া লইয়া যায়।

তাহার পর হইতে রঘুনাথকে আর পাওয়া যায় নাই। এই ঘটনার তিন দিন পরে ঐ গ্রামের হাকণ্ড পুখুরে রঘুনাথের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। দেহে বাইশের দ্বারা ৮।৯ স্থানে কাটার চিহ্ন রহিয়াছে। হত্যাকারী রঘুনাথের দেহ দুইটা থল্যার ভিতর পুরিয়া একটা মশারিতে জড়াইয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া একটা জালায বাঁধিয়া পুখুরে ফেলিয়া দিয়াছিল। লাশ পচিয়া ভাসিয়া উঠে। পুলিস ঐ গ্রামের দুর্গা প্রসাদ পরামাণিককে হত্যাপরাধে চালান দিয়াছেন ও বিচার চলিতেছে।

বকৃরিদে বিভ্রাট—গত বকৃরিদের দিন ঘাটালে বিষম বিভ্রাট ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। ঘাটাল মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত কোন্নগর গ্রাম নিবাসী সেখ্ সমীরুদ্দিন্ নামক একজন মুসলমান ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করেন যে বকৃরিদের দিন সন্ধ্যাকালে চিরন্তন প্রথামত তাঁহার মস্‌জিদে গোহত্যা হইবে; কিন্তু তাহাতে প্রতিবেশী হিন্দুদিগের বাধা দেওয়ার সম্ভাবনা এইজন্য যাহাতে শান্তিভঙ্গ না হয় তজ্জন্য তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ঘাটালের সুযোগ্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাবু আশুতোষ বাগচীর উপর তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করিবার আদেশ দেন। আশুবাবু সরেজমিন্ তদন্ত করিয়া ৬ই মে তারিখে উভয় পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করেন এবং নিজ মন্তব্য সহ সমস্ত কাগজ পত্র ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব উভয় পক্ষের সাক্ষীর জমানবন্দী পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, এই মস্‌জিদে গো হত্যা হইবার কোনও প্রথা প্রচলিত ছিল না; এক্ষণে সমিরুদ্দিনের হাতে কিছু পয়সা হওয়ায় তিনি সেই মস্‌জিদে গোহত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছেন; এইরূপ গোহত্যা করিবার আদেশ দিলে গ্রামবাসী চারি পাঁচ শত হিন্দুর চক্ষুর সম্মুখেই হত্যাকার্য্য সম্পাদিত হইয়া শান্তিভঙ্গের বিশেষ সম্ভাবনা; বিশেষতঃ যখন বকৃরিদে গোহত্যা না করিয়া ছাগ বা মেষ হত্যা করিলেও মুসলমানদিগের শাস্ত্রানুসারে কোনও দোষ হয় না এই সকল অবস্থায় তিনি এই হিন্দুপ্রধান গ্রামে প্রকাশ্য স্থলে গোহত্যার আদেশ দিতে পারেন না। তিনি ১৪৪ ধারানুসারে সমিরুদ্দিনকে বকৃরিদের দিন গোহত্যা করিবার নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশানুসারে ডেপটী বাবু হিন্দু মুসলমান্ উভয় পক্ষের নিকট মুচলকা গ্রহণ করেন। ইহাতেও শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা নিবারিত না হওয়ায় মেদিনীপুর হইতে বার জন অস্ত্রধারী পুলিশ-কন্‌ষ্টেবল্ আনাইতে হইয়াছিল। স্থানীয় ডেপুটী বাবু, পুলিসকর্ম্মচারীগণ ও এই সকল অস্ত্রধারী কন্‌ষ্টেবলের সাহায্যে সে দিন কোন্নগরে গোহত্যা নিবারণ ও শান্তিরক্ষা হইয়া ছিল। আমরা ব্রাইট্ সাহেব ও বাবু আশুতোষ বাগচীর নিরপেক্ষতা ও বিচার দক্ষতায় পরিতুষ্ট হইয়াছি। যে সকল মোক্তার বাবুরা পারিশ্রমিক না লইয়া নিরীহ হিন্দুদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ও আমাদের ধন্যবাদর্হ, আশাকরি সুযোগ্য ডেপুটী বাবু উভয় পক্ষের প্রধান প্রধান লোকদিগকে ডাকাইয়া উভয়পক্ষের

মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিবেন।

কাঁথিতে জুবিলি—গত ৩১ শে মে কাঁথিতে জুবিলি উপলক্ষে এক সভার অধিবেশন হইয়া ছিল। জুবিলির দিবস ভগবানের আরাধনা, কাঙ্গালী ভোজন, নৃত্যগীতাদি আমোদ প্রমোদ, বাজীপোড়ান ও বড় লাটসাহেবের নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সব্‌ডিবিজনাল অফীসার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

মেদিনীপুরে জুবিলি—গত ২৬শে মে বেলীহলে জুবিলি উপলক্ষে সভা আহূত হয়। রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করেন। জুবিলী উপলক্ষে মেদিনীপুর মিয়াবাজারে একটী কুপ খনন ও কেল্লার মাঠে বাজীপোড়ান হইবে এইরূপ প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই দুর্ভিক্ষের বৎসর কাঙ্গালী ভোজনের কোনও প্রকার বন্দোবস্ত হইলেই উৎসব কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। নাড়াজোলের রাজা বাহাদুর বাজী পোড়ানর সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তিনি বা অপর কোনও মেদিনীপুরবাসী জমিদার সে দিন কি কাঙ্গালী ভোজনের ব্যয় ভার বহন করিতে সম্মত হইবেন না? আমাদের আশা যে মেদিনীপুরবাসীগণ এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবেন না।

তমলুকে জুবিলি—গত ১৭ই মে তমলুকে হীরক জুবিলির উপলক্ষে এক বৃহতী সভা আহূত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সবডিবিজনাল অফিসার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ছিলেন। হাকিম উকীল জমিদার প্রভৃতি অনেকানেক ভদ্র লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দিয়া হীরক জুবিলি উপলক্ষে স্থানীয় রাজভক্ত প্রজাগণের হর্ষজ্ঞাপক এক অভিনন্দন পত্র ভারতেশ্বরীর নিকট পাঠাইবার স্থির হইয়াছে তদ্ভিন্ন শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী ও তাঁহার সাম্রাজ্যের মঙ্গলকামনায় দেবপূজা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন এবং কাঙ্গালী ভোজন করান হইবে। সভাস্থলেই শতাধিক টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। লাক্ষ্যার জমিদার বাবু উপেন্দ্র নারায়ণ মাইতি জুবিলি উপলক্ষে সমবেত কাঙ্গালীদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইবার ব্যয় ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

মেদিনীপুর বালেশ্বরের পথে নানা স্থানে রাহাজনী হইতে ছিল। সম্প্রতি ঐ পথে পুলীশ প্রহরী বন্দোবস্ত হইয়াছে। পথের দীর্ঘতার অনুপাতে প্রহরীর সংখ্যা কম হইলেও কয়েক দিবস আর কোন অত্যাচারের কথা শুনা যায় নাই।

মেদিনীপুরে দায়রা—দাওরায় তমলুকের লোকপাড়ি ও কালিকাদাঁড়ী গ্রামের যে দুইটী ডাকাইতির বিচার হইতে ছিল তাহাতে ভেলুসেখের যাবজ্জীন দ্বীপান্তর ও আনুমুদ্দীন, সেক্ সুলতান, মানুসাপারু, তিতুমানা, বিপিন বর, সেখ জামির, গোপাল বেরা ও নিমাই তরওয়ার ইহাদের প্রত্যেকের দশ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ

মেদিনীপুর জেলাতে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্য বৈদিক বা উৎকল শ্রেণীর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জেলার দক্ষিণ ভাগেই এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের আধিক্য দেখা যায়। রাঢ়ীয় সামবেদীর সংখ্যা অতি অল্প ও প্রধানতঃ জেলার উত্তরাংশেই ইঁহাদের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যত্র নাই, এমন নহে; তবে কেবল যেখানে যেখানে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থের বাস, সেই সেই স্থলে কোথাও কোথাও দুই একটী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ দেখা যায়। ফলতঃ মেদিনীপুরের মধ্যভাগে "মধ্যশ্রেণী" নামক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ইঁহাদের সংখ্যা উৎকল শ্রেণীর সহিত তুলনায় অপেক্ষাকৃত কিছু কম হইলেও, মোটের উপর বড় কম নহে। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অন্য কোন জেলাতে নাই, এমন কি এই জেলারই উত্তর বা দক্ষিণ ভাগে অতি বিরল। এই কারণে ইহাদের জাতি সম্বন্ধে অনেকে অনেক সন্দেহ ও কাল্পনিক অনুমান করিয়া থাকেন। এমন কি, অনেক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ইঁহাদের সহিত এক পংক্তিতে আহার করিতেও আপত্তি করেন এবং অনেক দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থও অধিকাংশ স্থলে ইঁহাদের দ্বারা যাজন ক্রিয়া সম্পন্ন করাইতে বা বিগ্রহাদির পূজা করাইতে অনিচ্ছুক। অন্য জেলায়, কার্য্য উপলক্ষে দুই একটী মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ কোথাও কোথাও উঠিয়া গিয়া বাস করিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু সেখানেও প্রায়ই ইহাদিগকে কোন নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ন্যায় সাধারণতঃ বিবেচিত হইতে দেখা যায়। বস্তুতঃ ইঁহারা নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নহেন। ইঁহারা প্রকৃতই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ; ইঁহাদের ইতিবৃত্ত না জানা হেতুই ইঁহাদের জাতিত্ব সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে। ইঁহারা সাম বেদীয় ব্রাহ্মণ, এবং গাঁই, গোত্র পদবী প্রভৃতি কোন বিষয়েই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সহিত ইহাদের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। মেদিনীপুরে যে সমস্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ দেখা যায় তাঁদের সহিত তুলনায়, কি আচার ব্যবহার কি নিষ্ঠা কি বিদ্যা চর্চ্চা বা শাস্ত্রালোচনা কোন বিষয়ে মধ্য শ্রেণী ব্রাহ্মণ, অপেক্ষাকৃত হীন হওয়া দূরে থাকুক, অধিকাংশ স্থলে বরং ইহাদের শ্রেষ্ঠতা দেখা যায়। এ জেলায় দাক্ষিণাত্য বৈদিকের মধ্যে বেদান্তের পণ্ডিত অপেক্ষাকৃত অধিক বটে কিন্তু ন্যায় ও ব্যাকরণে আজিও মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মধ্যশ্রেণীই শীর্ষ স্থান অধিকার করিতেছেন। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইঁহাদের ভিতর বিদ্যাচর্চ্চার বিস্তর অবনতি হইলেও আজিও মধ্যশ্রেণীর সমাজ ভেমো, ভোগদণ্ড, চাঁপাডালী, গোকুলনগর, বল পাই প্রভৃতি গ্রামে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাশীল নিষ্ঠাবান সরল প্রকৃতি ব্রাহ্মণ বিস্তর দেখা যায়। দেখিতে পাই দুই একটী অতি দুঃখী ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে হয়ত একখানি টোল রাখিয়াছেন অতি কষ্টে বর্ষ শেষে দশভুজার আহ্বান করিয়া জবা বিল্ব দিয়া মাতার চরণ রঞ্জিত করিতেছেন, আর ব্রাহ্মণী কেবল শঙ্খ বলয় মাত্র ভূষণেই পরিতৃপ্ত থাকিয়া শাকান্ন

ভোগ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্বহস্তে মা'র প্রসাদ আগন্তুক অতিথিকে পরিবেশন করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছেন। এ জেলার ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দেখিতে পাই মধ্যশ্রেণী ও উৎকলশ্রেণী অপেক্ষা বরং রাঢ়ীয়গণ সংস্কৃত চর্চ্চায় অপেক্ষাকৃত হীন। মেদিনীপুরের অধিকাংশ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণের মধ্যে আচারগত যে পার্থক্য দেখিতে পাই তাহা কেবল কৌলীন্য প্রথা সংস্পৃষ্ট মধ্যশ্রেণী কৌলীন্য প্রথার বিরোধী কিন্তু তাহা গুণ ভিন্ন দোষ নহে। মধ্যশ্রেণী শুক্র বিক্রয় করেন না, অথবা পঞ্চ বর্ষীয় দুহিতারূপী সেরত্রয় মাংশপিণ্ডকে তিন শত টাকায় বিক্রয় করিয়া তাহাকে বিবাহ নামে অভিহিত করেন না। এখন পর্য্যন্তও মধ্যশ্রেণীর এই অবস্থা আছে বলিয়া লেখকের বিশ্বাস। তবে মানুষের অনুকরণ প্রিয়তা এতই বলবতী, যে অনেক সময় মানুষ সভ্যতার অনুকরণ করিবার ব্যগ্রতায় কপি-সুলভ অনুকারিতায় অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। তখন হয়ত দোষ গুণের পার্থক্য বিচার রহিত হইয়া যায়, না হয় গুণ ভাগ অনুকরণ করা কঠিন দেখিয়া দোষ ভাগই অগ্রে শিখিয়া ফেলে। এই স্বাভাবিক নিয়মে যদি কোথাও কোথাও মধ্য শ্রেণীর মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রসূত কোন কোন দোষের আবির্ভাব হইয়া থাকে তবে তাহার সংখ্যা নিশ্চই খুব কম। ফলতঃ রাঢ়ীয় ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যের মুল কারণ কেবল কৌলীন্য লইয়া। তৎসম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা বা চিরাগত কিম্বদন্তী আছে। কিম্বদন্তী বলিয়া অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ নাই। যে সকল কিম্বদন্তী সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ তাহা অনেক সময় লিখিত ইতিহাস অপেক্ষাও বাস্তবিক অধিকতর বিশ্বাস যোগ্য। ইংলণ্ডের সভ্যতার ইতিহাস লেখক বকল্ বলেন যে মানুষ যখন লিখিতে জানিত না, যত দিন কোন ঘটনা বা ইতিবৃত্ত কেবল জনশ্রুতিতে, বা বন্দীর গীতিমালায় বা কবির গানে আবদ্ধ ছিল, তখন সত্যের অপলাপের সম্ভাবনা খুব কম ছিল; যে দিন হইতে তাহা ইতিহাসের আকারে লিখিত হইতে আরম্ভ হইল সেই দিন হইতে মিথ্যার সূচনা হইল। ঘটকের কুলজী বা ভাটের কবিতা হেরোডোটশের ঐতিহাসিক বংশাবলী বর্ণন অপেক্ষা অধিকতর অবিশ্বাস যোগ্য নহে। বিবেকানন্দকে এক পাদরী বলিয়া ছিলেন তোমাদের "বেদ ত আর লেখা পড়ায় আবদ্ধ ছিলনা কাজেই উহার ভ্রান্তির সম্ভাবনা বেশী"। বিবেকানন্দ ইহার একটী বেশ সুন্দর উত্তর দিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন "ভাগ্যে বেদ লিপিবদ্ধ হয় নাই, সেই জন্য বাহিরের কাল্পনিক কথা ইহাতে প্রক্ষিপ্ত হইতে পায় নাই। তাই বেদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস যোগ্য"। কথাটা যে বহুল পরিমাণে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক বিশ্বাসের প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি বা প্রমাণের ন্যায় সম্মত যথেষ্টতা সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখা লেখকের উদ্দেশ্য নহে। মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা পরম্পরাক্রমে জনশ্রুতিতে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে তাহা এইরূপ—

পূর্ব্ব বঙ্গে গঙ্গাধর গঙ্গোপাধ্যায় নামে কোন বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন; ব্রাহ্মণ তাৎকালিক কুপ্রথানুসারে বিস্তর বিবাহ করেন। স্মৃতির সহায় কল্পে

যথারীতি শ্বশুরের নাম ধামাদি খাতায় লিখিত থাকিত। একদা ব্রাহ্মণ খাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিতে পাইলেন যে, বহুকাল হইল অমুক গ্রামে একটী চারি বৎসর বয়সের বালিকাকে বিবাহ করা হইয়াছে। বালিকা এক্ষণে পূর্ণ যৌবনা হইয়াছে। বিবাহ অবধি সে মুখ করা হয় নাই। এ সময় একবার সে অঞ্চল দিয়া বেড়াইয়া আসিতে পারিলে দু পয়সা বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ শ্বশুরালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এক দিন দিবাবসানে শ্বশুরের গ্রামে পৌঁছিলেন। গ্রামের প্রান্তভাগে একটী স্বচ্ছ সলিল দীর্ঘিকা দেখিতে পাইয়া ব্রাহ্মণ পদ প্রক্ষালন উদ্দেশে ঘাটে নামিলেন; দেখিলেন একটী অষ্টাদশ বর্ষীয়া অতি সুন্দরী যুবতী বারি পূর্ণ কলস কক্ষে স্থাপন করিয়া পুষ্করণীর ঘাট হইতে গ্রামাভিমুখে চলিল। ব্রাহ্মণ যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন"মা অমুক ব্রাহ্মণের বাটী কোন দিকে যাইব? আমায় একটু পথ দেখিয়া দিতে পার বাছা?" যুবতী বলিল "আমার সঙ্গে আসুন"। এই বলিয়া যুবতী ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল ও বলিল "আপনি একটু অপেক্ষা করুণ আমি বাবাকে ডেকে দিচ্ছি"। ব্রাহ্মণের মনে বিষম খট্‌কা বাঁধিয়া গেল "যুবতী কি আমার বনিতা"? প্রকৃতও তাই। শ্বশুর বাহিরে আসিলে কথায় কথায় গঙ্গাধর সমস্তই জানিতে পারিলেন। শ্বশুর জামাতাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর যত্ন করিলেন; জামাতা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বলিলেন'পত্নীকে মাতৃ সম্বোধন, দুহিতৃ সম্বোধন করিয়াছি। প্রায়শ্চিত্ত করিব প্রায়শ্চিত্ত না থাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব, এই বলিয়াই ব্রাহ্মণ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু আর বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। [illegible]ান স্মার্ত্ত পণ্ডিতের নিকট ব্যবস্থা লইলেন, দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাত বাস এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তখন তিনি যদৃচ্ছা পথে গমন করিয়া অবশেষে আধুনিক তমলুকের অন্তর্গত ময়না গড়ে উপনীত হইলেন। তথায় কৈবর্ত্ত জাতীয় এক ধর্ম্ম পরায়ন রাজা ছিলেন। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টায় গঙ্গাধর তথায় বাস করিতে সম্মত হইয়া ছিলেন, এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন দেশে আর ফিরিবেন না, এবং কৌলীন্য বিরোধী এক শ্রেণী, ব্রাহ্মণ এই দেশে বাস করাইবেন; ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, কালে এই দেশ ব্যাপী কদাচারের কথঞ্চিৎ লাঘব হইতে পারিবে। রাজার সহানুভূতি ও চেষ্টায় গঙ্গাধরের কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। ক্রমে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে দুই একটী করিয়া সদ্‌ব্রাহ্মণ সপরিবারে ময়নাতে ও নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিল এবং কৌলীন্যের প্রথা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া একটী নূতন শ্রেণী পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। রাঢ় ও উৎকলের সীমার মধ্যস্থিত প্রদেশে বাস বলিয়া এই নূতন শ্রেণীর নাম মধ্যশ্রেণী হইল। আজিও ঘটকের কুলজী গাথার মধ্যদেশী গঙ্গাধরের নাম উচ্চারিত হইতে শুনা যায়।

মজলিস।

কোন তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত বলিয়াছেন, " মানুষ একটী সামাজিক জীব "। আর এক জন বলেন, " যে ব্যক্তি গৃহ ত্যাগ করিয়া বনে গমন করে, হয় সে পশু না হয় দেবতা"। বাস্তবিক, সকলে মিলিয়া একত্র বাস করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। ইহা হইতেই সমাজের সৃষ্টি। লোকে ইচ্ছা করিয়া সমাজ-বদ্ধ হয় নাই। একত্র বাস করিলে আমরা পরস্পর পরস্পরের বিশেষ সাহায্য করিতে পারি, পরস্পরের অভাব দূর করিতে পারি, এবং নানা বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারি, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সমস্ত সুবিধা আলোচনা করিয়া কি আমরা একত্র বাস করিতে শিখিয়াছি? তাহা নহে। সমাজ হইতে আমরা অসংখ্য উপকার প্রাপ্ত হই সত্য; কিন্তু তাহা একত্র বাসের ভাবি ফল মাত্র, মূল কারণ নহে। আমাদের মনোমধ্যে স্বতঃই এমনি একটা প্রবৃত্তি আছে, যাহার বশে আমরা আমাদের স্বজাতিগণে পরিবৃত হইয়া বাস করিতে বাধ্য হই। যদি এই বিশাল ভূমণ্ডলে কেবল মাত্র দুইটি মনুষ্য বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে তাহারা ঘুরিতে ঘুরিতে দেখা হইলেই, কেহ কাহারও সঙ্গ-ত্যাগ করিত না। চির জীবন একত্র বাস বা বিচরণ করিত। পৃথিবীতে মানবের প্রথম আবির্ভাব কালে অন্ততঃ দুইটী মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

মানুষ কদাচ একাকী থাকিতে পারে না। নির্জ্জন বাস ত রাজকীয় কঠোর শাস্তির মধ্যে পরিগণিত। মুনি ঋষিরা বনে থাকিতেন বটে, কিন্তু সেখানেও তাঁহাদের আশ্রম ছিল। স্ত্রী, পুত্র, শিষ্য ছিল; গাভী, হরিণ, ময়ুর ছিল; তাঁহারা গ্রামে ভিক্ষা করিতে যাইতেন, গৃহে অতিথি সেবা করিতেন; তাঁহারা রাজ সভায় উপস্থিত হইতেন। রাজগণও মধ্যে মধ্যে আশ্রমে গিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তবেই তাঁহাদের বনবাস আর রহিল কোথা? তাঁহারা নগরের কোলাহল ত্যাগ করিয়া ছিলেন মাত্র; কিন্তু সমাজ পরিত্যাগ করেন নাই। সমাজই মনুষ্যের জীবন; সমাজই মনুষ্যের উন্নতির কারণ সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না। অতএব সামাজিক ভাব যাহাতে বিশেষ রূপে রক্ষিত হয়, যাহাতে উত্তরোত্তর সামাজিকতার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা এবং সাধ্যানুসারে চেষ্টা ও আলোচনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কথোপকথন সামাজিকতার একটী প্রধান অঙ্গ। বিশেষ কার্য্যোপলক্ষ ব্যতীত পাঁচ জন জড় হইলেই নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা তর্ক, গল্প, রং, তামাসা ইত্যাদি চলিতে থাকে। সকলেই এক প্রকার অলক্ষিত ভাবে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেন। দেহ ও মন উভয়ই পুষ্ট হয়। কঠিন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের পর মানুষ বিশ্রাম লাভ করিতে চায়। কিন্তু একাকী চুপ করিয়া বসিয়া থাকা অসহ্য বোধ হয়, যেন কত দুশ্চিন্তা আসিয়া আমাদিগকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করে।

আমরা নিবারণ করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া উঠি। মানুষের মুখ দেখিতে না পাইলে যেন হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। এই সময়ে যদি কোন পরিচিত লোক আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে মনের সেই কষ্টকর ভাব একেবারে তিরোহিত হয়। উভয়ে এ কথা সে কথা কহিতে থাকেন। ক্রমে আর একটী আর একটি করিয়া মজলিস্ জাঁকাইয়া উঠে, কথা বার্ত্তার স্রোত বহে। আমরা তাহাতে গা ভাসাইয়া দিই, কিয়ৎক্ষণ পুর্ব্বে যে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে ছিলাম তাহা বিস্মৃত হই। কথোপকথন আমাদের কি আদরের সামগ্রী!

সকল লোকেই কথোপকথনে সমান পটু নহেন। কেহ বা কথা কহিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের চিত্ত অতি সুন্দর রূপে আকর্ষণ করেন, কেহ বা অতি জড় ভাবাপন্ন বাক্যে সকলকে বিরক্ত করিয়া তুলেন, কেহ বা একাই এক সহস্র, যেন ঝড় বহিয়া চলিয়াছেন, অপরকে কথা কহিবার অবসর দেন না, আবার কেহ বা মাঝে মাঝে দু একটী কথা কহিয়া অপরের কথায় সায় দেন মাত্র। সকল ব্যক্তিই কথোপকথন শক্তির কিছু না কিছু লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। অবশ্য শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা তাহা বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হয়, কিন্তু প্রকৃতিগত হীনতা এবং বৈলক্ষণ্য চিরজীবন বদ্ধমূল থাকে। পণ্ডিত হইলেই যেমন কবি হয় না, সেই রূপ কথোপকথনেও পারদর্শী হইতে পারেনা। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে যিনি চিন্তা, অধ্যয়ন, দেশ পর্য্যটনে যত অধিক সময় অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার কথাবার্ত্তা ততই হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে।

বয়স, শিক্ষা, ব্যবসায়, সঙ্গ, সময়, রুচি প্রভৃতি কারণে কথোপকথনের বিষয় ও প্রণালী ভিন্ন হইয়া থাকে। যাঁহারা সর্ব্বদা একত্র মিলিত হন, তাঁহারা প্রায় সমবয়স্ক হইলেই ভাল হয়; বয়সের অধিক তারতম্য থাকিলে মন খুলিয়া কথা বার্ত্তা কহিবার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। বালক, বৃদ্ধ ও যুবকের একত্র সমাবেশ স্পৃহনীয় নহে। এই তিন শ্রেণীর প্রকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। বালক স্বভাবতঃ চঞ্চল ও চিন্তাশূন্য; বৃদ্ধ গম্ভীর ও চিন্তাকুল। বালক সামান্য কথাতেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে, বৃদ্ধের বিশেষ কারণ ব্যতীত সহজে হাসির উদ্রেক হয় না। বালক নিত্য নূতন বিষয় প্রিয়, একবার যাহা শুনিয়াছে তাহা আর শুনিতে ভাল বাসেনা; বৃদ্ধের কতকগুলি বাঁধা বিষয় ও গল্প আছে তাহাই তিনি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া থাকেন মাত্র। বৃদ্ধের সহিত অল্প দিন মাত্র কথা বার্ত্তা হইলে বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার গল্পের বিষয়গুলি চক্রবৎ ফিরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে; শুধু তাহা নহে, আবার বলিবার প্রণালীও এক প্রকার, রংতামাসা ও এক। বৃদ্ধ কতকগুলি তামাসা হাস্য রসোদ্দীপক বিশ্বাসে পুঁজী করিয়া রাখিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তাহা হইতে দুই একটী বাহির করেন এবং আশা করেন যে শ্রোতৃ-মণ্ডলী তাহাতে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবে। কিন্তু আনন্দ উপভোগ করা দূরে থাকুক, শ্রোতার বিষম বিপদ উপস্থিত হয়। তিনি অন্তরে যার-পর নাই বিরক্ত হন, অথচ ভদ্রতা এবং বয়সের খাতিরে বৃদ্ধের গল্প শুনিতে থাকেন

অথবা শুনিবার ভান করেন, এবং বৃদ্ধ হাসিলে তাঁহার সহিত একটু হাসিতেও হয়, নচেৎ ভদ্রতা রক্ষা হয় না। অবশেষে বৃদ্ধ চুপ করিলে বা উঠিয়া গেলে, প্রকাশ্যে না হউক, মনে মনে বলেন, আঃ বাঁচিলাম।

কিন্তু যুবকও সাবধান! ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। যুবককেও এককালে বৃদ্ধ হইতে হইবে, অতএব বৃদ্ধ হইলে যাহাতে তোমার কথা অপরের বিরক্তি জনক না হয়, তাহার যোগাড় আগে থাকিতে কর। তোমার শরীরে বল আছে, মানসিক বৃত্তি সতেজ আছে, অনেক দেখিবার শুনিবার সুযোগ এবং অবসর আছে, এই সময় তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া পুঁজি বাড়াও। নহিলে "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" অর্থাৎ মজলিস্ পরিত্যাগ কর, তাহা হইলেই বনে যাওয়া হইল। নতুবা তোমারই মত অশীতি পর লোক লইয়া স্বতন্ত্র মজলিস্ কর, যুবকের মজলিসে তুমি স্থান পাইবেনা। কিন্তু তোমার সমবয়স্ক লোক পাওয়াও দুরূহ হইবে কেননা অনেকে পঞ্চাশের পুর্ব্বেই তিরোহিত, হইবেন। তোমাকে বাধ্য হইয়া যুবকের দলে মিশিতে হইবে, তোমার আর উপায়ান্তর নাই।

যুবক এবং বৃদ্ধ যদি বালকদিগের সহিত মিশিতে চান তবে তাঁহাদেরও বালক হওয়া আবশ্যক। গম্ভীর ভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে, যাহাতে শিক্ষা ও আমোদ দুইই হয় তাহা করিতে হইবে এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহার অবতারণা বা আলোচনা বালকদিগের সমক্ষে হইতে পারেনা, ইঙ্গিতেও তাহার উল্লেখ করা উচিত নহে। যত্ন পুর্ব্বক সে গুলি বাদ দিতে হইবে, নতুবা বালকের মনে কুভাবের সঞ্চার হইয়া ক্রমশঃ তাহা বদ্ধমূল হইবে। এবিষয়ে বৃদ্ধেরা তত মনোযোগী নহেন। বয়স হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন যে যা তা বলিবার তাঁহাদের অধিকার জন্মিয়াছে। অপরে এরূপ করিলে তাহাকে নিবারণ করা যাইতে পারে। বৃদ্ধকে নিবারণ করে কে, উপদেশই বা দেয় কে, শাসন করা ত হইতেই পারে না। তাঁহার উপরে আর মাথা নাই, সুতরাং তাঁহার সাত খুন মাপ। বৃদ্ধ নিজে না বুঝিলে তাঁহাকে বুঝাইবার লোক কেহই নাই; যদি যুবক তাঁহাকে কোন বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বৃদ্ধ অধীর হইয়া উঠেন এবং কোন প্রকার যুক্তি সঙ্গত উত্তর না দিয়া বলিয়া বসেন " ওহে বাপু, আমার চুল পাকিয়াছে, আমি ঢের দেখিয়াছি, তোমরা ত সে দিনকার ছেলে, কেন মিছা তর্ক কর ?" বস্ ইহার উপর আর কথা নাই।

বৃদ্ধ নিতান্ত প্রতিবাদ অসহিষ্ণু। তিনি যেমন বুঝেন, সেরূপ আর কেহ বুঝিতে পারে না, তাঁহার মত অভ্রান্ত, তাঁহার যুক্তি অখণ্ডনীয়, এইরূপ ধারণা তাঁহাকে গ্রাস করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার যুক্তি ৫০ বৎসরের পুরাতন, তাহার অসারতা পুর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধের সে বিষয়ে দৃক্‌পাত নাই, বৃদ্ধ তাহা নুতন বলিয়া লোকের সমক্ষে ধরিতে চাহেন।

বৃদ্ধের পরিবর্ত্তন-শীলতা নাই। যাহা কিছু নুতন তাহাই তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখেন। তাহা ভাল কি মন্দ এই বিচার

করিবার প্রবৃত্তি থাকেনা। যদি বাধ্য হইয়া বিচার করিতেই হয়, তবে পুরাতনের দিকে তিনি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার একটি স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস এই যে "যা ছিল তা ভাল ছিল, যা আছে তা ভাল আছে"। সে কালের কথায় তাঁহার মুখ হইতে লাল পড়ে, সে কালের জন্য তিনি কত বার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

(ক্রমশঃ)

আমার মকদ্দমা।

১১২ পৃষ্ঠার পর

তার পর সাক্ষীর উপর সমন জারির ব্যাপার আরম্ভ হইল। দাদা বলিলেন সমন জারি না করাইলে চলিবে না। যদি জমিদারপুত্র ইন্দু ভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও তোমার কাকুতি মিনতিতে দয়া-পরবশ হইয়া সত্যের অনুরোধে বিনা শমনে আদালতে উপস্থিত হন, তিনি হাকিমের চক্ষে হেয় হইবেন, জেরাকারী উকিলের উপহাসের পাত্র হইবেন; তাঁহার সাক্ষ্য মুল্য হীন বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু তোমার রামা চাকরের উপরেও একটা সমন করাইয়া হাজির করিলে রামা রামচন্দ্র হইবে, স্বাধীন সাক্ষী বলিয়া তাহার আদরের সীমা থাকিবেনা। কাজেই এ হেন স্পর্শমণি না আনিয়া কাজেই ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। দাদা একটী ফৌজদারী আসামীর উদ্ধার সাধনে ব্যস্ত থাকায় যাইতে পারিলেন না। আমিই তাঁহার পত্র লইয়া এক খানি দশ টাকার নোট কাপড়ে বাঁধিয়া গঙ্গা আনয়নে বহির্গত হইলাম।

তমসুকে ৫টী সাক্ষী ছিল। সবরেজিষ্ট্রার বাবুর নিকট সনাতনকে যে পরিচিত করিয়া দিয়াছিল পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হয়। রামদাসের আস্ফালনে সাক্ষীরা ভীত হইয়া কেহই সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হইল না। সনাতন যে সকল ভদ্র লোকের নিকট তমসুকের কথা স্বীকার করিয়াছিল দাদা পত্রে কেবল তাঁহাদের নামই লিখিয়া দিলেন। যথা সময়ে নবীন বাবুর বাসায় পঁহুছিলাম। মুহুরি বাবু পত্র পড়িয়া নোটখানি চাহিয়া বসিলেন। আমি বলিলাম যখন যাহা খরচ লাগিবে দিব? নোটের টাকায় আমার অন্য খরচের দরকার আছে। মুহুরির মুখ অপ্রসন্ন হইল; মুখ বাঁকিয়া গেল তিনি আমার কথা শুনিয়াও শুনেন না, অপর কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন; আমি চুপ করিয়া পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম। তার পর দুই চারিবার তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলাম—ফল হইল না। শেষে মুহুরি মহাশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন মহাশয় আপনার সহিত আমরা কাজ করিতে পারিব না। আমার অপরাধ কি বুঝিতে বাকী রহিলনা; কাজেই নোটখানি তাঁহার হাতে দিতে হইল। মুহুরির সেই মুখেই আবার হাসি আসিল আমার সহিত নানা বিষয়ে কথা চলিতে লাগিল; শেষে

আমাকে লইয়া উকিল বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

নবীন বাবু মুহুরির মুখেই কয়টা কথা শুনিয়া লইলেন, কাগজ দেখিলেন না। তিনি বলিলেন তমস্থকের সমুদায় সাক্ষীকেই সমন করিতে হইবে; তা ছাড়া অপর সাক্ষী থাকিলে তাহাদিগকেও শমন করা দরকার। বলা বাহুল্য এই কথাগুলি বলিবার নিমিত্ত প্রথমেই পুনরায় দর্শণী দিতে হইল; নোটখানি রূপান্তর হইয়া অষ্ট মুদ্রায় পরিণত্ত হইয়া গেল।

মুহুরি আপন আসনে আসিয়া আমার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন; শীঘ্রই নামের তালিকা বা ইশবনবিশি প্রস্তুত হইল, দশ ১২ জন সাক্ষীর নাম দেখাইলাম। মুহুরি বলিল 'আপনি দশ টাকা দিতে নারাজ হইতে ছিলেন; এই হিসাবে দেখুন আর ৬৲ টাকার দরকার, জবাবের নকল লইয়াছি।'এই বলিয়া একটী হিসাবের ফর্দ্দ আমার হস্তে দিল খরচের তালিকা দেখিয়া আমি হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। আমার নিকট আর কিছুই ছিল না; মুহুরিকেই সম্প্রতি খরচ চালাইতে অনুরোধ করিলাম। মুহুরি হাসিয়া বলিল 'তবে আমাকে এখনই অবিশ্বাস কর্ছিলেন; আমি এখন বিশ্বাস করি কি ক'রে?' আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম, কি বলিব বুঝিতে পারিলাম না। আমার ভাব গতিক দেখিয়া মুহুরি খরচ দিয়া চালাইতে স্বীকৃত হইল। কাজেই সেই হিসাবের লিখিত খরচ লইয়া কোন তর্ক করিতে আমার ভরসা হইল না; মুহুরির খাতায় ৬৲ ছয় টাকা দেনা স্বীকারে একটা দস্তখত করিয়া দিলাম।

বাসায় আসিয়া আহার শেষ করিয়া কাছারি যাইলাম। মুহুরি ইশবনবিশিতে উকীলের দস্তখত করাইয়া আদালতে দাখিল করিতে গেল। হাকিম গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন একটা মোকদ্দমা চলিতেছে। হাকিমের চ'খে চশ্‌মা; আমার মনে হইতে লাগিল তাঁহার দৃষ্টি আমার দিকেই রহিয়াছে। আদালত গৃহে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না, দরজার ধারে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম।

মুহুরি ইশবনবিশিটী আদালতে দিবার চেষ্টা করিলে একটি আমলা ইশারা করিয়া মুহুরিকে হাত দেখাইল, মুহুরি ও ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। কিন্তু বোধ হইল আমলাটী সে সায়ে স্বীকৃত হইল না আমলাটি মাথা নাড়িতে লাগিলেন। আমলা ও মুহুরির মধ্যে অব্যক্ত ভাষায় কি কথা হইল বুঝিতে পারিলাম না। তবে মুহুরি ইশবন-বিশি হস্তে লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল 'দেখলেন ত মশায়, সেই হিসাবের উপর আরোও কিছু বেশী দিতে হবে' আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না, শিক্ষা বিভাগের লোক বলিয়া আমরা মনে মনে একটা অভিমান ছিল। আমি বলিলাম 'না তা হবে না আমি অসৎ কার্য্যের সহায়তা করিব না।' মুহুরি আচ্ছা বলিয়া পুনরায় আমলার নিকট যাইয়া কোন কথা না বলয়া ইশবনবিশি তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসিল আমলা মহাশয় কট্ মট্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

মুহুরি আপন কার্য্যে চলিয়া গেল, আমি হাকিম দেখিবার অভিপ্রায়ে আর একটি

আদালতে প্রবেশ করিলাম এবং সাহস করিয়া একটী বেঞ্চের উপর বসিলাম। আমার পার্শ্বে একটী বৃদ্ধ বসিয়াছিল, তাহার সহিত দুই একটা কথা চলিতে লাগিল। তখন সে হাকিম পঁহুছেন নাই।

ক্রমশঃ

মহারাণী ভারতেশ্বরী।

ইংলণ্ডের রাণী, ভারতের সাম্রাজ্ঞী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজত্বের ষষ্ঠি বর্ষ পূর্ণ হইয়া একষষ্টিতম বৎসর আরম্ভ হইতেছে। কোন দেশের কোন রাজা বা রাণী এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন নাই। রাজত্বের ষষ্টিতম বৎসর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে মহারাণীর সমগ্র প্রজা-মণ্ডলী পরমানন্দে মহোৎসব করিতেছে। পৃথিবীর সকল অংশেই এই উৎসবের তরঙ্গ উঠিতেছে। সর্ব্বত্র বৃটিশ প্রজা মহারাণীর মঙ্গলোচ্চারণ করিতেছে। দরিদ্র, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, মহামারীর কবলে পতিত ভারত-বাসীও সকল দুঃখ ভুলিয়া এই মহোৎসবে যোগ দিতেছে। আমরা এই উপলক্ষে আমাদের মহারাণীর সংক্ষিপ্ত জীবনী কান্তির পাঠক-বর্গকে উপহার দিতেছি।

জন্ম।

ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জের পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ চতুর্থ জর্জ, এবং ২য় চতুর্থ উইলিয়ম ক্রমান্বয়ে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। উভয়েই নিঃসন্তান অব-স্থায় ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন। তৃতীয় এডোয়ার্ড, ডিউক অফ্ কেণ্ট, সেক্স কোবর্গের বিধবা রাজকন্যা ভিক্টোরিয়াকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে মে, আমাদের মহারাণীর জন্ম হয়। মহারাণীর প্রকৃত নাম অ্যালেজণ্ড্রিনা ভিক্টোরিয়া।

ভিক্টোরিয়ার বয়স একবৎসর পূর্ণ না হইতেই পিতা এডোয়ার্ড পরলোক গমন করেন। তাঁহার মাতা তখন ইংলণ্ডে এক প্রকার অপরিচিতা বলিতে হইবে। পতিহীনা হইয়া তিনি নিতান্ত নিঃসহায়া হইলেন। কিন্তু সেই গুণবতী, ধর্ম্মশীলা এবং বুদ্ধিমতী রমণী সে অবস্থায় পিতৃগৃহে না গিয়া, ইংলণ্ডে থাকিয়াই কন্যার লালন পালন ও সুশিক্ষা প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহিণীর ন্যায় স্বয়ংই কন্যার তাবৎ বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন।

তিনি ভিক্টোরিয়ার শরীরপোষণে যেমন যত্ন করিতেন, তাঁহার মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য ততোধিক চেষ্টা করিতেন। ভবিষ্যতে ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাণী হইতে পারেন জানিয়া, তাঁহাকে তদুপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতে তিনি ত্রুটী করেন নাই। ভিক্টোরিয়াও সেই স্নেহময়ী গুণবতী জননীর প্রতি একান্ত অনুরাগিনী থাকিয়া, তাঁহার সুশিক্ষা লাভ করিয়া দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

ভিক্টোরিয়ার যেমন রূপ, তেমনি গুণের বিকাশ হইতে লাগিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা,

পরোপকারপ্রবৃত্তি, দুঃখীদিগের প্রতি গভীর প্রেম, শিক্ষায় অনুরাগ, মনঃসংযম, শৃঙ্খলা, শ্রমশীলতা, সরলতা, বিনয় এবং ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার আচরণ ও ব্যবহার দর্শনে সকলেই তাঁহাকে অতিশয় প্রীতি করিত। তিনিও অতি সামান্য দরিদ্র লোক হইতে বড়লোক পর্য্যন্ত সকলকেই মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার মনে কখনই অহঙ্কার অভিমান স্থান পায় নাই। গৃহের দাস দাসী পর্য্যন্ত কখনও এমন অনুভব করে নাই যে তিনি তাহাদিগকে আপনার অপেক্ষা কোন অংশে হীন মনে করেন। আমরা সচরাচর 'বড়লোক' অথবা 'রাজা' বলিতে যে সকল ভাব বুঝি, তাহাতে সে সকলের কিছুই ছিল না। তাঁহার ন্যায়-নিষ্ঠা এমনই প্রবল ছিল যে বাল্যকালে ফুলগাছে জল দিবার সময়ও সকল গাছে সমান পরিমাণে জল দিতেন, এবং সকল গুলিকে সমান যত্ন করিতেন। বিলাসিতা আদৌ তিনি অভ্যাস করেন নাই। অতি সামান্য গৃহকার্য্য করিতেও তাঁহার কোন প্রকার আপত্তি ছিল না। তাঁহার মাতৃভক্তিও অতি প্রগাঢ় ছিল। মায়ের মনে কোন কষ্ট হইবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এমন কি,পাছে তিনি কোন প্রকার কষ্ট পাইয়াছেন জানিলে, মাতা দুঃখিত হয়েন, এই আশঙ্কায় নিজে কখনই কোন প্রকার কষ্টকে গ্রাহ্য করিতেন না। আহার ও বেশভূষায় তাঁহার কিছুমাত্র বড়মানুষি ছিল না। সরলতাই তাঁহার সকল কার্য্যের মূল মন্ত্র ছিল। দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে, পীড়িতের সেবা করিতে, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিতে বাল্যাবধি তাঁহার অতিশয় যত্ন দেখা যায়। কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়া, তাহা শেষ না করিয়া, কখনও ছাড়িতেন না। নিজের বাসনা পরিপূর্ণ করিতে কখনও মিতব্যয়িতার সীমা অতিক্রম করিতে চাহিতেন না। কোন প্রকার সদুপদেশ পালন করিতে, নিজের যতই কেন কষ্ট হউক না, কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইতেন না। বড় লোকের ছেলে মেয়ে সাধারণতঃ যেরূপ উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল এবং আদুরে হইয়া পড়ে, তাহাতে সেকল দোষ বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নাই। বিশাল সাম্রাজ্যের ভাবী অধীশ্বরী বাল্যকাল হইতেই সর্ব্ব প্রকার মহৎ গুণের অধিকারিণী হইয়া কোটী কোটী প্রজার হৃদয়-রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী হওয়ারও সূত্রপাত করিতে ছিলেন। ভিক্টো-রিয়া যে কেবল আমাদের দেশের মহারাণী বলিয়াই সম্ভ্রমের পাত্রী, তাহা নহে; পরন্তু, তাঁহার মত সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা মহত্ত্বের আদর্শ-স্থানীয়া রমণীকে যে ব্যক্তি হৃদয়ের প্রীতি ভক্তি আগ্রহসহকারে অর্পণ করিতে না পারে, এবং তাঁহাকে মহারাণীরূপে লাভ করিয়া ভগবানের কৃপা ও আপনার সৌভাগ্য যে মনে না করে, সে নিশ্চয়ই কৃপাপাত্র। তাঁহাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতে করিতে হৃদয় পবিত্রতাপূর্ণ হয়, মহৎ ভাবে উদ্দীপিত হয়, এবং কৃতজ্ঞতায় অবনত হয়।

শিক্ষাবিষয়েও ইঁহার বিশেষ প্রশংস-নীয় উন্নতি দৃষ্ট হয়। দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম-কালে ইনি ইউরোপের কয়েকটি ভাষায় সচ্ছন্দে কথা কহিতে পারিতেন। লাটীন ভাষাও জানিতেন, অঙ্কশাস্ত্রেও কতকটা জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতৃ-ভাষার প্রতি

তাঁহার সমধিক অনুরাগ ।

বাল্যাবধিই ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার গভীর ভক্তি লক্ষিত হয় । বাল্যকালেই বাইবেল শাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন, এবং সর্ব্বদাই ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে, এবং ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে ভাল বাসেন ।

গান বাদ্য এবং শিল্পকার্য্যেও তাঁহার বাল্যাবধি বিশেষ অনুরাগ; এবং সেই সকল বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতাও আছে ।

মহারাণী স্বয়ং যেমন সর্ব্ব প্রকারে দুঃখীর দুঃখে বিগলিতা হয়েন, তেমনই আবার উপকারীর প্রতিও সমুচিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন । তিনি ইংলণ্ডের ভাবী অধীশ্বরী বলিয়া,কিম্বা তৎপরে প্রকৃত অধীশ্বরী হইয়াও, তাহা বলিয়া যে লোকে তাঁহার সেবা করিতে বাধ্য, এরূপ কখনও মনে করেন নাই। যে কেহ কোন প্রকারে তাঁহার উপকার করিয়াছে, তাহাকে তাহার বহুগুণে পুরস্কৃত না করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই; পরন্তু, চিরদিন কৃতজ্ঞতাসহকারে তাহাকে স্মরণ করিয়া, সুখে দুঃখে সহানুভূতি জানাইয়া এবং সাহায্য করিয়া, স্বীয় মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছেন। অনেক উপকারী ব্যক্তির স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ পোষণ পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

রাজ্যাভিষেক।

১৮৩৭ সালের ২০ শে জুন রাত্রিকালে রাজা চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যু হয়। পরদিন প্রত্যূষে ক্যাণ্টারবেরীর আর্চ্চ বিশপ, লর্ড চেম্বারলেন এবং রাজবৈদ্য, তিন জনে সেই সংবাদ কেনসিংটনের রাজভবনে মহারাণীকে দেন। রাজার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে ভিক্টোরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরে চারি জনে মিলিয়া সেই স্থানে ভগবানের নিকট জ্ঞান ও শক্তি প্রার্থনা করিলেন।

রাজার বিধবা মহিষীকে সান্ত্বনা দিয়া ভিক্টোরিয়া এক খানি চিঠি লেখেন। তাহার শিরোনামায় "ইংলণ্ডের রাণী সমীপে" এই কথা লেখাতে, এক জন সখী বলিলেন, "তুমিই তো ইংলণ্ডের রাণী"। কোমলহৃদয়া মহারাণী বলিলেন, "বিধবা রাণীকে সে বিষয় প্রথম স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার উচিত নহে।"

২১ শে জুন ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাণী বলিয়া ঘোষিত হইলেন । চতুর্দ্দিকে আনন্দধ্বনি এবং মঙ্গলগীতি উত্থিত হইল। রাজ্যের সমস্ত বড় লোকেরা প্রথানুযায়ী রাজ-সম্ভাষণ করিলেন। মহারাণীর হৃদয় তখন অহঙ্কারে স্ফীত হইল না। যে গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার তাঁহার স্কন্ধে পড়িয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি অস্থির হইলেন, এবং জননীর গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভগবানও সেই শুভ মুহূর্ত্তে নিশ্চয়ই তাঁহার পবিত্র বিনীত রাজমস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছিলেন; সেই আশীর্ব্বাদের বলেই তিনি এই দীর্ঘকাল নিরাপদে রাজ্যশাসনে ও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে সমর্থা হইয়াছেন; তাঁহার ফলেই আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহার জয়ধ্বনি, মঙ্গলকামনা এবং ভক্তি-গাথা উত্থিত হইতেছে।

ইহার এক বৎসর পরে ১৮৩৮ সালের ২৮ শে জুন তারিখে ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবিতে মহারাণীর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বিবাহ।

জর্ম্মনির অন্তর্গত স্যাক্সকোবর্গ প্রদেশের রাজপুত্র আলবার্টের সহিত আমাদের মহারাণীর বিবাহ হয়। ১৮১৯ সালের আগষ্ট মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি সম্পর্কে মহারাণীর মাসাত ভাই। ১৮৩৬ সালে ইনি একবার ইলণ্ডে যান। মহারাণীর রাজত্ব প্রাপ্তিতে ইনি অতি সুন্দর একখানি চিঠিতে নিজের আনন্দ জ্ঞাপন করেন। ১৮৩৯ সালে ইনি পুনরায় ইংলণ্ডে যান। এই সময়ে মহারাণী ও আলবার্টের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হয়। প্রথানুসারে, মহারাণী মন্ত্রিসভায় তাঁহার বিবাহের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। মন্ত্রিসভাও বিনা আপত্তিতে, সন্তোষের সহিত ইহাতে অনুমোদন করিলেন। ১৮৪০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শুভ পরিণয়োৎসব সম্পন্ন হইল। এই বিবাহ যেন মণিকাঞ্চনের যোগ্য হইল। মহারাণী স্বয়ং যেমন গুণবতী, রাজকুমার আলবার্টও তদনুরূপ গুণবান সুপুরুষ ছিলেন। তিনি মহারাণীর উপযুক্ত স্বামীই ছিলেন। উভয়ের মধ্যে চিরকাল গভীর পবিত্র প্রীতি সমভাবে বর্ত্তমান ছিল। নবদম্পতীর উচ্ছ্বসিত প্রেমের নবীনতা একদিনও এক মুহূর্ত্তের জন্যেও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। মহারাণীর গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ জীবনের পরম সহায়, এবং প্রজা-পালন রূপ মহৎ কার্য্যে জ্ঞানবান ধর্ম্মনিষ্ঠ মন্ত্রী স্বরূপ হইয়া, তিনি আপামর সাধারণ সকলেরই প্রীতিভাজন ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। মহারাণীর যে সকল গুণের বিষয় উল্লিখিত হইল, আলবার্টেরও সে সকল গুণের বিন্দুমাত্র অপ্রাচুর্য্য ছিল না। মনুষ্যের দুঃখ বিমোচন করিতে উভয়েরই বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বিদেশী হইয়াও ইংলণ্ডকেই আপনার দেশ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এবং ইংলণ্ডের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে তাঁহার চিরকাল যত্ন ছিল। তিনি অনেক মহৎ কার্য্যে অগ্রণী ও সহায় ছিলেন। ফলতঃ এই বিবাহে দম্পতী, এবং ইংরেজজাতি সকলেই পরম সুখী হইয়াছিলেন। মহারাণী স্বীয় বিবাহিত জীবনে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের আদর্শ দেখাইয়া, আদর্শ পত্নীরূপে পরিগণিতা হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা প্রকাশ করিয়াছেন।

মহারাণীর ৯টী সন্তান জন্মে; তন্মধ্যে ৪টী পুত্র, ৫টী কন্যা। মহারাণী এবং তাঁহার স্বামী উভয়ে অতি যত্নে ও যথেষ্ট পরিশ্রমে সন্তানদিগের লালন পালন ও শিক্ষাবিধান করিতেন। বড় লোকের সন্তানেরা সচরাচর যেরূপ অপরের হস্তেই প্রতিপালিত হয়, পিতা মাতা কেবল অর্থসংস্থান করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়েন, ইঁহারা কদাচ সেরূপ করিতেন না। অসীম স্নেহে সন্তানগণের হৃদয় আবদ্ধ করিয়া, তাহাতে উত্তম জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুনীতি এবং সর্ব্ব প্রকার মানব জীবনের ও পদোচিত কর্ত্তব্যশিক্ষার বীজ বপন করিতেন। সন্তানগণও পিতা মাতার উপযুক্ত পুত্র কন্যা বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য হইয়াছেন। ফলতঃ মহারাণীর পারিবারিক জীবনে, বিধাতার নিয়তি-জনিত মৃত্যু-শোক ভিন্ন, কোন কালে কোন প্রকার দুঃখ বা পরিতাপের কারণ ঘটে নাই। প্রেম, পবিত্রতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি

আনন্দ ও প্রীতিকর মহৎ ভাবসকলে তাঁহার গৃহ স্বর্গোদ্যানের ন্যায় সুখের স্থান।

শোক তাপ।

১৮৬১ সালের ১৬ই মার্চ্চ তারিখে মহারাণীর মাতা ৭৬ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। মাতৃশোকে মহারাণী অতিশয় অভিভূতা হইয়াছিলেন। জননীর মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে মহারাণী, রাজকুমার আলবার্ট এবং কন্যা কুমারী এলিস উপস্থিত ছিলেন।

এই বৎসরের ২৪শে নভেম্বর রবিবার আলবার্ট বাত বেদনায় পীড়িত হয়েন। পীড়িত অবস্থাতেও তিনি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া, নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। ১লা ডিসেম্বর উপাসনাস্থানেও গমন করিলেন। উপাসনার পর হইতেই জ্বর দেখা দিল। ঐ বৎসর ঐ প্রকার জ্বরে পর্টুগালের রাজবংশে অনেকেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা দেখিয়া মহারাণী অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসার যথোচিত সুবন্দোবস্ত হইল;কিন্তু আলবার্ট ক্রমেই দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। মহারাণীর হৃদয়ও সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ৮ই রবিবার আলবার্টের জীবনের শেষ রবিবার। তাঁহার ইচ্ছায় কুমারী এ্যালিস্ বাজনার সঙ্গে অনেক গুলি পারমার্থিক সঙ্গীত গান করিলেন। তৎপরে তিনি করযোড়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একমনে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ১১ই তারিখ রাত্রিকালে বিশ্বাসী আত্মা ভবধাম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের নিকট চলিয়া গেলেন। আলবার্ট প্রথম হইতেই তাঁহার মৃত্যু হইবে জানিয়াছিলেন, এবং মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতও ছিলেন।

স্বামীহীনা হইয়া মহারাণী গভীর শোকসাগরে নিমজ্জিতা হইলেন। এই শোকের আবেগ তিনি বহু দিন পর্য্যন্ত সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ১৮৬৩ সালে প্রিন্সঅব ওয়েল্‌সের শুভ বিবাহোৎসবেও তিনি শোকবস্ত্র পরিধান করিয়াই বিবাহ দেখিয়াছিলেন; কোন কার্য্যে যোগ দেন নাই। শোককালে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নিকট জ্ঞান, শান্তি ও বল প্রার্থনা করিতেন। প্রিন্স আলবার্টের পরলোক গমনে মহারাণীর সকল প্রজাই শোকার্ত্ত হইয়াছিল, এবং অসংখ্য দুঃখী নরনারীগণ হাহাকার করিয়াছিল। এত শোকের মধ্যেও তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্যবলে সর্ব্ব প্রকার রাজকীয় সাধারণ কর্ত্তব্য এবং দরিদ্রসেবার ব্রত সাধন করিয়াছেন;কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ নির্জ্জনেই বাস করিয়াছিলেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মহারাণীর তৃতীয় সন্তান প্রিন্সেস্ এ্যালিস্ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি কি ইংলণ্ডে, কি তাঁহার স্বামীর রাজ্যে, সর্ব্বত্রই সকলের আদর ও প্রীতির পাত্রী ছিলেন।

১৮৮৪ সালে মহারাণীর চতুর্থ পুত্র গুণবান, প্রজাপ্রিয় কুমার লিওপোল্ড্ পরলোক গমন করেন।

মহারাণীর রাজত্ব।

মহারাণীর সুদীর্ঘ শাসনকালে বিস্তর

ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। তাহার বিবরণ প্রদান করিবার স্থান এ প্রবন্ধে নাই। তাঁহারই রাজত্বকালের মধ্যে শিল্প, বাণিজ্য বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য,সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি লোক-সেবা, বিভিন্ন জাতির মধ্যে আত্মীয়তা বর্দ্ধন প্রভৃতি সকল বিষয়েই বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও অত্যাচার তাঁহারই প্রেমের শাসনে অন্তর্হিত হইতেছে। নানা প্রকার লোকহিতকর, জীবহিতকর অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে। রেলওয়ে, ষ্টিমার, টেলিগ্রাম, ডাকবিভাগের প্রসার, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি প্রজামণ্ডলীর হিতকর কত ঘটনা যে ঘটিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের ক্ষমতাতীত। রমণীরত্নের রাজত্বে প্রজাগণের কি বৈষয়িক, কি মানসিক, কি নৈতিক জীবন, সকলই যেন মাতৃস্নেহেই বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতেছে।

ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৮ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতবর্ষ নিজহস্তে গ্রহণ করেন, এবং তদুপলক্ষে যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন,তাহা স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইবার যোগ্য। ভারতবাসী কৃতজ্ঞতা-সহকারে তাহা স্মরণ করিতেছে,এবং চিরদিন করিবে। ১৮৭৭ সালে তিনি "ভারতের সাম্রাজ্ঞী" এই উপাধি গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ সালে তাঁহার রাজত্বের ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ার সময় তাঁহার প্রজামণ্ডলী আনন্দোৎসব করিয়া, তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তির পরিচয় দিয়াছে। আজ রাজত্বের ষষ্টি বৎসর পূর্ণ হইল। নানা দেশে মহারাণীর প্রজাপুঞ্জ সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া মহোৎসবে মাতিয়াছে। ভারতবাসী নানা দুঃখে শোকে জর্জ্জরিত। ভারতের কত নর নারী দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর করাল গ্রাসে প্রাণ সমর্পণ করিতেছে। কত গৃহ আজ শ্মশানে পরিণত;ক'ত অভাগিনী পতিহীনা, পুত্রহীনা, নিরাশ্রয়া। কত শিশু পিতৃমাতৃহীন হইয়া চিরকালের মত পথের ফকীর; কিন্তু আজ সে সকল দুঃখ শোক ভুলিয়া ভারতবাসী, জননি মহারাণি! তোমার সুখে বিভোর হইতেছে! মা! তুমি বহুদূরে রহিয়াছ; সাক্ষাত দেখিলে না আজ তোমার বড় দুঃখী সন্তানেরা তোমার নাম স্মরণ করিয়া কেমন ভক্তি ও প্রীতির অঞ্জলি দিতেছে; কিন্তু এসকল অবশ্যই তোমার কর্ণ-গোচর হইবে। তখন এ হতভাগ্য কোটি কোটি নর নারীকে একবার তোমার সন্তান বলিয়া স্মরণ করিও। ভগবান তোমাকে অতুল সাম্রাজ্যের অধিকারিণী করিয়া, এবং অতুল-নীয় সদ্‌গুণরাশিতে ভূষিতা করিয়া তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন--তুমি এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রকৃতিপুঞ্জের জন্য তাঁহারই নিয়োজিত প্রতিনিধিরূপে মনো-নীতা হইয়াছ। তোমার বিন্দুমাত্র শুভাশীর্ব্বাদ একটিমাত্র শুভকামনার নিশ্বাস, অণুমাত্র করুণার পবিত্র আকাঙ্ক্ষা, নিশ্চয়ই তাঁহার অসীম মঙ্গলাশীর্ব্বাদরূপে তোমার এই সন্তান-বৃন্দের কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম। মা, তুমি চিরদিন দুঃখীদিগের সহায়, শোকার্ত্তের সান্ত্বনাদায়িনী; দরিদ্রের বন্ধু, পীড়িতের রক্ষয়িত্রী, দুর্ব্বলের বল; প্রাণহন্তার প্রতিও, তুমি অসীম দয়ার পরিচয় দিয়াছ; তোমার পদপ্রান্তে পতিত করুণাভিখারী, ত্রিশ কোটি পুত্রকন্যার প্রার্থনা শ্রবণ কর, এবং তাহাদিগকে অভয় প্রদান কর। ত্রিশ কোটি

সন্তান সমস্বরে তোমার ও তোমার পুত্র কন্যা, পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রীর দীর্ঘ জীবন, চির উন্নতি; তোমার রাজ্যের দৃঢ়তা, উন্নতি ও সমৃদ্ধি; তোমার ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ কল্যাণকামনায় ভগবানকে ডাকিতেছে! তুমি একবার সকলকে আশীর্ব্বাদ কর। তোমার নাম, তোমার রাজত্ব ইতিহাসে হীরকাক্ষরে লিখিত থাকুক! যাবৎ পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ তোমার জয়ধ্বনি উচ্চারিত হউক।

ভূমিকম্প।

গত ১২ই জুন অপরাহ্ণে, যে ভূমিকম্প হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ আন্দোলিত হইয়াছে। একশত বৎসরের ভিতরে এমন ভয়ানক ভূমিকম্প এদেশে হয় নাই। কম্প ৫ মিনিট ছিল, কিন্তু উহারই মধ্যে যে কত গৃহাদি চূর্ণ বা ভগ্ন হইয়াছে, এবং কত মানুষের যে অপমৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহা স্থির করা অসাধ্য। কোন কোন স্থানে মাটী ফাটিয়া বালী, কাদা বা গরমজল উর্দ্ধে উঠিয়াছিল; কোথাও মাটী বসিয়া গিয়াছে; কোথাও পাহাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কোথাও বা নদী হইতে প্রকাণ্ড ঢেউ উঠিয়া গ্রাম ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, যে দিনমানে এই ঘটনা ঘটে; নতুবা আরো যে কত লোকের অপমৃত্যু ঘটিত, তাহা ভাবিতে হৃদ্‌কম্প হয়। বড় বড় ধনীর প্রাসাদ, পাকা বাড়ী প্রভৃতির উপরই ভূকম্পের ভয়ানক প্রকোপ; দরিদ্রের কুটীর অনেকাংশে নিরাপদ।

এই ভূকম্প কোথায় আরম্ভ হইয়া কিরূপ ভাবে কোন্ কোন্ স্থানে অনুভূত হইয়াছিল, তাহা এখনও নিশ্চয় জানা যায় নাই। সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কোথাও উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে, কোথাও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে, আবার কোথায়ও বা অগ্নি কোণ হইতে বায়ু কোণের দিকে কম্পন অনুভব করা গিয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সর্ব্বত্র কম্প হইয়াছে। মাদ্রাজে সামান্য কম্প হইয়াছে। বোম্বাই সহরে লোকে কম্প বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু তথাকার মানমন্দিরের বায়ুমান যন্ত্রের (Barometer) এর পারদ অতিশয় দুলিয়াছিল। ভূমিকম্পের কয়েকটী তত্ত্ব এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

ভূমিকম্পের গতি তিন প্রকার। কখনও বা মাটী একবার উপরে উঠে, আবার নীচে নামে; কখনও বা ঢেউয়ের মত চলিয়া যায়; আবার কখনও বা জলের ঘূর্ণীর মত ঘুরিতে ঘুরিতে যায়। কোন একটী স্থান হইতে কম্পন আরম্ভ হইয়া, মিনিটে প্রায় দুই শত মাইল অতিক্রম করিয়া থাকে।

মাটীর নীচে যে স্থান হইত ভূমিকম্প আরম্ভ হয়, তাহার উপরিভাগের স্থান সকলের মাটী প্রথম প্রকারে উঠা নামা করিতে থাকে; এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসকলে জলের তরঙ্গের ন্যায় গতি হয়। জলে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে যেমন একটীর পর একটি ঢেউ উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইতে থাকে, কম্পের আরম্ভের স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে কম্পের গতি ও তদ্রূপ

হয়। সুতরাং আরম্ভস্থানের ভিন্ন ভিন্ন দিকে কম্পের গতি বিপরীত দিক হইতে আসিতেছে বোধ হয়। অর্থাৎ উত্তর দিকের লোকেরা, দক্ষিণ দিক হইতে কম্পন আসিতেছে বোধ করে, এবং পূর্ব্ব দিকের লোকেরা পশ্চিম দিক হইতে আসিতেছে বোধ করে। আবার নানাস্থানে নানা প্রকার মাটী ও প্রস্তরে ঠেকিয়া এই গতিরও পরিবর্ত্তন হয়। আর প্রস্তর, ইষ্টকালয়, মাটী, বালী ও তৃণের ঘর, সর্ব্বত্র সমান কম্পনও অনুভূত হইতে পারে না। ইষ্টকালয় প্রভৃতি দৃঢ় পদার্থ সকল এই গতির সমধিক প্রতিরোধ করে বলিয়া সহজেই চূর্ণ হয়।

কি কারণে যে এইরূপ ভূকম্প ঘটে, তাহা স্থির করা অতিশয় কঠিন। এসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের মত সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল।

১। যতই মাটীর নীচে যাওয়া যায়, ততই গরম বেশী। খুব নীচে এত গরম যে তথায় সকল পদার্থ তরল অবস্থায় আছে। উষ্ণ প্রস্রবণ, আগ্নেয় পর্ব্বত, খনির খাদ হইতে ইহা জানা যায়। প্রতি ৬০ ফিট্ অর্থাৎ ৪০ হাত নিম্নে এক ডিগ্রী করিয়া তাপ বৃদ্ধি হয়। ভূগর্ভের ঐ উষ্ণ তরল পদার্থ কোন কারণে আন্দোলিত হইলেই সেই আঘাতে উপরকার মাটীও কাঁপিয়া উঠে। যদি কোন কারণে কোন স্থানে অত্যধিক পরিমাণে বাষ্প জন্মে, সেই বাষ্পের জোরে উপরকার মাটী ফাটিয়াও যায়; এবং ভূমিকম্প হয়।

২। আগ্নেয় গিরি এবং ভূমিকম্পের আরম্ভস্থান প্রায়ই সমুদ্র বা অন্য কোন জলাশয়ের নিকটে দেখা যায় বলিয়া, অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন যে ভূগর্ভস্থ ঐ সকল উষ্ণ তরল পদার্থে জলের সংযোগ হইয়া বাষ্প জন্মে; সেই বাষ্পের বলেই ভূমিকম্প ঘটে। কোন গর্ত্তের ভিতর দিয়া, অথবা মাটীর ভিতর দিয়া চুয়াইয়া জল প্রবেশ করিয়া নিম্নস্থ গলিত পদার্থের উপর গিয়া পড়ায়, সেখানে গরম লাগিয়া উহা বাষ্প হয়। বাষ্পের পরিমাণ অধিক হইলেই তাহার স্থানাভাব হয়; তখন বাহির হইতে চেষ্টা করে। তাহাতেই আগ্নেয় গিরির উৎপাত এবং ভূমিকম্প হয়।

৩। অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মতে পৃথিবী এক সময় সূর্য্যের মত তেজোময় ছিল। ক্রমে তাপ বাহির হইয়া যাওয়াতে পৃথিবীর উপরিভাগ শীতল ও কঠিন হইয়াছে; কিন্তু ভিতরে এক্ষণও পদার্থ সকল গলিতাবস্থায় রহিয়াছে। উপরে মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থ সকল থাকাতে ভিতরের উত্তাপ অতি অল্পে অল্পে বাহির হইতেছে। উত্তাপে পদার্থসকলের আয়তন বৃদ্ধি পায়, এবং শীতল হইলে আয়তন কমিয়া যায়, অর্থাৎ সঙ্কুচিত হয়। এই নিয়মে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থেরও আয়তন কমিয়া যাইতেছে; সুতরাং ভিতরে ফাঁপা হইয়া, উপরের কঠিন পদার্থেরও একটা অস্থির অবস্থা উৎপাদন করিতেছে। সময়ে সময়ে উপরকার কঠিন পদার্থ ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়া নিম্নস্থ তরল পদার্থের উপর গিয়া পড়ে, এবং তদ্দারা স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে স্থানে এই ক্রিয়া ঘটে, তথায় তরল পদার্থের একটা প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়া, সেই তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত

হইতে থাকে। সেই তরঙ্গাঘাতে উপরিস্থিত মৃত্তিকা কম্পিত হইয়া ভূকম্প ঘটায়। আবার ঐ সকল ফাটের ভিতর দিয়া জল-প্রবেশ করিয়া, ভিতরকার ভয়ানক উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া, মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থের সহিত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আগ্নেয় পর্ব্বতের উৎপত্তি করে।

৪। আকাশমণ্ডলে পৃথিবী যে পথে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাকে কক্ষ বলে। কক্ষের এক স্থানে অসংখ্য উল্কার পুঞ্জ আছে। যখন পৃথিবী ঐ উল্কাপুঞ্জের ভিতর দিয়া যায়, তখন বিস্তর উল্কাপাত হয়; এবং উল্কাপুঞ্জের ক্রিয়া দ্বারা পৃথিবীর উপরে একটা টান পড়ে। উহাতে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ শক্তির ক্রিয়ারও সহায়তা হয়। এই উভয় শক্তির যোগে পৃথিবীর উপরিস্থ মৃত্তিকাদিকে কম্পিত করিয়া আভ্যন্তরীন তেজ নির্গত হওয়াতেও ভূমিকম্প হয়। পৃথিবীর উপর উল্কাপুঞ্জের বৈদ্যুতিক ক্রিয়াতেও যে শক্তির আন্দোলন হয়, তদ্বারাও ভূমিকম্প ঘটিতে পারে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

৫। কোন কোন পণ্ডিত অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে বায়ুর অবস্থার সহিতও ভূকম্পের সম্বন্ধ আছে। কোন কোন স্থানে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির পর বৃষ্টিপাত হইলেই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। কোথাও ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। ভূমিকম্পের সময় যে বায়ুমণ্ডলে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা ব্যারোমিটার অর্থাৎ বায়ুমান যন্ত্রে বিশেষ লক্ষিত হয়। ঐ যন্ত্রের পারদ খুব নামিয়া পড়ে দুই এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন, যে এই উপায়ে কোন্ সময়ে ভূমিকম্প হইবে, তাহাও নির্ণয় করা যাইতে পারে।

ভূকম্পের যে সকল কারণ বর্ণিত হইল, তাহাই যে যথেষ্ট, এবং অন্য কোন কারণ নাই, ইহা বলা যায় না। আর সর্ব্বত্র এক কারণে ভূমিকম্প হয় না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন কারণে এই ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে।

ভূমিকম্পে সময় সময় দেশ, গ্রাম নগর একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। মানুষ যুগ যুগান্তর ধরিয়া যে সকল কীর্ত্তি স্থাপন করে, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সকলই বিনষ্ট হয়। কত দেশ জলাশয়ে ও কত জলময় স্থান স্থলে পরিণত হয়।

মানুষের শক্তি কত ক্ষুদ্র, এবং জীবন কি প্রকার চঞ্চল, তাহাও ভূমিকম্প উত্তম রূপে শিক্ষা দেয়। যাহারা ধন ধান্যে উন্নতি লাভ করিয়া অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়েন, তাহারা একবার দেখুন, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহাদের ধন প্রাণ কিরূপে যুগপৎ কালের কুক্ষিগত হইতে পারে। হয়ত এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে ব্যক্তি ঘোর মদগর্ব্বে অন্ধ হইয়া দরিদ্রের দুর্ব্বল হৃদয়কে নিষ্পেষিত করিতেছিল, একবার কম্পনে সে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেল দেখিয়া সেই দরিদ্র বিস্মিত হইতেছে। কেহ হয়ত বিলাসভোগে ইন্দ্রিয়সুখে বিভোর হইয়া, জীবনের নশ্বরতা ভুলিয়া গুরু ও জ্ঞানীদিগের হিতোপদেশে বিদ্রূপ করিতেছিল, নিশ্বাস গ্রহণ করিতে না করিতে তাহার কলঙ্কিত পাপ জীবনের অভিনয় সাঙ্গ হইল।

কত নরনারী মুহূর্ত্তের কম্পনে অনাথ

অনাথা হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে কত শোকের হাহাকার উত্থিত হইল। কত জীবনের লীলা সাঙ্গ হইল। ভগবানের কার্য্যের তত্ত্ব আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। কিন্তু সর্ব্বদাই যে জীবনের চঞ্চলতা স্মরণ রাখিয়া পরলোকের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত, এ উপদেশ সর্ব্বত্রই প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে।

সংবাদ।

ভূমিকম্প। গত ১২ই জুন, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার,বেলা ঠিক পাঁচটার সময় যে দীর্ঘকালস্থায়ী ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহা কান্তির পাঠক মাত্রেই অবশ্য অনুভব করিয়া থাকিবেন। কলিকাতার রাস্তা দিয়া বেগে গাড়ী হাঁকাইয়া গেলে যেরূপ শব্দ হয়, অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় ঠিক সেইরূপ এক শব্দ হইয়া,পৃথিবী যেন আর পাপভার সহ্য করিতে না পারিয়াই বেগে কাঁপিয়া উঠিলেন। এই ভীষণ কম্পন পূর্ণ পাঁচ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল। যদিও এই দীর্ঘকালস্থায়ী ভূমিকম্পে মেদিনীপুর জেলায় বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই, তথাপি কলিকাতা, উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে যেরূপ সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আমরা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। এই ভূমিকম্পে আসাম প্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছে। শিলং, শ্রীহট্ট, ধুবড়ি, চেরাপুঞ্জী, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি সমস্ত স্থানেই এক খানিও পাকা বাড়ী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আসামের চিফ কমিসনরের রিপোর্টে দেখা যায় যে, এই দুর্ঘটনায় একমাত্র আসামেই অন্ততঃ তিন সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের অফিস প্রভৃতি সমস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরল ম্যাক্যাবি সাহেব বাড়ী চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছেন। চিফ্ কমিশনর হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত সাহেব কর্ম্মচারীই তাঁবু বা নৌকায় বাস করিতেছেন। সাহেবদিগের যখন এই দুর্দ্দশা, তখন দরিদ্র প্রজাদিগের শোচনীয় অবস্থার বিষয় সহজেই অনুমেয়। তাই কি এখানকার ন্যায় এক দিন ভূমিকম্প হইয়া একেবারে থামিয়া গিয়াছে? ২২ শে জুন পর্য্যন্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে— তখনও প্রতিদিন কয়েকবার করিয়া ভূমিকম্প হইতেছিল। একে লোকের ঘর দ্বার নাই; যাহাদের ভাঙ্গা চোরা কিছু আছে,তাহাতেও,পুনঃ পুনঃ কম্পনের ভয়ে কেহ প্রবেশ করিতে পারিতেছে না; তাহাতে আবার বাদলা বৃষ্টি, লোকের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। আসামের ন্যায় না হইলেও, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর, দার্জ্জিলিং, পাবনা, বরিশাল প্রভৃতি উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের নানা স্থানে অধিকাংশ লোকই গৃহহীন হইয়াছেন। এই সকল স্থানেও থাকিয়া থাকিয়া পৃথিবী আট দশ দিন ধরিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন। আসাম ও উত্তর বঙ্গ প্রথম ভূমিকম্পের সময় নানা স্থান ফাটিয়া গিয়া গরম জল ও বালি এবং বারুদের ন্যায় গন্ধ নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল। ময়মনসিংহের অন্তর্গত

জামালপুর নামক এক স্থান হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, সেখানে ঝিনাই নামক নদী একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে, এবং যেখানে নদী ছিল, সেখানে এক্ষণে কেবল কাঁথির বালিয়াড়ির ন্যায় বিস্তীর্ণ বালুকা-স্তূপ সকল পড়িয়া রহিয়াছে। সেই স্থানে কয়েক মাইল ধরিয়া নাকি নদী পুষ্করিণী বা কূপ সকলই শুকাইয়া গিয়াছে। বহরমপুরে একটী বাটীর ছাদে কাঙ্গালী খাওয়ান হইতেছিল, এমন সময় ছাদ শুদ্ধ বাড়ী ভূমিকম্পে পড়িয়া গেল। কলিকাতা মহানগরীতেও শতকরা পঁচাত্তর খানি বাটীর অল্প বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, তবে অধিক লোকের প্রাণহানি হয় নাই। এইরূপে কত স্থানে যে কত লোকের ক্ষতি ও প্রাণনাশ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কোথাও রেলপথ বা পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কোথাও তারের সংবাদের খুঁটী মাটীর নীচে বসিয়া গিয়াছে; কোথাও রাজপ্রাসাদ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় রাজা পর্ণকুটীরে বাস করিতেছেন; নদী সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়াছে; আবার কোথাও বা সমতল ভূমি অতলস্পর্শ জলাশয় হইয়া গিয়াছে; কোথাও শ্যামল শস্যক্ষেত্র বালুকাপূর্ণ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই ভূমিকম্প, দক্ষিণে সুদূর মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি হইতে উত্তরে সিমলা শৈল ও দার্জিলিং পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল। কাশীও রক্ষা পায় নাই।

"কান্তি"র ক্ষুদ্র কলেবরে এই দুর্ঘটনার কোনও বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশ করা অসম্ভব। আমরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে কলিকাতার শেরিফ মহাশয় ভূমিকম্পে বিপন্ন নিঃস্ব ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ একটী তহবীল খুলিয়াছেন ও মহামান্য ছোটলাট মেকেঞ্জী বাহাদুর ঐ তহবীলে এক সহস্র মুদ্রা চাঁদা দিয়াছেন। যদিও কাঁথির লোক নানা প্রকারে ভাল মন্দ তাঁহারা এ সময় চুপ করিয়া থাকিবেন না। যাঁহাদের কিছু আছে, তাঁহাদের সৎপাত্র দানের এরূপ সুযোগ আর হঠাৎ মিলিবে না।

হীরক জুবিলী। বিগত ২২শে জুন মঙ্গলবার, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের ষষ্টিতম বর্ষ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে সেদিন কাঁথি সহরে মহা ধুমধামের সহিত উৎসব হইয়া গিয়াছে। কাঙ্গালীদিগকে চাউল পয়সা ও বস্ত্রদান, ভগবদারাধনা, নৃত্য গীতাদি আমোদ, বাজী পোড়ান ও আলোক-দান প্রভৃতি উৎসবের কোনও অঙ্গহানিই হয় নাই। বিশেষতঃ সেই সময় মেদিনীপুরের কালেক্টর ফ্রেঞ্চ্ বাহাদুর কাঁথিতে থাকায় দ্বিগুণ উৎসাহে কাঁথিবাসীগণ উৎসবে মত্ত হইয়াছিল। কাঁথির ন্যায় তম্‌লুক ও ঘাটালেওএই উপলক্ষে মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন খণ্ডরুই রাজবাটীতে, কাজিলাগড়ে এবং মহিষাদলের রাজবাটী প্রভৃতি স্থানে এই উপলক্ষে খুব আড়ম্বর হইয়াছিল। মেদিনীপুরেও আনন্দোৎসব বড় কম হয় নাই। বিশেষতঃ মহারাণীর দুইখানি প্রতিমূর্ত্তি গাড়ীতে লইয়া চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে জয় জয় নাদে নগরভ্রমণ অতি সুদৃশ্য ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এই জুবিলী উপলক্ষে মেদিনীপুর, কাঁথি, তম্‌লুক, ঘাটাল, মহিষাদল, কাজিলাগড়, খণ্ডরুই প্রভৃতি সর্ব্বত্রই কাঙ্গালীভোজন বা বিদায় হইয়াছে। দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। তমলুক, ঘাটাল, ও মেদিনীপুর হইতে সুন্দর বাক্সে করিয়া আনন্দসূচক পত্র মহারাণীর নিকট প্রেরিত হইয়াছে। কাঁথি হইতে বড়লাটের হস্ত দিয়া আনন্দপ্রকাশক তারের সংবাদ গিয়াছে। দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ও আধিব্যাধিতে জর্জ্জরিত হইয়াও ভারতবাসী

বাটী জীর্ণ হইয়া যাওয়ায় কলিকাতায় এবার মহারাণীর সম্মানসূচক তোপ বন্ধ হইয়াছিল। এই উৎসবে গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের উপর নানারূপ কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন। সমগ্র ভারতবর্ষে কুড়ি হাজারের অধিক কয়েদীকে খালাস দিয়াছেন। যে সকল নিঃস্ব দেনী এক শত টাকার ন্যূন ডিক্রীর দায়ে দেওয়ানী জেলে পচিতেছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের দেনার টাকা ডিক্রীদারকে দিয়া তাহাদিগকে খালাশ দিয়াছেন। দ্বীপান্তর-বাসী তিন শত আশি জন কয়েদী দেশে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি পাইয়াছে। যে সকল দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোক গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত কার্য্যে খাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহারা দুইদিন বিনা পরিশ্রমে বেতন পাইয়াছে। মহারাণী স্বয়ং ভূমিকম্পে দুঃস্থ প্রজাগণের প্রতি সহানুভূতিসূচক তারের সংবাদ ও জবিলী উপলক্ষে তাঁহার প্রজা-বৃন্দকে ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন। আমরা মহারাণীর আশীর্ব্বাদ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতেছি। ভারতের রাণী সাক্ষাৎ দেবীস্থানীয়া; তাঁহার আশীর্ব্বাদে ভারতবাসী অকূল বিপদ্-সমুদ্র পার হইতে পারিবে, এরূপ আশা রাজভক্ত প্রজা করিতে পারে।

ডাকাইতি। ময়না থানার অন্তর্গত লোকপুর ও কালিকাদুয়ারী গ্রামের যে দুইটী ডাকাইতির বিচার দায়রায় হইতেছিল, তাহাতে মানু মাজরা, তিতু মানা, বিপিন বর সেখ সুলতান, সেখ জামির ও কানু মাজুয়ার দশ বৎসর করিয়া কয়েদ হইয়াছে। এই উভয় ডাকাইতিই আমাদের কাঁথির সুযোগ্য ইন্স্পেক্টর বাবু গঙ্গানারায়ণ বিশ্বাস কিনারা করিয়াছেন। দোরো পরগণার শিবরাম নগরে উদব মানার বাটীতে ১৮৯৭ সালের ১০ই মার্চ্চ তারিখে যে ডাকাইতি হয়, তাহাতে করিয়া এবং উদব মাজিলার চারি বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। যদিও কতকগুলি ডাকাতের এরূপ গুরুদণ্ড হইয়া গেল, তথাপি এখনও মেদিনীপুর জেলার ডাকাইতি একবারে থামে নাই। এই সেদিন মেদিনীপুর হইতে আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী সরডিহা গ্রামে একজন পশ্চিম দেশীয় কণ্ট্রাক্টরের বাসা বাটীতে এক ভয়ানক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এই ডাকাতিতে উক্ত কণ্ট্রাক্টর ও অপর কয়েক জন লোক ডাকাত দিগের চালিত বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া-ছিল। আবার এই জুন মাসে নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত কুলাপাড়া বাজারে রঘু নাথ সাউর দোকান বাটীতেড়্যাকাতি হইয়া গেল। ডাকা-ইতির জ্বালায় মেদিনীপুরবাসীগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ অরাজকতার সত্বর প্রতিবিধানের জন্য গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

মেদিনীপুর খণ্ডরুইএর রাজবাটীতে হীরক জুবিলি বিশেষ সমারোহের সহিত হইয়াছে। রাজা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র মহাশয় একটী জুবিলিমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া স্থানীয় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করতঃ উৎসব করিয়াছেন। প্রথম বিদ্যালয়ের বালকেরা ভারতেশ্বরীর গুণ কীর্ত্তন করিয়া সঙ্গীত করে। তৎপর জনসাধারণকে জুবিলির তাৎপর্য্য বুঝাইয়া ও ভারতেশ্বরীর গুণ বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা হয়, এবং অবশেষে মহারাণীর দীর্ঘ জীবনের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয়। দরিদ্রদিগকে পয়সা ও বস্ত্রদান এবং রাজবাটী আলোক মালায় সুসজ্জিত করিয়া, এবং আতস বাজী পোড়াইয়া উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

সেদিন এখানে কাদাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। অনেকে ইহা অশুভ লক্ষণ বলিয়া ভাবী বিপদের আশঙ্কা করিতেছেন।

ঝাড় গ্রাম রাজ ইষ্টেট্। ঝাড় গ্রামের বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর ময়ূরভঞ্জের রাজার নিকট হইতে যে কর্জ্জ গ্রহণ করিয়া ছিলেন তাহা সুদে আসলে আড়াই লক্ষ টাকা হইয়াছে। ঋণ পরিশোধের অন্য উপায় নাই দেখিয়া তিনি আমাদের মেদিনীপুরের সুযোগ্য ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তাঁহার জমিদারীর সমস্ত জোৎ মৌরসী করিয়া দিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। ইহাতে প্রায় তিন লক্ষ টাকা আদায় হইবে। ক্ষীরোদ বাবু স্বয়ং এই কার্য্যটি উদ্ধার করিবার জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিতেছেন। ভগবান্ ক্ষীরোদ বাবুর মঙ্গল করুন।

কেরোসিনে বিপদ। ভগবান্‌পুর এলাথায় ঝাঁঝরা গ্রামের মানগোবিন্দ বাগের বাটীতে কেরোসিনের কেনেস্তারায় আগুন লাগিয়া মানগোবিন্দের একটি কন্যা প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এবং অপর তিনটি বালক বালিকা সংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

আপীল খালাস। কেশপুর থানার আনন্দপুর গ্রামের ভীম মানা ডাকাইতির মাল লওয়ার অপরাধে মেদিনীপুরের জজসাহের বাহাদুর কর্ত্তৃকছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। হাইকোর্ট আপীলে তাহাকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন।

মানহানি মোকদ্দমা। শ্রীনাথ চন্দ্র মাইতি তমলুকের মোক্তার বাবু ভারতচন্দ্র মাইতির নামে নানারূপ মিথ্যা অপবাদ দিয়া জজ্ সাহেব বাহাদুরের বরাবর এক দরখাস্ত করে। জজ্ সাহেব তদন্ত করিয়া উক্ত দরখাস্তের লিখিত বিবরণ মিথ্যা বলিয়া সাবাস্ত করিয়া ভারত বাবুকে শ্রীনাথের নামে মান হানির মোকদ্দমা করিবার আদেশ দেন। মোকদ্দমা মেদিনীপুরে হইয়াছিল। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ম্যাকার্টী সাহেবের বিচারে শ্রীনাথের ৬ মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড ও পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। ঐ পাঁচশত টাকার মধ্যে তিনশত টাকা ভারত বাবুকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেওয়া হইবে। শ্রীনাথ এই রায়ের বিরুদ্ধে জজ্ বাহাদুরের নিকট আপিল করিয়াছে।

জাম্বনী রাজ ষ্টেট্। পূর্ণ চন্দ্র বল ও ঈশ্বর চন্দ্র বল জাম্বনীর রাজা ছিলেন। পূর্ণ চন্দ্রের বিধবা রাণী পার্ব্বতী কুমারীর সহিত ঈশ্বর চন্দ্রের নাবালক সন্তানের রাজত্ব লইয়া মোকদ্দমা চলিতেছিল। মহামান্য হাইকোর্টের বিচারে রাজত্ব ঈশ্বর চন্দ্রের নাবালক পুত্রেরই প্রাপ্য বলিয়া স্থির হইয়াছে; এবং পার্ব্বতী কুমারী উত্তমরূপ খোরপোষ পাইবেন এইরূপ আদেশ হইয়াছে। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে পার্ব্বতী কুমারী বিলাত আপিলের জন্য ওয়াট্‌সন কোম্পানির নিকট কার্জ্জ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। জাম্বনী অতি প্রাচীন রাজত্ব, জেদের বশবর্ত্তী হইয়া মোকদ্দমার খরচার দায়ে এই রাজত্ব বর্ত্তমান্ রাজবংশ হইতে হস্তান্তর হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা আশা করি পার্ব্বতী কুমারীর আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে এবিষয়ে সৎপরামর্শ দান করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইবেন।

প্রথম মুন্সফি আদালত।

১৫ ই জুলাই নিলামের দিন।

দেঃ নং ডিঃ দাঃ নাম	দেঃ নাম	সাকিন	পরগণা	কভটাঃ	কয় বঃ	কঃ বি
১৩৭ রামধন পণ্ডা	সেখ উম্মু	বেতলিয়া	দক্ষিণ মাল	৭২॥/৫	১	।৭
১৩৩ রাই তারক দে	মঃ স্বর্ণমী দাসী	জগন্নাথ পুর	কেওড়ামাল	২৪৯/১০	৮	১॥৭॥৵
১৩৫ বৈদ্য নাথ মণ্ডল	কিন্তুদাস	সারসা	মাজনামুঠা	৬২॥৵০	১	৮১
১৩৮ জগন্নাথ সাউ	বৈদ্য নাথ মণ্ডল,	ঐ	ঐ	১৪৪৵৫	১	১/৪॥০
১৩৯ বৈদ্য নায়েক	বিপ্র নায়েক	বসুদেব পুর	ঐ	১৯/১৫	৬	১০
১৪৩ গঙ্গা নারায়ন রায়	ইন্দ্র নারায়ন দাষ	দরুয়া	ঐ	১১৫।৵০	১	/৫
১১৮ চন্দ্র মোহন অগস্তি	পিতু পাল	বসন্ত্যা	ঐ	৬৮৬।৫		
		দৌলতপুর	বালিজোড়া		৪	১০৮০

১৩৪ নং দেঃ দ্বারিকা নাথ দাস ডিঃ, হর প্রসাদ মণ্ডল দেঃ সাং জাউদিবাড় পং মাজনা মুঠা ২২৮॥১০ দেঃ গ্রাঃ ৪ বঃ ১০/ বি।

৩৪ ঐ কুঙর লাল সুপকার ডিঃ, নব কুমার সুপকার দেঃ, সাং বিচালিয়া পং মাজনা মুঠা ৫৭॥৵০ দে গ্রাঃ ২বঃ ৩/০ বি।

১২০ ঐ পামনী চৌধুরাণী ডিঃ, শিব নারান পট্টনাএক দেঃ, সাং মাসিড়্যা পং ভুঞা মুঠা ১১৮।৫ দেঃ গ্রাঃ ২বঃ ৩।২॥০ বি।

৮০ ঐ ডিঃ সুন্দর পরামানীক দেঃ, সাং বিষ্ণুপাত্র বাড় পং মাজনা মুঠা ১৭৩।৵৬ দেঃ গ্রাঃ ২বঃ ৪।১বি।

৮১ ঐ কুঞ্জ নারায়ন দাস ডিঃ নৃপ বল্লব বেরা দেঃ, সাং মকুন্দ পুর পং মাজনা মুঠা ২৪৮/১৫ দেঃ গ্রাঃ ১বঃ ৮৩ কাঃ।

৮০ ঐ বিশ্ব নাথ দাস ডিঃ নৃপ বল্লভ বেরা দেঃ, সাং মকুন্দ পুর পং মাজনা মুঠা ২৩৮৵০ দেঃ গ্রাঃ ১বঃ ৮১ কাঃ।

১৫৩ ঐ মহেন্দ্র নাথ দিণ্ডা ডিঃ রাম প্রসাদ মণ্ডল দেঃ সাং সাপাই পং ভাঁইটগড় ১৮৫।০ মৌঃ মৈশালী পং মাজনা মুঠা ৩বঃ ২।৭ বিঃ।

১৫৭ থাং সর্ব্বেশ্বর নন্দ দাষ গোস্বামী ডিঃ চাঁপা বেওয়া দেঃ, সাং গোপী বল্লভ পুর পং নয়াবসান ৪॥৵০ মৌজে রামচক পং মাজনামুঠা ৩বঃ ১।১১ বি।

১৪০ ঐ নরেন্দ্র নাথ পাহাড়ী ডিঃ মৃত্যুঞ্জয় মাইতি দেঃ সাং বিরূল্যা পং কিঃ শিপুর ৪৩৫ দেঃ গ্রাঃ ১বন্দ ৩৮১৵০ বি।

১২৭ ঐ সেক্রেটারী সাহেব ডিঃ শ্যামানন্দ দাস দেঃ, সাং কুলমারি পং মাজনামুঠা ১১৮৵০ দেঃ গ্রাঃ ৬বঃ ৫৮/১০ বি।

১৩৬ ঐ তারা প্রসাদ ধাউড়্যা ডিঃ মধু সুদন দাষ দেঃ সাং কুদভেড়ি পং মাজনামুঠা

কবি রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১৪ পৃষ্ঠার পর।

করুণাময়ী মহামায়ার প্রতিএকান্ত অনুরক্তা ছিলেন। তিনি সামান্যা রমণীর ন্যায় সন্তান সন্ততি লইয়াই বিব্রত থাকিতেন না; অলঙ্কার অলঙ্কার করিয়া অসার দেহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের নিমিত্ত লালায়িত হইতেন না। তাঁহার হৃদয় উন্নত ছিল; এবং যাহাতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ও স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে যত্নবতী ছিলেন। তিনি বহুকাল বর্দ্ধমানে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, এবং তাঁহার নিকটে অনেক বালিকা সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে।

করুণাময়ীর রচিত গান হইতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব ও নশ্বর জীবনের প্রতি অনাস্থার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। "অসার সংসারে সকলই ছায়াবৎ; একা আসিয়াছি একাই যাইতে হইবে; কেহ কাহারও সহায় হইবেনা" এই মূলমন্ত্রই তাঁহাকে পরিচালিত করিত। এই ভাব কিরূপে তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল, তাহা স্থির করা অসম্ভব। তবে তাঁহার পিতা তত্বজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সম্ভবতঃ পিতার উপদেশেই করুণাময়ী এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন। এই মন্ত্রবলেই সুরট মল্লার রাগিণীতে করুণাময়ী রচনা করিয়াছেন—

মন আর মিছে কর অভিমান
ভবপার বড় ভার জান না সন্ধান।
দেহ হবে ছিন্ন ভিন্ন, গৃহাদি হবে অরণ্য,
সঙ্গী কেহ নহে অন্য, একা হবে প্রাণ।
তুমি বা কে কে তোমার, তুমি দুঃখ ভাব কার
ত্রিভুবন অন্ধকার মুদিলে নয়ন।
এই যুক্তি সার কর, তারিণীচরণ ধর
যাহাতে ভবসাগর পাবে পরিত্রাণ।
সাংসারিক কর্ম্ম সব অনিত্য মায়া-উদ্ভব
সব ত্যজি ভাব শিব উক্তি গুণ গান।
ভক্তিভাবে দুর্গা বল, না ভাবিহ কালাকাল
করুণার হবে সফল জনম নিদান।

রমাপতিরও রচিত এই ভাবের অনেকগুলি গান রহিয়াছে। তিনি খাম্বাওতি রাগিণীতে গাহিয়াছেন—

তুমি কেন এত বিমোহিত মায়াবশে ?
মন আমার, অজ্ঞান দারাসুত
নহে অনুগত কিছুদিন গত
হ'লে নিকটে কাল যেমন কাল
মায়ামোহে পরকাল নাশে।
সকল জীবের গতি, ন পুরুষ ন প্রকৃতি,
ন জল ন স্থল স্থিতি নৈব আকাশে;
ন দেহি ন দেহহীন, ন প্রবীন ন নবীন,
অথচ মহিমা দশ দিশে পরকাশে;
অকপট ভাবে ভাবি মহিমা তাঁহার
ভজন সাধন কর সেই অবিনাশে।
ইত্যাদি।

রমাপতি ও করুণাময়ী উভয়েই বলিতেছেন "মায়া মোহে মুগ্ধ হইওনা, স্ত্রী পুত্র স্বামী কেহই আপনার নয়; এক আদ্যাশক্তিই মূল, তাঁহারই সেবায় জীবন উৎসর্গ কর"। কিন্তু এই

বৈরাগ্য হৃদয়ে লইয়াও কি দম্পতীর কেহ কাহারও প্রতি বীতরাগ ছিলেন ? তাঁহাদের গভীর প্রেমের ইয়ত্তা ছিলনা, অথচ সেই সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ভক্তিরও সীমা নাই। নির্লিপ্ত ভাবে, অনাসক্ত হৃদয়ে সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারা কি মধুর, কি মনোরম ! আমরা করুণাময়ীর রচিত আর একটী শ্যামাবিষয়ক গীত পাঠককে নিম্নে উপহার দিলাম। করুণাময়ীর সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি এই সকল গান হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

দেশ মল্লার— কাওয়ালী।

করুণাময়ি করুণা কর কামিনি,
ত্বং কমলা কুশলকারিণী।
করালকংস অরি কাত্যায়নী,
কালী কৃতান্তদলনী,
কলুষ-কলস ধ্বংস কারিণী।
কাশীনিবাসিনী কৈলাসী
করীবরসংহারকবাহিনী
কুল কুণ্ডলিনী কপালিনী
করুণার্দ্রী করুণাময়ীর গতিকারিণী॥

রমাপতি বাঙ্গালা, হিন্দি, সংস্কৃত ও উড়িয়া ভাষা জানিতেন, এবং সকল ভাষাতেই গান রচনা করিয়াছেন। শুনা যায়, কাঁথিতে অবস্থিতিকালে তিনি উড়িয়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত বিভাস একতালার একটী উড়িয়া গান নিম্নে প্রদত্ত হইল। প্রকৃত উড়িষ্যাবাসীর ন্যায় তাঁহার কেমন সুন্দর উড়িয়াগান রচনা করিবার ক্ষমতা ছিল, পাঠক এই গান হইতে তাহা অনুমান করিতে পারিবেন।

এই কি ঘটিল শেষ গো এই কি
ঘটিল শেষ।
এবে ডুবিল মোহরি দেশ॥
সুজেঁড় সবু যাই বুসিলা,
খৃষ্টান কঁাইন্থ আসি পসিলা,
রহি রহি সবু সুখ খসিলা
বড়িল কুরঙ্গ রস গো॥ ১
নাম জগন্নাথ বিসরই,
হরিনামামৃত তুঁড় ন লই,
অখাদ্য খবাকু বঙ্গাড়ি হই
হেলানি ইশুর দাস গো।
গুরুবাক্য সব ধূর পকাই,
পাপভণ্ডারর দ্বার মুকাই,
ধর্ম্ম সনাতনকু ঢাকাই,
মজিলা দত্ত কৈলাশ গো॥
বাপর মায়র দুখ ন ভাবি
আপন বন্ধুজন ন সেবি,
মনমত দেখি করিলা বিবি
ছড়ি নিজ গৃহবাস গো॥
হেন কথা নাকি কহিছি কেহি
কেভি নাহি শুনিথিব অম্মোহি
কেরাপট গোরাচাঁদরে লই
হেলার করিলা বশ গো।
রমাপতি ইবে কহিছি শুন
অকারণ কেনি প্রমাদ গণ
অও যেতে হবে সুদিন কুদিন
সবুত ভাগ্যের দোষ গো।

রমাপতি হিন্দী ও অন্যান্য ভাষাতেও অনেক গান রচনা করিয়াছেন। টপ্পা গজল প্রভৃতি তাঁহার রচিত অনেকগুলি গান রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই সকল গানের উল্লেখ করা সম্ভব নহে। নিম্নে একটী

ক্ষুদ্র গান দেওয়া গেল।

টুক

ভৈরবী— তাল চৌতাল।

ভুম্মে জঁও খসি ঝিকোর
ঝাঁক ঝাঁক ঝুঁকি চকোর
চন্দ্র চাঁহে দেয় অঁকোর
তেরোহি বয়ানমে।
ইন্দ্র গজ লজত এরি
দেখ চালচলন তেরি
নয়ন মৃগ হাম্মি যাওত
তেরোহি নয়নমে।

রমাপতি ১২৬৯ সালে ' মূলসঙ্গীতাদর্শ ' নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বহু যত্ন ও পরিশ্রমে যে সকল উৎকৃষ্ট রাগ রাগিণী শিক্ষা করিয়াছিলেন, কতকগুলি গান সেই সেই রাগ রাগিণীতে বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করেন। অপর কতকগুলি হিন্দী সঙ্গীতের অনুকরণে নূতন গান রচনা করেন। ঐ সকল গান ও মূল আদর্শ সঙ্গীত সাধারণের গোচর করাই ঐ গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐ সকল গান কালে বিলুপ্ত হইয়া না যায়, এই আশয়ে "কতিপয় মহোদয়ের অনুরোধে" ইহা প্রণীত হইয়াছিল। তিনি ১২৬৯।২০ শে মাঘ তারিখে এই পুস্তকের বিজ্ঞাপন লিখিয়াছিলেন, এবং তাহাতে ঐ উদ্দেশ্য প্রকাশিত রহিয়াছে।

গ্রন্থের প্রথমাংশেই এক একটী করিয়া হিন্দী গান, এবং কোথাও তাহার বঙ্গানুবাদ, কোথাও অবিকল সেই সুরের গান লিখিত হইয়াছে। রমাপতি অনুবাদকুশল ছিলেন, এবং নিপুণতার সহিত অনেক গানের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। নীচে একটি গানের বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বন্ধনীর মধ্যে মূল সঙ্গীত দেওয়া হইল; পাঠক মূলের সহিত অনুবাদের তুলনা করিয়া রমাপতির আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে পারিবেন।

হিমাল কাওয়ালী।

ভব দরশন লোকালয়।
(এ জগ দরশন মেলা হেয়)
যদি এলে হেথায়, প্রণয় প্রেম সহবাস,
হর্ষ বিনয় প্রিয় ভায়,সদাশয়ে দানকরমন,
কারণ শুন এক ধামে সবাকার লয়।
(জও তু আয়া এঁহা, তো কুছ্ দেখ,
ভাল চল ফের মেল জুরি হাস
বোল বতালে লে খা পি দে; কারণ
সব কো এক ঠোর সখেলা হেয়।)
দেহমন্দির হের অভ্রান্তে,
এ কলেবরে কে হে বিরাজ করে
জ্ঞানাপাঙ্গে বিলোক একান্তে
সে বিরাজিত জন কিরূপ ধরে,
ধন্য সে বিচিত্র সুচিত্রকরে,
যে সৃজন করিয়াছে স্বীয় করে,
হাব ভাব রূপ আর লাবণ্য
সব ভিন্ন ভিন্ন রূপময় ॥ ১
(ইস্ মন্দির বিচ্ নিরথ তু
ইস্ মূরতি মে ক্যা সুরতি হেয়,
হৃদেমে তনক পর তু ইস্ সুরতি মে
ক্যা মূরতি হেয়।
ধন্য হেয় উস কারিগরকো,
জেন্ আপনে হাত বনায়া হেয়,
সব রঙ্গ রূপ আর যোবন মে

আব সবকো এক নবেলা হেয়।)
ভবে দেখ আপ্ত অন্তরঙ্গে,
আবদ্ধ পরস্পর সংসূত্রে,
কেহ পিতর পুত্র প্রসঙ্গে,
পিতৃব্য কেহ ভ্রাতুষ্পুত্রে,
কেহ প্রভু সম্পত্ত্যাভিমানে,
কেহ দাস দৈন্য অনুমানে,
কেহ পীর মুরিদ ভাষা ভিন্নে,
কেহ গুরু সেবক পরিচয় ॥
(এহাঁ দেখ জোতু আপসমে,
এঁহা এক এক সো হেয় নাতা,
কোই বাপ বনা কোই বেটা,
কোই চাচা ভাতিজা কহলাতা,
কোই মিঞা আপনে কো জানে,
কোই দাস আপকো মানে,
কোই পীর মুরিদ কহলাতা হেয়,
আ্যা কোই গুরু কোই চেলা হেয় ॥)
পূর্ণ আশয়ে হের নিষ্পন্দে
যাহার প্রতি যত মায়া স্নেহ,
বৈভব তোমার নিঃসন্দে,
পরিবার নহে আপনার কেহ;
অতএব মন নিবেদন ধর,
শুভ কার্য্য সমাধান শীঘ্র কর,
বিশ্বাস নাহিক নিশ্বাসে,
গমন অনতিদূর হয় ॥ ৩
(দেল ভরকে দেখ সকুচমতি,
এঁহা জাকো জো জে মায়া হেয়,
এহ তেরি জিনিস জমা হেয়,
আর সগরো লোগ পরায়া হেয়;
পর এত্নি কহনা মান মেরা,
আব কর্না হেয় জো জলদি কর
টুক দের নাহি এহ দম কি
আওর জেয়াদা নহি মন জেলা হেয় ॥)
সময় গত হলে নির্ব্বন্ধ,
ইহকাল সলগ্ন নিমগ্ন হবে,
বন্ধুত্ব আদি সব সম্বন্ধ,
পরিণামে ধ্রুব এইখানে রবে।
এ শরীর যে জলধির বিন্দু,
নিশ্চয় সে হিল্লোলেতে মিলিবে,
ন বিবাদ বিরুদ্ধ আপত্য
ন বিকার কলহ অপ্রণয় ॥ ৪
(জেস দম আপনে আপনে রস্তে
ওয় এহাঁকে এহাঁ গহ জাওঙ্গে,
দোস্তি নেসবৎ নাতে সব,
ওয় এহাঁকে এহাঁ রহে যাওঙ্গে,
এহ বুন্দো জেস দরিয়া কি,
সব মৌজসেঁ ওঁহা মেল যাওঙ্গে,
ন টেণ্টা হেয় ন বখেড়া হেয়,
ন ঝগড়া হেয়, ন ঝমেলা হেয় ॥)
মিঞা মৌজ বর্ণিত এ গীত
আছিল প্রণীত এ ভাষান্তরেতে,
সহসা রমাপতি দ্বিজবর
করে অনুবাদে বিনিময় ॥ ৫

ইমন—একতালা।

দিম দারা দ্রেতেলেনা তানা দেম্রে তদানি দো, তদানি তানা দরেনা দিম।
দিম তাদিম তানা ওদানা তারে তদে দানি। ইত্যাদি;—

এই সুরে রমাপতি রচনা করিয়াছেন;
কার বাঁশী বাজিল বিপিনে
শুন সজনি গো
অমনি নারি গো রহিবারে আর ঘরে
বুঝি বনে এলেন বনমালী।

চল চল গো সজনি ত্বরা চাল
বলি ক'রে কৃতাঞ্জলি ॥
রাধে ত্বং পরিধেহি নীল বসন মপি ভূষণং
মুঞ্চ মঞ্জীর মধীর মুখর মতি ভীষণং ॥
কর গো চিকুর বন্ধন,
পর গো নয়নে অঞ্জন,
রমার বচন শুন গো,
ঐ শুন শ্রীরাধা বলিয়া বাজিছে মুরলী ॥

এই সকল, এবং রমাপতির রচিত অন্যান্য গানের প্রকৃত সৌন্দর্য্য সুগায়ককর্ত্তৃক গীত না হইলে বিকাশিত হয় না। যে গান কবিতার ন্যায় পাঠ করিলে শ্রুতিকঠোর মনে হয়, তাহাই আবার গায়কের মুখে শুনিলে মোহিত না হইয়া থাকা যায় না।

মূলসঙ্গীতাদর্শের অধিকাংশ গানই রমাপতির রচিত বা অনুবাদিত। বাকি গান গুলির মধ্যে কতকগুলি করুণাময়ীর, এবং ২।৩টী তাঁহার পিতা গঙ্গাবিষ্ণু ও পিতামহ রামসুন্দরের রচিত।

পারী নগরের ভীষণ অগ্নিকাণ্ড।

পারী নগরে সম্প্রতি এক লোমহর্ষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি উচ্চ বংশীয়া মহিলার উদ্যোগে সেখানে একটি সখের বাজার বা "দাতব্য বাজার" বসিয়াছিল। মহিলাগণ নিজে নিজেই দোকান সাজাইয়া বসিয়াছেন। মেলায় যাহা লাভ হইবে, তাহা দুঃখীদিগকে দান করা হইবে। বড়বড় জমিদার ও ওমরাও দাতব্য বাজারের দ্রব্য কিনিবার ছলে দান করিতে গিয়াছেন। বাজারটি কাষ্ঠনির্ম্মিত। বাজারের এক স্থানে আতস বাজি দেখান হইতেছে। বাজারে কম বেশী ১২০০ লোক খরিদ বিক্রয়ে ব্যতিব্যস্ত। সম্ভবতঃ বাজীর আলোকের উত্তাপে ছাদে আগুন ধরিল। "আগুন" "আগুন" বলিয়া হৈ চৈ শব্দ পড়িয়া গেল! ১২০০ লোক আপন আপন প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টায় উন্মত্তের ন্যায় দ্বারের দিকে ধাবিত হইল। ঠেলা ঠেলিতে কয়েকটী মহিলা ভূমিতে পড়িয়া গেলেন; পশ্চাৎ হইতে জনস্রোত তাঁহাদের উপরে আসিয়া পড়িল। পদপিষ্ট মহিলাগণের আর্ত্তনাদ শুনিয়া একব্যক্তি তাঁহাদের উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। অতি কষ্টে যাঁহারা বাহির হইতে পারিলেন, তাঁহাদিগের কাহারও বস্ত্র, কাহারও শিরস্ত্রাণ, কাহারও শ্মশ্রু অগ্নিদগ্ধ। একটি মহিলা কোনও মতে অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হইয়া রাজপথে আসিয়া পড়িলেন। যেন হঠাৎ মনে পড়িল কাহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছেন। যাই মনে পড়া, অমনি রমণী পাগলের ন্যায় বিহ্বল হইয়া, প্রাণের মায়া ভুলিয়া গিয়া, পুনরায় প্রজ্বলিত কুণ্ডে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু আর বাহির হইতে পারিলেন না। ব্যারন ডি মেক ও তাঁহার ভগিনীও এই বিপন্ন অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। ব্যারন স্বয়ং কোন মতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, ভগিনী আসিতে পারেন নাই; দেখিয়া বীর পুরুষের ন্যায় পুনরায় অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। ভগ্নী মনে করিয়া একটি মহিলাকে অগ্নি হইতে উদ্ধার করিয়া

বাহিরে আসিয়া দেখেন ভগ্নী নহে। পুনরায় ক্ষিপ্তের ন্যায় জলন্ত বাজারের মধ্যে ঢুকিলেন এবং আর একটি মহিলাকে ভগ্নী ভাবিয়া উদ্ধার করিলেন; সেবারও দেখিলেন ভ্রম। এইরূপে, আপন ভগিনী মনে করিয়া সাতবারে তিনি ৭টি স্ত্রীলোককে উদ্ধার করিলেন। শেষবার একবারে নিস্তেজ ও বলহীন হইয়া পড়িলেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, জলন্ত দরজার সম্মুখে ভগ্নী প্রাণপণে আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু তখন আর একটুও নড়িবার শক্তি নাই। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার চক্ষের উপর ভগ্নী জলন্ত অঙ্গারস্তূপে প্রোথিত হইয়া গেলেন।

অষ্ট্রীয়ার সাম্রাজ্ঞীর সহোদরা ডচেশ্ অফ্ এলেন্ সন্ অমানুষিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। যখন সকলেই আপন আপন প্রাণ লইয়া পলাইতেছেন, তিনি অলৌকিক ত্যাগস্বীকার করিয়া, আপন স্থানে ঊর্দ্ধনেত্রে দণ্ডায়মানা—যেন কোন দেবমূর্ত্তি দেখিতেছেন। মনের ভাব, "আমরা যাঁহাদিগকে এখানে এক প্রকার ডাকিয়া আনিয়া বিপন্ন করিয়াছি, তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা হইবার পূর্ব্বে আপন প্রাণ লইয়া পলাইব না। ভগবান রক্ষা করেন, রক্ষা পাইব।" এক জন মহিলা তাঁহার এই বিপন্ন অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি কোনও ক্রমে বাহিরে আসিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ডচেস্ অফ্ এলেন সনের কথা লিখিয়াছেন, "আমি তাঁহাকে বাহির হইবার জন্য অনেক পীড়া-পীড়ী করিয়াছিলাম; তিনি বলিলেন, 'অগ্রে দর্শকেরা রক্ষা পাউন, পরে আমি যাইব।' এদিকে অগ্নির ভীষণ কাণ্ড ক্রমশঃ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে লাগিল, আমি আর থাকিতে না পারিয়া পলাইয়া আসিলাম।"

তাঁহার এই ভয়ানক মৃত্যু-সংবাদ পাইবা-মাত্র তাঁহার একজন আত্মীয়ের তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বিনির্গত হইল। অষ্ট্রীয়ার সাম্রাজ্ঞী শোকে ম্রিয়মাণা হইয়া আছেন।

আর একটী স্ত্রীলোক লিখিয়াছেন, "আমি পলাইবার চেষ্টা করিতেছি, দেখিলাম একটি স্ত্রীলোক মৃত্যুমুখে পতিত; তাঁহার গাত্রবস্ত্র ও শিরস্ত্রাণ জ্বলিতেছে। স্ত্রীলোকটি ক্ষিপ্তের ন্যায় আমার গলা জড়াইয়া আমার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল 'আয় বোন এক সঙ্গে মরি।" আমি কোন মতে তাহার হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিলাম। এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৭।৮ শত লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।

বাজারটীর পার্শ্বেই একটি সরাই ছিল। সরাই এর কর্ত্রী আশ্চর্য্য প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব ও ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে আপন ভৃত্যগণের সাহায্যে ১৫০ টী বিপন্ন স্ত্রী পুরু-ষের প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। বাজারের দিকে তাঁহার ঘরের একটি জানালা ছিল। জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, সেখান দিয়া তিনি একখানি চেয়ার-বাজারের ভিতর ফেলিয়া দিলেন, এবং তাহার উপর দিয়া উহাদিগকে অতি কষ্টে আপন সরাই ঘরে টানিয়া তুলিলেন।

একজন বলিষ্ঠ ইতর শ্রেণীর লোক এই অগ্নিকাণ্ডের সময় আপন প্রাণকে তুচ্ছ করতঃ জলন্ত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, এক এক করিয়া ৪০ টি প্রাণী রক্ষা করি-য়াছে। তাহার নাম বলিবার জন্য তাহাকে বিস্তর অনুরোধ করা হয়; লোকটী কিছুতেই

আপনার নাম প্রকাশ না করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

দরিদ্র-সেবায় ব্রতী হইয়া যাঁহারা এই-রূপ শোচনীয় ভাবে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাঁহাদের আত্মার কল্যাণ-কামনায় কোন গির্জ্জায় উপাসনা হয়। কথা উঠিল, এখন হইতে আর অনাথ দরিদ্র-দের জন্য এককালীন এত টাকা উঠাইবার চেষ্টা কে করিবে? আর কি এত টাকা তাহাদের জন্য সংগৃহীত হইবার উপায় হইবে? এই সময় একটী মহিলা উঠিয়া বলিলেন "আমি দরিদ্রাদিগের জন্য একা পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত; কিন্তু আমার একটি কথা আছে,—আমার নাম কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন না, এবং নাম প্রকাশ করিবার কোন চেষ্টাও যেন না করা হয়।"

এই দুর্ঘটনা উপলক্ষে সহৃদতার মহৎ দৃষ্টান্ত অনেক দেখা গেল। যে জাতি জগতে গণ্য মান্য ও উচ্চ স্থানের অধিকারী হইতে পারিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এরূপ ত্যাগ-স্বীকার ও উদারতা না থাকাই অসম্ভব। "খোঁড়াইলেই বড় হওয়া যায়" এটা ভ্রম মাত্র।

পতিবশীকরণের মহামন্ত্র।

(মহাভারত হইতে সঙ্কলিত)

রমণী মাত্রেই স্বামীর হৃদয়ে একাধি-পত্য করিতে, স্বামীর সমগ্র হৃদয়কে আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন। স্বামীসোহাগিনী রমণী মনে মনে অসীম সুখ ও আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু কি উপায়ে যে স্বামীর চিত্ত মোহিত করা যায়, তাহা সকলে অবগত নহেন। প্রাচীন আর্য্যগণ স্বামীবশীকরণের যে উপায় নির্ণয় করিয়াছেন, আমাদের বিবে-চনায় তাহা অতিশয় সুফলপ্রদ-বোধে, পাঠক পাঠিকাগণের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ইহাতে আর্য্যগণের জ্ঞান-গরিমা, এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের কুসংস্কার উপলব্ধি করিয়া অনেকেই আনন্দ লাভ করিবেন আশায়, মহর্ষি ব্যাসের উপদেশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। ব্যাসদেব সত্যভামা ও দ্রৌপদীর কথোপকথনচ্ছলে বলিতেছেন;—

সত্যভামা দ্রৌপদীকে কহিলেন—"দ্রৌপদি, তুমি পাণ্ডবগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? তাঁহারা যে কখনও তোমার প্রতি ক্রোধ করেন না! কি উপায়ে তুমি তাঁহাদিগকে এতাদৃশ বশীভূত করিলে? ব্রতচর্য্যা, উপবাস, স্নান, মন্ত্র, ঔষধি, বশী-করণবিদ্যা, জপ, হোম বা অঞ্জনাদি ঔষধ, ইহার কোন্ উপায়ে তুমি তাঁহাদিগের চিত্ত মোহিত করিয়াছ, তাহা আমাকে বল; আমিও সেই উপায়ে কৃষ্ণকে বশীভূত করিব।"

দ্রৌপদী কহিলেন— "সত্যভামে, আমি তোমার এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব? যে সব উপায়ের কথা তুমি বলিলে, উহা নিতান্ত ঘৃণিত, এবং অসৎ স্ত্রীগণই ঐরূপ আচরণ করে। কৃষ্ণের মহিষীর এরূপ সংশয় বা প্রশ্ন

করা শোভা পায় না। স্ত্রী মন্ত্রাদির দ্বারা স্বামীকে বশীকৃত করিতে চেষ্টা করিতেছে জানিতে পারিলে, স্বামী সে স্ত্রীকে সর্পিনীর ন্যায় মনে করেন; এবং সেই উদ্বেগে নিরন্তর অশান্তি ভোগ করেন। অশান্ত লোক কখনই সুখী হইতে পারে না। জিঘাংসু ব্যক্তিরাই শত্রুকে বিনষ্ট করিবার জন্য মন্ত্রৌষধি প্রয়োগ করিয়া থাকে। অনেক পাপিষ্ঠা রমণী স্বামীকে বশ করিবার নিমিত্ত ঔষধ প্রদান করায়, কাহারো জলোদরী, কাহারো কুষ্ঠ, কাহারো জরা, কাহারো ক্লীবত্ব, জড়তা, অন্ধতা বা বধিরতা জন্মিয়া থাকে। এরূপ কার্য্য কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

"আমি পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা শ্রবণ কর। কাম ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহার করিয়া সতত পাণ্ডবগণের সেবা করি। কখনও অভিমান না করিয়া, একাগ্রমনে তাঁহাদের ইচ্ছা পালন করি। কদাচ কটু কথা কহি না; মুখভঙ্গীতেও কখনও বিরক্তি প্রকাশ করি না; দ্রুত-পদসঞ্চারে কখনও চলি না; কুৎসিত রূপে কখনও উপবেশন করি না। তাঁহাদের ইঙ্গিতমাত্র তদনুরূপ কার্য্য করি। অপর কাহাকেও কদাচ মনে স্থান দিই না। পাণ্ডবগণ স্নান, ভোজন ও উপবেশন না করিলে কদাচ আহার বা উপবেশন করি না। তাঁহারা ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া আসন ও জল দিয়া অভ্যর্থনা করি। প্রত্যহ উত্তম রূপে গৃহ পরিস্কার, গৃহের সামগ্রীসকল মার্জ্জন, পাক, যথাসময়ে ভোজন প্রদান, ও সাবধানে ধান্যাদি রক্ষা করি। দুষ্টা স্ত্রীর সংসর্গ করি না; তিরস্কার-বাক্য মুখেও আনি না; সকলকেই প্রীতি করি; এবং কদাচ আলস্য করি না। পরিহাসের সময় ব্যতীত হাস্য করি না; দ্বারে, অপরিস্কৃত স্থানে, কিম্বা গৃহোপবনে সতত বাস করি না। তাঁহাদিগকে না দেখিয়া কদাচ সুখী হই না। স্বামী স্থানান্তরে গেলে বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া, ব্রতানুষ্ঠান করি। স্বামী যে যে দ্রব্য পান, সেবন বা ভোজন না করেন, আমিও তৎসমুদয় পরিত্যাগ করি। আমার শ্বশ্রূ কুটুম্ববিষয়ে আমাকে যে সমুদায় ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন, এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ, পর্ব্বাহে স্থালীপাক ও মান্যগণের পূজা প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম আমি জানি, অতি সাবধানে তত্তাবৎ পালন করি। অতি যত্নে সর্ব্বদা স্বামীগণের সেবা করি।

'হে ভদ্রে! আমি মনে করি, পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীদিগের পরম কর্ত্তব্য; পতির অপ্রিয়াচরণ করা নিতান্ত গর্হিত। আমি প্রাণান্তেও পতিগণের অনভিমতে শয়ন, আহার বা অলঙ্কার পরিধান করি না; এবং প্রাণান্তেও শ্বশ্রূর নিন্দায় প্রবৃত্ত হইনা। সতত সাবধানতা, কার্য্যদক্ষতা ও গুরুশুশ্রূষা দেখিয়াই পাণ্ডবগণ আমার বশীভূত হইয়াছেন।

"আমি প্রত্যহ শ্বশ্রূ কুন্তী দেবীকে স্বয়ং অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদানে সেবা করি; কদাপি তাঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজন, বা বসন ভূষণ পরিধান করি না। পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে প্রত্যহ আট সহস্র ব্রাহ্মণ রুক্মপাত্রে ভোজন করিতেন আশিষ্ট;

সহস্র গৃহমেধী স্নাতক ছিলেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের ত্রিশ জন পরিচারক থাকিত; তদ্ভিন্ন আরো দশ সহস্র স্নাতকের নিমিত্ত প্রত্যহ স্বর্ণপাত্র উত্তম অন্নে পরিপূর্ণ থাকিত। আমি ঐ সমুদায় ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদান পূর্ব্বক সমুচিত সৎকার করিতাম।

"যুধিষ্ঠিরের শত সহস্র দাসী ছিল। আমি সকলেরই নাম, রূপ ও কৃতাকৃত কর্ম্ম জ্ঞাত ছিলাম; এবং তাহাদিগকে অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদান করিতাম। ধর্ম্মরাজের রাজ্যশাসনসময়ে আমি তাঁহার সমস্ত বিষয়, অন্তঃপুরস্থ ভৃত্যগণ; গোপালগণ, মেষপালগণের তত্ত্বাবধান করিতাম। আমি একাকিনী তাঁহার সমুদয় আয় ব্যয়ের বিষয় অবগত ছিলাম। পাণ্ডবগণ আমার উপর সমুদায় পোষ্যবর্গের ভার দিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইতেন; আমি সকল সুখ পরিত্যাগ করিয়া দিবা রাত্রি সেই দুর্ব্বহ ভার বহন করিতাম। আমি একাকিনী সাগরতুল্য কোষাগারের তত্ত্বাবধান করিতাম। দিবা রাত্রি সমান জ্ঞান করিয়া, ক্ষুধাতৃষ্ণাকে সতত সহচরী করিয়া সতত কৌরবগণের আরাধনা করিতাম। সকলের অগ্রে শয্যাত্যাগ করিতাম এবং সকলের শেষে শয়ন করিতাম; এবং সতত সত্যাচরণ করিতাম। হে সত্যভামে! আমি পতিগণকে বশীভূত করিবার এই মহৎ উপায় জানি; কিন্তু দুষ্টা স্ত্রীগণের ন্যায় কদাচ কুব্যবহার করি না, করিতে ইচ্ছাও করি না।

তুমি কৃষ্ণের প্রতি সতত অকৃত্রিম প্রণয় প্রকাশ করিবে: রমণীয় বেশভূষা, উত্তম ভোজনদ্রব্য, মনোহর গন্ধমাল্য প্রদান করিয়া তাঁহার মনোরঞ্জন করিবে। তাহা হইলে, তিনি তোমার প্রণয় জানিয়া অবশ্যই তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন। দ্বারদেশে স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইবে। তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেই পাদ্য ও আসন প্রদান করিয়া অভ্যর্থনা করিবে। তিনি কোন কার্য্যে কোন দাসীকে নিয়োগ করিলে, তুমি উঠিয়া স্বয়ং তাহা সম্পাদন করিবে। এইরূপ ব্যবহার দেখিলে কৃষ্ণ তোমাকে পতিপরায়ণা বলিয়া বুঝিবেন। তিনি তোমার নিকট যাহা কহিবেন, তাহা গোপনীয় না হইলেও তুমি কদাচ তাহা প্রকাশ করিবে না। যে সকলব্যক্তি স্বামীর প্রণয়পাত্র অনুরক্ত ও হিতসাধক, বিবিধ উপায়ে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে। স্বামীর দ্বেষপাত্র, বিপক্ষ, অহিতাচারী ও কুহকীদিগের সহবাস অতিযত্নেপরিত্যাগ করাইবে। অন্য পুরুষের সমক্ষে মত্ততা ও অসাবধানতা পরিত্যাগ করিয়া মৌন অবলম্বন করত নিজের অভিপ্রায় সংযত করিয়া রাখিবে। স্বামীর অসাক্ষাতে কোন পুরুষের সহিত একত্র বাস করিওনা। সৎকুলজাতা, পুণ্যশীলা, পতিব্রতা নারীদিগের সহিত সখ্য করিবে; ক্রূর, কলহপ্রিয়, ঔদারিক চৌর, দুষ্ট ও চপল নারীদিগের সংসর্গ কদাচ করিবে না। স্বামীর তুষ্টিজনক বেশভূষা পরিধান করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিবে। এইরূপ সদাচরণ করিলে ইহকালে সুখ, সৌভাগ্য ও কীর্ত্তি, এবং পরকালে স্বর্গলাভ হইবে।"

যাঁহারা স্বামীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু এই মহৎ ও পবিত্র সাধনে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাহাদের অভিলাষ কখনও পূর্ণ হইতে পারে না।

আমার মকদ্দমা।

দেখিতে দেখিতে হাকিম পঁহুছিলেন, আর গল্পের সুবিধা হ'লনা; উঠিয়া বৃদ্ধের সহিত বাহিরে আসিলাম।

কথাবার্ত্তায় জানিলাম, বৃদ্ধের নাম হরিহর শর্ম্মা; তর্করত্ন বলিয়াও অনেকে তাঁহাকে ডাকে। লোকটী বড় ভাল মানুষ, সাদাসিদে। তাঁহার এক জ্ঞাতির যোগে রমানাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার নামে এক মিছে নালিশ করে দিয়েছে। তর্করত্ন মহাশয়ের এই প্রথম মোকদ্দমা; ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আদালতের মুখ দেখেন নাই। ভয়ে জড়সড়; কি বল্‌তে কি বল্‌বেন, ভেবে আকুল হয়ে পড়েছেন।

অদূরে ছোট আদালত; সেখানেই তর্করত্নের মোকদ্দমার বিচার হ'বে। আমরা উভয়ে সেই ঘরের নিকটে গেলাম। ছোট আদালত শুনিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম, বুঝি আদালত ঘরটী ছোট, আর হাকিমটী ছেলে-মানুষ। কিন্তু দেখিলাম তা নয়; হাকিমের বড় শুভ্রকেশ, ঘরটীও বড়। একদিন দাদার কাছে শুনেছিলাম, ছোট আদালত আর কালীঘাট দুই সমান। সেই দিন হ'তেই ছোট আদালত দেখ্‌বার কৌতুহল ছিল। সেই কারণে বৃদ্ধকে সঙ্গে লইয়া এজলাসে প্রবেশ করিলাম।

দেখিলাম এজলাস জনপূর্ণ,সকলেই ব্যগ্র ও কার্য্যতৎপর। আমরা এক কোণে যাইয়া দাঁড়াইলাম; আরদালীর ঘন ঘন হুঙ্কারে

বেঞ্চের উপর বসিলাম। শুনিলাম, মোকদ্দমা চলিতেছে, আর ইতিপূর্ব্বেই পনর নম্বর মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে! আর একটা ধরা হইল; পেস্কার ডাকিতে বলিল 'বাদী নারান দাস'; পেস্কারের পার্শ্বে এক হিন্দুস্থানী পেয়াদা দাঁড়াইয়াছিল, সে হাঁকিল 'বৈদ্ নারান দাস'। আর এক পেয়াদা, সে বাঙ্গালী, বাহিরে গিয়া ডাকিতে লাগিল 'বৈদ্যনাথ দাস! বৈদ্যনাথ দাস! বৈদ্যনাথ দাস'; বৈদ্যনাথ দাস আসিলনা। নারান দাসের মোকদ্দমা খারিজ হইয়া গেল। পরে জানিলাম, যখন এই কাণ্ড হইতেছিল, তখন নারান দাস যোড়হস্তে আদালতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল।

তারপর তর্করত্নের মোকদ্দমা ধরা হইল। পেয়াদাকে উচ্চৈঃস্বরে নাম ডাকিতে শুনিয়া বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি উঠিয়া অগ্রসর হইলেন। তথাপি পেয়াদা ক্ষান্ত না হইয়া, বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে শুনিয়া, ব্রাহ্মণ 'এই যেছে বাপু' বলিয়া বাহিরে পেয়াদার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনিই যে হরিহর, পেয়াদা তাহা বুঝিতে পারিলনা; বৃদ্ধও তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলেন না; কাজেই পেয়াদা বাহির হইতে 'গরহাজির' হাকিল, এবং তৎক্ষণাৎ চক্রবর্ত্তীর এজাহারে ডিক্রী হইয়া গেল। চক্রবর্ত্তী হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিল, তাহার দলের উল্লাসধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হইল।

পারেন নাই। তাঁহার কথা না শুনিয়া, তাঁহার সাক্ষীর জবানবন্দী না করিয়া যে মোকদ্দমা ডিক্রী হইতে পারে, এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। যখন ডিক্রী হওয়া বুঝিলেন, তখন হাঁ করিয়া দেওয়ালে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। জানি না বৃদ্ধের মনে তখন কি চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল।

কাণ্ড দেখিয়া আমার একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল; আমি বাহিরে আসিলাম। আসিয়া দেখি, শকুনিদলের ন্যায় পেয়াদা মুহুরি প্রভৃতি রমানাথকে ঘিরিয়া টানাটানি করিতেছে; বারান্দায় একটা হুল স্থূল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে।

অদূরে আর এক হাকিমের এজলাশ। সেখান হইতে এক ভীমমূর্ত্তি আরদালী 'চোপ' 'চোপ' শব্দে বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া সকলেই যে যে দিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল; পেয়াদা সাহেব কাহাকেও ধরিতে পারিলেন না; আমিও সরিয়া গিয়া দূর হইতে কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম। বারাণ্ডার নীচে একটি গরীব গালে হাত দিয়া বসিয়া ছিল; পেয়াদা কাহাকেও ধরিতে না পারিয়া, তাহাকেই টানাটানি করিয়া এজলাশে লইয়া গেল। লোকটি করুণ স্বরে অনেক অনুনয় বিনয় করিল, তাহার কি অপরাধ জানিতে চাহিল; পেয়াদা কোন কথাতেই কর্ণপাত করিল না।

আমিও সেই সঙ্গে সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম। হাকিম কলম ধরিয়া, কাজ বন্ধ করিয়া, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। ধৃত ব্যক্তিকে দেখিয়াই বলিলেন " তোমার ১০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইল; তুমি আদালতের কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছ "। লোকটি বলিল ' হুজুর আমি কিছুই করি নাই; ১০০৲ টাকার দাবির মোকদ্দমা আমার উপর— আমি সেই ভাবনায় বসিয়া ছিলাম— কোন দোষ করি নাই। কথা শেষ হইতে না হইতেই চাপরাশি তাহাকে এক ধমক দিল, সব কথা হাকিমের কান পর্য্যন্ত যাইতে পারিল না; হাকিম আপন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

ব্যাপার দেখিয়া লোকটী কাঁদিয়া ফেলিল; দরদরিত ধারায় বুক ভাসিয়া গেল; বলিল 'আমিত দোষ করি নাই।" 'আবার গোল করিতেছিস্ ?'বলিয়া চাপরাশি গলাধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দিল; তাহার মাথা দেওয়ালে আহত হইল—বেচারা কাঁদিতে কাঁদিতে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

এমন সময়ে এক পেয়াদা অপর আদালতহইতে উচ্চৈঃস্বরে কাহার নাম করিয়া ডাকিতেছিল। সেই নাম শুনিয়া, লোকটী মাথার বেদনা ভুলিয়া দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত তাহাই শুনিতে লাগিল। শেষ আর থাকিতে না পারিয়া, সেখান হইতে বলিয়া উঠিল 'হাজির'; হাকিম একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন—ইংরেজীতে কি বলিতে লাগিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শেষ ইংরেজী ছাড়িয়া হিন্দীতে বলিলেন 'লে যাও হিয়াসে' 'যাও হিয়াসে'; কিন্তু লোকটি হাকিমের তর্জ্জন গর্জ্জনে ভীত হইল না। বোধ করি, কোন কথা তাহার কানে যায় নাই। সে কেবল বলিতে লাগিল ' হুজুর আমার মোকদ্দমা ডাক হয়েছে, আমাকে ছেড়ে না দিলে আমার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।' হাকিম আবার বলিলেন, 'এই বেআদবকে নাজিরখানায়

আটক রাখ। চাপরাশি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাকে প্রবলবেগে টানিয়া বাহিরে আনিল।

এই সময়ে কানে কলম এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া আরদালিকে কি বলিল। আরদালি ঠাণ্ডা হইয়া লোকটীকে আস্তে আস্তে লইয়া গেল। লোকটির সহিত নবাগত ব্যক্তির কথা হইয়া, সে যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইল। সেই ব্যক্তি সেখান হইতে তাড়াতাড়ি উকিলখানার দিকে ছুটিয়া গিয়া এক উকিলকে ডাকিয়া আনিল। শুনিলাম উকিলটির নাম শ্যাম বাবু। যে এজলাসের পেয়াদার স্বর শুনিয়া লোকটি ব্যস্ত হইয়াছিল, সেই ঘরে শ্যাম বাবু প্রবেশ করিলেন। আমিও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেখানে দাঁড়াইলাম।

শ্যামবাবু উপস্থিত হইলে হাকিম বলিলেন 'আপনার একটা মোকদ্দমার বিবাদী হাজির হইল না;একতরপা ডিক্রী হইয়াগেল। শ্যামবাবু বলিলেন, "আমি সেই জন্যই আসিতেছি, আমাকে একবার ডাকিলেই হইত। ইতিপূর্ব্বে দশবার সাক্ষী লইয়া আসিয়াছিল, আদালতের অবসর অভাবে মোকদ্দমা হয় নাই; আজিও সাক্ষীর হাজিরাণ দিয়াছে"। হাকিম হাসিয়া বলিলেন "হাজিরাণ দিলেইত আর হয় না, ডাকলে আসা চাই"। শ্যামবাবু উত্তর করিলেন "তা সত্য, কিন্তু কেন যে সে আসিতে পারে নাই,তাহা শুনিলে হুজুরের নিশ্চয়ই দয়া হইত"। হাকিম বলিলেন "এখন আর তর্ক করিয়া ফল নাই, রায় হইয়া গিয়াছে; যদি উপযুক্ত কারণ থাকে, তবে সানি করিতে পারেন।" "পারি, কিন্তু সানি করিয়া বাহাল করাইতে এই ৭০০ টাকার মকদ্দমায় কত খরচ হইবে ভাবুন দেখি"। এই বলিয়া শ্যাম বাবু চলিয়া আসিলেন; হাকিম অপর কার্য্য করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে নবীন বাবুর মুহুরি আসিয়া আমাকে ডাকিল, আমি বাহিরে আসিলাম। মুহুরি বলিল 'এই নাও তোমার ইশবনবিশি, আদালত হইতে ফেরত হইয়াছে'। দেখিলাম তাহার পৃষ্ঠে 'সংশোধন পূর্ব্বক এক দিন মধ্যে দাখিল করে' হুকুম লেখা রহিয়াছে। আমি বলিলাম 'আমি কি করিব ? আপনি লিখিতে ভুলিয়াছেন, সংশোধন করে দেন। মুহুরি বলিল 'লেখবার ভুল কিছুই নাই; আসল জায়গায় ভুল হয়েছে, সেইটিই কথা'। আমি বলিলাম, "যদি ভুল না থাকে, তবে হাকিমের দস্তখৎ থাক্‌বে কেন?" মুহুরি বলিল, "তুমি কিছুই জান না; হাকিম কি আর চেয়ে দেখেন ? যাই হোক্, কাছে ধরে দিলেই চ'ক মুজে দস্তখৎ করাই চিরপ্রচলিত হাকিমীপ্রথা'। তার পর মুহুরি সমস্ত পরীক্ষা করিল, আমিও আমার সরকারি চক্ষুতে তন্ন তন্ন করিয়া আগাগোড়া দেখিলাম। বহু চেষ্টাতেও কোন বিশেষ ভুল দেখা গেল না। কেবল এই মাত্র পাওয়া গেল যে 'কৈলাস চন্দ্র দাস' সাক্ষীর 'ল' এর আকারটি দেওয়া হয় নাই; 'কৈলস' লেখা হইয়াছে। কাজেই সেই ভুলটী তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল; মুহুরি পুনরায় দাখিল করিবার জন্য তাহা লইয়া গেল; কিন্তু দুই প্রহর অতীত হইয়া এক মিনিট অধিক হইয়াছিল বলিয়া সে দিন আর দাখিল চলিল না।

পর দিন আমিই দাখিল করিতে গেলাম; আমলাটি চটিয়া বলিল 'তুমি কেহে ?

তোমাকে কে চেনে?' গতিক দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া মুহুরির হাতে ইশবনবিশিটি দিলাম, মুহুরি দিতে গেল, আমলা লইল না; বলিল, 'উকীল বাবুকে ডাকিয়া দাও, মুহুরির নিকট দরখাস্ত লওয়া নিষেধ।' কাজেই নবীন বাবুকে ডাকা হইল। কিন্তু এই সকল কার্য্যে দুই প্রহর গত হইয়া গিয়াছিল। উকীল বাবু ইশবনবিশিটী হাকিমের নিকটে দিলে আমলা বাবুটি ছুটিয়া আসিয়া বলিল "হুজুর, দুই প্রহর বেজে গেছে; এইরূপ বিশৃঙ্খল ভাবে যখন তখন দরখাস্তাদি লইতে গেলে আমরা মারা যাই, এবং ইহাতে সর্কুলারের নিয়ম ভঙ্গ করা হয়।" কাজেই নিয়মজ্ঞ আমলা বাবুর কথাতেই সায় দিয়া, তাহাই কায়েম রাখিয়া,হাকিম মহোদয় মিষ্ট হাসি হাসিয়া "তা বই কি ,তাও কি হয়' বলিয়া ইশবনবিশিটি উকীল বাবুর হাতে ফেরৎ দিলেন; তাঁহার হস্ত হইতে মুহুরি লইল ।প্রকৃত কথা অন্ধকারেই রহিয়া গেল।

তার পর দিন আবার দাখিল করা হইল। কিন্তু দাখিল হইবার অব্যবহিত পরেই পেয়াদা তাহা আনিয়া ফেরৎ দিয়া গেল। এবার হকুম যে এক দিনের মধ্যে দেওয়া হয় নাই বলিয়া বিশেষ দরখাস্ত সহ দাখিল করিতে হইবে। এই সকল গোলে আমারও বড় রাগ হইল। আমি বলিলাম 'আট আনার দরখাস্ত বরং দেওয়া ভাল তথাপি কুকার্য্যের সহায়তা করা উচিত নয়।' মুহুরি দরখাস্ত সহ দাখিল করিল। আমি বাড়ী আসিবার ইচ্ছা করিলাম। মুহুরি বলিল "পেয়াদা সঙ্গে লইয়া যাইবেন, বিচারের দিন সন্নিকট।" কাজেই সে দিন থাকিতে হইল।

পরদিন আমার ইশবনবিশি আবার ফেরৎ হইল। এবার অপরাধ যে সাক্ষীর নামের নিকট দুই স্থানে কালী [illegible] গিয়াছে। ঐ কালী যে কিরূপে কোথা হ[illegible] আসিল, তাহা বুঝা গেল না। কাজেই মুহুরি ফেলিয়াছে বলিয়াই বলিতে হইল। এবার হুকুম "সা[illegible]ীর নাম ধাম পরিস্কার করিয়া লেখা না থাকায় ফেরৎ দেওয়া গেল।" মুহুরি বলিল 'আমি আর পারিব না; এসব বাজে কাজ করিয়া সময় নষ্ট করিতে আমার অবসর নাই। আপনিই ও দেখ্‌লেন কাণ্ডটা কি? এর চেয়ে তাই কি ভাল ছিল না? আপনি এই পাঁচ দিন ব'সে বাসা খরচ কর্‌ছেন, আট আনা কোর্ট ফি খরচ কর্‌লেন, তা ছাড়া হায়রানের ত সীমা নাই। এই সকল কষ্ট ভোগ করার চেয়ে একটু চেপে গেলেই কি ভাল হয় না?"

আমার মনে হ'ল 'এই ঘোরতর অত্যাচারের কি নিবারণ হয় না? আমি সৎপথে থাকিলাম বলিয়া কষ্টভোগ করিব?" এই ভাবিয়া আমি মুহুরির কথায় সন্তুষ্ট না হ'য়ে উকীল বাবুর নিকট সমস্ত কথা বলিলাম, আর কিরূপে সামান্য কারণে ইশ-বনবিশি ফেরত হইয়াছে, তাহাও দেখাইলাম। তিনি একটু বিরক্ত হ'য়ে ইশবনবিশি লইয়া হাকিমের নিকট উপস্থিত হইলেন। আমাকে আর নবীন বাবুকে দেখে আমলা বাবুর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না; তিনিও তাড়াতাড়ি হাকিমের নিকট উঠিয়া আসিলেন। সামান্য কারণে দরখাস্ত প্রভৃতি ফেরত দেওয়ায় পক্ষগণের কি রূপ অসুবিধা হয়, তাহা নবীন বাবু হাকিমকে জানাইলেন।

হাকিম কিছু বলিবার আগেই আমলা বাবুটি বলিলেন "হুজুর, আদালতে যে সকল দরখাস্ত দেওয়া হয়, তা পরিষ্কার করে না লিখ্‌লে আমাদিগকে সাহেবের কাছে তাড়া খেতে হয়।" হাকিম আমলার কথায় ভুলিয়া গেলেন; নবীন বাবু কিছু বলিবার আগেই বল্লেন "মুহুরিরা একটু সাবধান হ'লে দেখ্‌লেই হয়। আর এসব বিষয়ে আমাদের বা আপনাদের সময় নষ্ট কর্‌লে চল্‌বে কেন?

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার জ্ঞান লাভ হইল। আমি মুহুরি বাবুর পরামর্শ মতেই কার্য্য করা উচিত বোধ করিলাম। আবার সেই কালী পড়া অপরিষ্কার লেখা ইশ্‌বনবিশিই বিনা পরিবর্ত্তনে দাখিল হইয়া চলিয়া গেল। আমিও শীঘ্র পেয়াদা যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া বাড়ী আসিলাম। ক্রমশঃ

পরিচিত।

(১)

আমি চিনি তারে কে?
সে যে ছুঁয়ে গেছে হৃদিতল
ফুলের বাতাস দে!
প্রাণের পরে কতই স্নেহ,
কতই প্রীতি অহরহ,
কতই আশা, কতই তৃষা,
ঢেলে দিয়ে যে!
আমি চিনি তারে কে?

(২)

আমি চিনি তারে কে!
সে যে হিয়া খানি আলো করে
মধু হাসিতে!
জোছ্‌না যথা আকাশ পরে
বিশ্বমাঝে কিরণ ঝরে,
তেম্‌নি তর পরাণ মাঝে
সদাই ছেয়ে যে।
আমি চিনি তারে কে!

(৩)

আমি চিনি তারে কে—
সে যে মন মাঝে রাশি রাশি
ছবি আঁকে যে!
সে যে প্রাণের মাঝে মলয়া,
সে যে হৃদয় ক্ষেতে আলেয়া
সে স্বরের কোলে রাগিণী যে,
পরাণ হরে যে!
আমি চিনি তারে কে!

(৪)

আমি চিনি তারে কে—
প্রাণটী তার মধুর অতি
ফুল ঘেরা যে!
স্বরগ মাঝে অপ্সরা-গান,
বনের মাঝে কোকিল-তান,
লতার মাঝে পাপীয়া-স্বর
চুরী করে যে!
আমি চিনি তারে কে!

(৫)

আমি চিনি তারে কে!
সে কবিতা যে ভাবের স্বরে
ফুটে উঠে যে!

পরাণ মাঝে তারই কায়া,
তারই মধুর স্নেহের ছায়া,
যেন, নীহারিকা সরোবরে
ভেসে উঠে যে !
আমি চিনি তারে কে !

শ্রীশৌরীন্দ্র মোহন গুপ্ত।

চলে যা'ক।

১

যাক সখি চলে যাক, ডেকোনা অমন করে।
সে যদি না ভালবাসে কেমনে রাখিব ধরে ?
এত যে গো নিশিদিন
কেঁদে কেঁদে কেটে গেছে,
একবার এ কথাটি
সেকি কভু ভাবিয়াছে?
এত যে গো সাধাসাধি, যেচে ধরে দিয়ে প্রাণ,
কভু কি একটী দিন কথায় দিয়াছে কান ?

২

চাহিলে আমার পানে অমনি ঘৃণার হাসি,
বিন্ধে শত মর্ম্মস্থল উপেক্ষার তীক্ষ্ণ অসি !
কথাটী কহিতে গেলে
আদরে হাতটী ধরে,
অমনি—"সময় নাই
যেতে হবে ত্বরা করে" !
অপর সবার কাছে আনন্দেতে কাটে তার।
আমারি নিকটে এলে মুখ খানি ভার ভার !

৩

যতন করিলে তারে, মনে করে সে চাতুরী।
করুণার কথাগুলি মনছলা কারিকরী॥
ব্যথায় নয়ন-প্রান্তে
দেখিলে দুফোঁটা জল,
ভাবে সে—"ছলিতে মোরে
কপটীর নানা ছল;"
দীর্ণ হিয়া সকাতরে তাহারে দেখাতে গেলে,
গরলের পূর্ণ কুম্ভ ঢেলে দেয় অবহেলে॥

৪

ডেকোনা ডেকোনা তারে,যেতে দাও, চলে যাক্;
যেথা গিয়ে সুখী হয়, সেথা গিয়ে সুখে থাক্॥
যারে ভালবাসে সখি,—
লউক হৃদয়ে তুলে,
যদি সে গো সুখী হয়—
যাউক আমারে ভুলে;
তাহারি সুখেতে সুখী; হৃদয়রতন মম !
ডেকোনা ডেকোনা সখি—ব্যথা পাবে প্রিয়তম

৫

হাসি মুখ দেখে যার প্রাণটুকু দিতে পারি,—
মুখখানি ভার ভার,—সখি, তা সহিতে নারি॥
কেন তবে ডেকে এনে
করিবে গো জ্বালাতন,
সুখী সে হবেনা তাহে—
কাঁদিবে আমার মন;
মোরে না দেখিলে যদি সুখে থাকে সেই ভাল;
ভাল বাসিয়াছি যবে, বাসিব গো চিরকাল॥

৬

প্রভাতে উষার কোলে হাসিবে তরুণ রবি।
দেখিব তাহাতে আমি তাহারি সে মুখচ্ছবি॥
তারি প্রেমে মগ্ন হয়ে
বিহঙ্গ গাহিবে গাথা,

অনিল বহিয়া যাবে
শুনাবে তাহারি কথা;
হৃদয়ের নিধি মোর হৃদয়ের মাঝে রবে।
যাক সখি চলে যা'ক কোন ক্ষোভ নাহি হবে॥

শ্রীসত্য চরণ চক্রবর্ত্তী।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। বিভক্তি-নির্ণয় — শ্রীঅক্ষয় নারায়ণ শর্ম্ম প্রণীত ও প্রকাশিত; মূল্য চারি আনা। সংস্কৃত রচনায় সুবন্ত বিভক্তিসকলের ব্যবহার বালকগণের পক্ষে অতি দুরূহ। এই পুস্তক বালকগণের বিভক্তির ব্যবহার বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ব্যাকরণগুলির সূত্র সংগ্রহ করিয়া, গ্রন্থকার ছন্দোবন্ধে তাহা সজ্জিত করিয়াছেন; তার পর বাঙ্গলা ভাষায় তাহার বাখ্যা করিয়া, সংস্কৃত দৃষ্টান্ত ও বাঙ্গলায় দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। প্রবেশিকা স্কুলের ছাত্রগণের পক্ষে এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে। প্রত্যেক বালকেরই ইহার এক এক খানি থাকা উচিত। কালেজ ও টোলের ছাত্রগণও ইহা দ্বারা উপকৃত হইবেন। পুস্তকের স্থানে স্থানে মুদ্রাঙ্কন-দোষ আছে। আশা করি ভবিষ্যতে গ্রন্থকার তাহা বিদূরিত করিবেন। এ প্রকার পুস্তকের নির্ভুল হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

২। দাসী— মাসিক পত্রিকা, শ্রীমহেশ চন্দ্র ভৌমিক বি, এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। দাসী বাঙ্গলা দেশে সুপরিচিত। নানা প্রকারে দেশের সেবা করিয়া দাসী সকলেরই আদরনীয়া হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গীয় পাঠক মণ্ডলীর অনুগ্রহ (অথবা কর্ত্তব্যজ্ঞানের) অভাবে গত জানুয়ারী মাস হইতে অনাহারে অকর্ম্মণ্যা হইয়া, সেবা-ব্রত পরিত্যাগ করত লোকসমাজ হইতে অন্তর্হিতা হইয়াছিল। তদানীন্তন পরিচালকগণ সকলেই দরিদ্র ছিলেন; সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেবা-ব্রতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু লোক-সেবা করিতে গিয়া যে তাঁহাদের স্ত্রী পুত্রাদি ক্ষুধায় অন্ন, রোগে বিশ্রাম ও ঔষধ, লজ্জা-নিবারণে বস্ত্রাদির অভাবে সেবা-প্রার্থীর দল পুষ্ট করিতে লাগিল, বচন-সর্ব্বস্ব, "পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির" কেহ সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। তাঁহারাও অকর্ম্মণ্য হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে দাসীকে বিদায় দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে আর কি দোষ দিব? বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় অদম্য উৎসাহে অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া পুনরায় দাসীকে সুস্থ ও সবলা করিয়া লোক-সমাজে পাঠাইয়াছেন। সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়দ্বয়ের যে এ কার্য্যে বিলক্ষণ যত্ন, উৎসাহ ও উদ্যম রহিয়াছে, তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে চারি সংখ্যা দাসী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া মুদ্রিত করতঃ গ্রাহক-গণকে দেওয়া বড় সহজ নহে। বিশেষতঃ জুবিলী সংখ্যার দাসী যে প্রকার নানা রঙ্গে রঞ্জিত, বহু সংখ্যক উৎকৃষ্ট চিত্রে ভূষিত ও

উপাদেয় প্রবন্ধে সজ্জিত হইয়া আমাদের চিত্ত বিনোদন করিয়াছে, তাহা সামান্য যত্নের ফল নহে। আমরা এজন্য সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। ভগবৎ সমীপে তাঁহাদের ও দাসীর দীর্ঘ জীবন ও কুশল প্রার্থনা করিতেছি। আর আমাদের দেশীয় শিক্ষিত ও সহৃদয় মহাশয়গণের নিকটও এই প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা কিঞ্চিৎ সচেষ্ট হইয়া এই কলঙ্ক অপনোদনে মনোযোগ করুন। দাসী বাঁচিয়া থাকিলে কেবল মাত্র জ্ঞানানুরাগী বা সাহিত্যানুশীলনপ্রিয় ব্যক্তিদেরই যে উপকার তাহা নহে; অনেক অনাথ অতুর নিঃসহায় নরনারীও যে আশ্রয় ও সেবা পাইয়া, দু দিনের জন্যও, পৃথিবীতে দয়া ধর্ম্ম আছে বলিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দ পাইতেছে;— দাসীর আয় হইতে যে এই একটী মহৎ কার্য্য সাধিত হইতেছে,— ইহা স্মরণ করিয়াও সকলের দাসীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। বৎসরে দুইটী টাকা দিবার সামর্থ্য লক্ষ লক্ষ লোকের আছে। আর তদ্বারা এত মহৎ ফল লাভ হইবে দেখিয়াও যদি সামর্থ্যবানেরা উদাসীন থাকেন, তবে আর বিদ্যা জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনা কোথায় রহিল?

নূতন সম্পাদক দাসীর সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইয়াও যে ইহার আয়ের দ্বারা দাসাশ্রমকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। এক্ষণে স্বদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের এই মহদুদ্দেশ্যে সহানুভূতি হউক, এই প্রার্থনা।

সংবাদ।

কলিকাতার দাঙ্গা। কলিকাতার উত্তর প্রান্তে টালা নামক একটী পল্লীতে ৺প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের এষ্টেট্‌ভুক্ত জমির কিয়দংশে একটী খোলার ঘর হিম্মত খাঁ নামক একজন মুসলমান ভাড়া লইয়াছিল। বাড়ী করিবার জন্য জমির স্বত্বাধিকারী উক্ত হিম্মতখাঁকে ঐ খোলার ঘর হইতে উঠাইয়া দিবার জন্য দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় গ্রহন করেন। হিম্মতখাঁ জবাব দেয় যে ঐ খোলার ঘরে সে অন্যান্য মুসলমানদিগকে লইয়া নমাজ পাঠ করিয়া থাকে, অতএব ঐ ঘর মস্‌জিদ্, এবং মস্‌জিদ্ হইতে উঠাইয়া দিবার কোনও বিধি নাই। কিন্তু আদালতের বিচারে হিম্মত খাঁর উপর উক্ত ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া যাইবার আদেশ হয়। হিম্মত খাঁ আপিল করিয়াও হারিয়া যায়। যথাসময়ে ২৮শে জুন আদালতের পেয়াদা ডিক্রি জারি করিতে গিয়া দেখে যে সেখানে অনেক মুসলমান জমায়েতবস্ত হইয়াছে—সুতরাং পুলিসে খবর দেওয়া হয়। পুলিস আসিয়া ঐ ঘর ভাঙ্গিয়া ঐ বিবাদী ভূমিতে বাঁশ পুতিয়া ডিক্রিদারকে আইনমতে দখল দিয়া চলিয়া যায়। তখন মুসলমানগণ কোনও প্রকার বাধা দেয় নাই। ইহার পর কলিকাতার নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান মহলে "সাহেবলোক মস্‌জিদ্ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে" বলিয়া এক মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সহস্র সহস্র মুসলমান গভীর রাত্রিতে

টালাতে সমবেত হইল। নিকটের একটী সুরকীর কল হইতে বলপূর্ব্বক ইট ও অন্যান্য মসলা লইয়া তাহারা ঐভূমিতে মস্‌জিদ্ তুলিতে আরম্ভ করিল। রাত্রিতেই পুলিসে সংবাদ পৌঁছিল। পুলিস কমিশনর জেমস্ সাহেব তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে একত্রিত হইবার আদেশ দিলেন এবং কেল্লা হইতে কতক গুলি ফৌজ চাহিয়া পাঠাইলেন। আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটও সংবাদ দেওয়া হইল। পুলিস কমিশনর সাহেব প্রায় তিনশত পুলিস কর্ম্মচারী ওএকশত গোরা সৈন্য লইয়া ভোরের সময় টালাতে উপস্থিত হইলেন; এবং তিনশত পুলিস কর্ম্মচারী সঙ্গে লইয়া মুসলমানদিগের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে প্রায় তিন সহস্র মুসলমান একত্রিত হইয়াছে এবং রাত্রির মধ্যেই মস্‌জিদ্ প্রায় গাঁথিয়া তুলিয়াছে, কেবল ছাদটী মাত্র বাকী। তখনও পাঁচটা বাজে নাই। তিনি দুইজন মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী পুলিস কর্ম্মচারীকে উন্মত্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়াদিলেন এবং বলিয়া দিলেন তাহাদিগকে এই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে বল। মুসলমানগণ তাহাদের একজন দলপতিকে জেমস্ সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়া জানাইল যে তাহারা ঐ স্থানে মস্‌জিদ্ করিবার ইচ্ছা করে; মস্‌জিদ্ করিতে না দিলে তাহারা "জাণ" দিবে তথাপি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবেনা। জেমস্ সাহেব তখন মুসলমান সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দিলেন যে তাহারা যদি সেখান হইতে চলিয়া না যায়, তাহাহইলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইবে। তাহাতে মুসলমানগণ "দীন্ দীন্ শব্দ করিয়া পুলিসকে আক্রমণের উদ্যোগ করিলে জেমস্ সাহেব মুসলমানদিগকে "পাকড়া করিবার জন্য পুলিসকে অনুমতি দিলেন। মুসলমানেরা পুলিসের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল কিন্তু ঘটনা স্থলেই চুয়াত্তর জন পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইল। আহতদিগকে হাঁসপাতালে পাঠান হইল ও অবশিষ্টগুলি চিৎপুর থানায় আনীত হইল। জেমস্ সাহেব সৈন্য-গণকে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিলেন: এবং দুইজন সাহেব ও পঁচিশজন দেশীয় পুলিস কর্ম্মচারীকে ঘটনাস্থলে পাহারা দিবার জন্য রাখিয়া নিজেও সদলবলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই দিন বেলা প্রায় দুইটার সময় যে সকল পুলিস কর্ম্মচারী টালায় শান্তি রক্ষার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় এক সহস্র মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সমীপবর্ত্তী জলের কলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুসলমানগণ উন্মত্তের ন্যায় জলের কল আক্রমণ করে। বিপন্ন মুষ্টিমেয় পুলিস লাল বাজারে জেমস্ সাহেবের নিকট টেলি-ফোন্ তারযোগে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ঠিক ইহার পরক্ষণেই মুসলমান্ সম্প্রদায় টেলিফোনের তার কাটিয়া দেয়। জলের কলের সাহেবদের নিকট বন্দুক ও গুলি ছিল; পুলিসের সাহেব কর্ম্মচারী দ্বয় সেই বন্দুক ছুঁড়িতে আরম্ভ করেন; তাহাতেই আক্রমণকারীগণ কতক নিরস্ত হয়। কয়েকজন সাহেব কর্ম্মচারী ও প্রায় ষাটিজন দেশীয় কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ টালায় আসিবা মাত্রেই মুসলমানগণ পলায়ন করে; কেবল পাঁচজন

মাত্র ধৃত হইয়াছে। ইতিমধ্যে জেমস্ সাহেব কেল্লায় পুনরায় সংবাদ পঠাইয়া গোরাসৈন্য আনাইয়া টালায় পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্তে টালার গোলযোগ থামিল বটে, কিন্তু কলিকাতার মুসলমান-প্রধান স্থান সকলে মহা উৎপাত আরম্ভ হইল। মুসলমানগণ দলবদ্ধ হইয়া পুলিস বা সাহেব দেখিলেই প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। এমন কি, একদল মুসলমান স্থকিয়া-ষ্ট্রীটের থানা পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল। জেমস্ সাহেব অনন্যোপায় হইয়া কেল্লা হইতে গোরা আনাইয়া রাস্তায় রাস্তায় পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করিলেন এবং নেহাত আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে বন্দুক ছুঁড়িবারও আদেশ প্রদান করিলেন। এইরূপ দাঙ্গা মঙ্গলবার ও বুধবার প্রবল বেগেই চলিতে ছিল। এদিকে মসজিদ্ ভাঙ্গার সংবাদ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেও প্রচারিত হইয়া পড়ায় গঙ্গার ধারের কলের মুসলমান মজুরেরা কলিকাতায় আসিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ-গণের সাবধানতায় তাহারা আসিতে পারে নাই। কাঁকনাড়ার কলের মজুরেরা সেখানে কলের সাহেব কর্ম্মচারীদিগকে আক্রমণ করে এবং পনর জন মজুর সাহেবের দ্বারা চালিত বন্দুকের গুলিতে নিহত হইলে পর তাহারা নিরস্ত হয়। অন্যান্য কলসমূহেও মুসলমান-গণ উত্তেজিত হইয়াছিল, তবে সময়মত সৈন্য ও বন্দুক আসিয়া পড়াতেই কোন প্রকার বিভ্রাট্ ঘটে নাই। ইতিমধ্যে কলিকাতায় মুসলমান সমাজের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন বড় লোক উর্দ্দুতে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া দিলেন যে, মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর মসজিদ্ করিবার জন্য বিবাদী ভূমি মুসলমানদিগকে দান করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র মুসল-মানগণ আশ্বস্ত হইয়া শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। পরে জানিতে পারা গেল যে মহা-রাজ যতীন্দ্র মোহনের এইরূপ জমি দান করিবার কোনও অধিকার নাই এবং তিনি এরূপ কোনও কথা বলেনও নাই। মুসলমান নেতাগণ মহারাজার ভ্রাতার কথা সম্যক বুঝিতে না পারিয়া ভ্রমক্রমে এইরূপ প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার পর মুসল-মান্ নেতাগণ আর একটি বিজ্ঞাপন দেন যে, তাঁহারা মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই মহারাজার ভ্রাতার কথায় পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহারা জানিয়াছেন যে মহারাজার ঐ জমি দান করিবার অধিকার নাই; স্থতরাং ঐ জমিতে মুসলমান্ শাস্ত্রমত মসজিদ্ হইতে পারেনা; এবং সে মসজিদে নমাজ পড়িলে সে নমাজ আল্লার নিকট গ্রাহ্য হয় না। ধর্ম্মোন্মত্ত মুসল-মানগণ ধর্ম্মের এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া আর কোনও হাঙ্গামা করে নাই। যে সকল লোক অন্যায়জনতা ও দাঙ্গামা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত, আলিপুরে তাহাদের বিচার হইতেছে; কলিকাতার রাস্তার যুদ্ধে যে কত মুসলমান মারা পড়িয়াছে; তদ্বিষয়ে নানারূপ জনরব উঠিতেছে। দশজন হতলোকের কিনারা হইয়াছে। এই দাঙ্গার কারণ, ফলাফল, ন্যায্যতা ও হতাহতের সংখ্যা লইয়া এত টীকা টীপ্পনি হইতেছে যে আমরা আর এবিষয়ে কোনও টীকা করা অনাবশ্যক মনে করি।

পুনার হত্যাকাণ্ড।— "বিউবোনিক্ প্লেগ" নামক যে ব্যাধিতে বোম্বাই সহর উৎসন্ন হইয়া গেল, পুনাতেও সেই ব্যাধি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই দুরন্ত ব্যাধির প্রসার বন্ধ করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট এক আইন করেন যে যে ব্যক্তি এই ব্যাধি দ্বারাআক্রান্ত হইবে, সে পুরুষই হউক আর স্ত্রী লোকই হউক তাহাকে হাঁসপাতালে থাকিতে হইবে এবং সুস্থ ব্যক্তি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে না। প্রজারপ্রাণরক্ষার জন্যই এইরূপ নিষ্ঠুর বিধি অন্তঃপুরবাসিনী দিগকেও কঁচকী দেখাইয়া হাঁসপাতালে যাইতে হইবে বলিয়া স্বভাবতই হিন্দু ও মুসলমানগণ ব্যাধির কথা গোপন করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্ট একদল গোরা সেনা আনাইয়া তাহাদের উপর পুনার বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া রোগী ধরিয়া হাসপাতালে পাঠাইবার ভারার্পণ করেন। আমাদের দেশীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার বিষয়ে অজ্ঞতা বশতঃই হউক, আমাদিগের প্রতি সহানুভূতির অভাব বশতই হউক, অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার বশতই হউক, গোরা-সৈন্যগণ নাকি অনুসন্ধানের সময় নানারূপ অত্যাচার অনাচার করিয়াছিল। ফলতঃ তাহারা যে ভাবে কার্য্য করিয়াছিল তাহাতে পুনার হিন্দু মুসলমান অসন্তুষ্ট হইয়া, অতি বিনীত ভাবে অনুসন্ধানের ভার দেশীয় সৈন্যের হস্তে দিবার জন্য বম্বে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করে। ভাগ্যদোষে সে প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। এই "প্লেগ" নিবারণ করিবার জন্য যে সমিতি হইয়াছিল, তাহার সভাপতি ছিলেন, র‍্যাণ্ড নামক এক জন সাহেব সিবিলিয়ান। গত জুবিলির দিন রাত্রিকালে যখন র‍্যাণ্ড সাহেব লাট সাহেবের বাড়ী হইতে গাড়ী করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, কে দুই জন লোক তাঁহাকে ও তাঁহার পর বর্ত্তী গাড়ীতে গুলি করে। পরবর্ত্তী গাড়ীটিও একটি প্লেগ-সমিতি সংক্রান্ত সাহেবের ছিল; কিন্তু ভ্রম ক্রমে এক জন বড় দরের সৈনিক সাহেব সেই গাড়িতে চড়িয়াছিলেন। গুলির আঘাতে সৈনিক সাহেবটির তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ হয়। র‍্যাণ্ড সাহেবও কয়েক দিন পরেই সেই আঘাতেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; হত্যাকারীদের কোন প্রকার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা লর্ড স্যাণ্ডহর্ষ্ট পুনার প্রজাবৃন্দের উপর একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। তিনি দুই জন অজ্ঞাত নামা, অজ্ঞাতকুলশীল হত্যাকারীর দোষে সমগ্র পুনাবাসীকে দণ্ড দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। দুই বৎসরের জন্য পুনার অতিরিক্ত পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে। পুনাবাসীদিগকে এই পুলিশ রক্ষার ব্যয় বাৎসরিক দেড় লক্ষ টাকা করিয়া মোট তিন লক্ষ টাকা দিতে হইবে। ইহাকে দণ্ড ভিন্ন আর কি বলিব? এই দণ্ডের আজ্ঞা ত ইতি মধ্যেই বাহির হইয়াছে। কিন্তু শুনিতেছি নাকি এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের বা সংবাদ পত্র সমূহের মুখ বন্ধ হবে। সংবাদ পত্র গবর্ণমেণ্টেরপ্রতি লোকের অসন্তোষ উৎপাদন করে, এবং তাহাতেই এই প্রকার ঘটনা ঘটে, এই ধূয়া ধরিয়া গবর্ণমেণ্ট এই শাস্তির বিধান করিতেছেন। একথা শুনিয়া আমরা তো অবাক্ হইতেছি।

গো-চিকিৎসা।

গোজাতির প্রধানতঃ এই কয়েকটী পীড়া হইয়া থাকে।— ১। জ্বর ২। সর্দ্দি কাশী, ৩। পেট ফাঁপা, ৪। উদরাময়, ৫। শূল, ৬। ঘা, ৭। পালানের বাঁট ফোলা ৮। আওসা বা হমসা, ৯। গুটী বা বসন্ত।

১। জ্বর। লক্ষণ— গা কাঁটা দিয়া উঠে। খুর, শিং ঠাণ্ডা হয়, গা গরম, জল ভিন্ন আর কিছুই খাইতে চায় না।

চিকিৎসা— দাস্ত না হইলে তিসির তৈল ১২ তোলা, সোরা ১ ছটাক মিশাইয়া দিনে ৪ বার খাওয়াইবে। অথবা— ধেনোমদ ২ দিন অর্দ্ধ বোতল (১৷৷ পোয়া)খাওয়াইলে জ্বর সারিবে। জ্বর প্রায় বর্ষাকালে হয়। গরুর গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিতে দিবে না।

২। সর্দ্দি কাশী।—ফট্‌কিরি ৬ তোলা, কর্পূর ৩ তোলা, গুড় ৫০ তোলা মিশাইয়া দিনে তিন বার খাওয়াইবে। গলা সাঁই সাঁই করিলে— কাঁচা ঘাসের সঙ্গে তিসির খইল ও তিসি খাইতে দিবে। খড় আদৌ খাইতে দিবে না।

৩। পেট ফাঁপা— আদার গুঁড়া ৩ তিন তোলা দিবে। পেটের উপর ঠাণ্ডা জল দিবে। খড় দিবে না; ঘাস খাইতে দিবে।

৪। উদরাময়।— সাদা মল নির্গত হইলে— চক খড়ির গুঁড়া ১ তোলা করিয়া ৫।৭ দিন খাইতে দিবে। এই রোগ প্রায় বাছুরের হয়।

৫। শূল। লক্ষণ— যন্ত্রণায় অস্থির হয়, ছট্‌ ফট্‌ করে, আছাড় পিছড় যায়, পেটে লাথি মারিতে যায়। নূতন পীড়ায়— তিসি ও চাল সিদ্ধ করিয়া ফেনটা ছাকিয়া লইবে; এবং তাতে ৵৹ ওজনের আফিং দিয়া খাওয়াইবে। প্রথমে জোলাপ দেওয়া ভাল। পুরাতন পীড়ায়—আদৌ জোলাপ দিবে না। হিঙ্গ ১ তোলা, ভাঙ্গ ২ তোলা, জিরা ১ ছটাক গরম জলের সহিত দিন ৪।৫বার খাওয়াইবে।

৬। ঘা।—গরম জলে ঘা ধোয়াইয়া দিয়া এই ঔষধ দিবে;— কেরোসিন তৈল ২৫ তোলা, গন্ধক ১½ দেড় তোলা, কার্ব্বলিক তৈল১½ তোলা। কার্ব্বলিক তেল না পাইলে বাকি দুইটীতেই চলিবে। সামান্য ঘা হইলে ফটকিরির জল দিয়া ৩।৪ বার ধোয়াইয়া দিলেই চলিবে।

৭। পালানের বাঁট ফোলা।— ফোলা বাঁটটী গরম জলে ধোয়াইয়া ঘৃত দিয়া দলিবে ও বাঁটটি হাতে করিয়া টানিবে। ভূষির পুলটিস দিবে। পাকিলে ক্ষ.টান ভাল। নচেৎ আপনি ফাটিয়া গেলে বাঁটটী নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

৮। আওসা বা হমসা —বর্ষাকালে হয়। লক্ষণ—খুরে ঘা। মুখের ভিতর ফোস্‌কা ও ঘা। গরু জাওর কাটে না। পালানে হাত দিতে দেয় না। পা ফুলিবে, গরু খুঁড়িবে চলিবে। মলে দুর্গন্ধ হইবে। গোয়াল ঘর ভিজে থাকিলে এই পীড়া হয়।

চিকিৎসা— ফট্‌কিরির জলে মুখ ধোয়াইবে কর্পূর নারিকেলতৈল গরম করিয়া ক্ষত স্থানে দিবে। অথবা গুড় ও তুঁতে মিশাইয়া দিবে।

৯। গুটী বা বসন্ত— লক্ষণ— গরু ২।৪ দিন পালে মিশিতে চায় না। খাইতে চায় না। ঝিমোয়। গা মধ্যে মধ্যে কাঁটা দিয়া উঠে। পরে জ্বর হয়। কান ঝুলিয়া পড়ে। হাঁস্ ফাঁস্ করে। খাইতে চায় না। জাওর কাটে না। চক্ষু লাল হয়। চক্ষে জল পড়ে। নাক দিয়া সর্দ্দি পড়ে। মধ্যে মধ্যে কাশে। পাশ ফিরে না। বাঁটে আদৌ দুধ হয় না। জ্বরের ৩।৪ দিন পরে বসন্ত বাহির হয়। বাহির হইলে পেটের পীড়া হয়। বসন্ত বেশী বাহির হওয়া ভাল। শেষ অবস্থায় নাক চোক দিয়া পুঁজ পড়ে।

গরুকে গোয়ালে না রাখিয়া অন্যস্থানে রাখিবে। গোয়ালে গন্ধকের ধোঁয়া প্রতিদিন দিবে। যে গরুটি বসন্তে মরিবে তাহাকে মাটীর নীচে পুতিয়া ফেলা ভাল।

চিকিৎসা— পীড়িত গরুকে দিনে ২বার ১ছটাক করিয়া কাল লবণ খাওয়াইবে। তাহাতে উপকার না হইলে—

মুসব্বর—— ১ ছটাক } আধসের জলে
সাজিমাটী— ১ ছটাক }

সিদ্ধ করিয়া জোলাপ দিবে।

জ্বর উদয় হই[illegible] দিবে— সোরা— ২ কাঁচ্চা। সুর্ম্মা— সিকি কাচ্চা। কাল লবণ— ১ কাঁচ্চা। গন্ধক— আধ কাচ্চা খোল বা ভুষি সিদ্ধ জল— দুই সের। দিনে ২বার

বসন্ত বাহির হইলে দিনে দুই বার— কর্পূর— আধ ছটাক। চিরেতা— আধ ছটাক আফিং— ১ কাঁচ্চা। খোল— আধসের।

দাস্ত বেশী না হইলে আফিং এর পরিবর্ত্তে শুঁঠ বা গোল মরিচ দিবে।

পেট ফাঁপিলে আধ পোয়া রাই সরিষার গুঁড়া ১ সের গরম জলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিবে।

রোগ সারিবার পর দুর্ব্বলতা সারিবার জন্য ১ কাঁচ্চা হিরাকস চিরেতার জলের সহিত দিনে দুইবার খাওয়াইবে।

গোজাতির কয়েকটী পীড়া উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দাগ দিলে সারিয়া যায়। যশোর জেলা হইতে যে সকল গো-চিকিৎসক আসে তাহাদের দ্বারা, বা ঐ বিষয়ে যাহারা সুনিপুণ তাহাদের দ্বারা দাগ দেওয়ান কর্ত্তব্য।

প্রেম ও সমাজ।

পাত্রভেদে ও ব্যবহারভেদে প্রেম বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইতেছে। ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস; প্রণয়, স্নেহ, ভালবাসা, মিত্রতা আত্মীয়তা, সখ্য, সৌহার্দ্দ, সহানুভূতি, দয়া, করুণা ক্ষমা, কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য, অনুরাগ, আকাঙ্ক্ষা; ইত্যাদি সকলই প্রেমের প্রকারভেদ মাত্র। মায়া, মোহ, আসক্তি প্রভৃতি যে সকল মানসিক অবস্থা বা বৃত্তি লোকনিন্দিত, তাহাও প্রেমেরই বিকার মাত্র। এই সকল প্রকারভেদের বিষয় চিন্তা করিলেই, মানবসমাজে প্রেমের কত দূর আধিপত্য এবং প্রয়োজন, তাহা উপলব্ধি করা যায়। মানবসমাজ হইতে এ গুলি বিলুপ্ত হইলে সমাজ মহাপ্রলয়ের কুক্ষিগত হইবে। জড়জগতে আকর্ষণ যেমন বিচ্ছিন্ন

পরমাণু-নিচয়কে একত্রিত ও সুবিন্যস্ত করিয়া এই সুন্দর বিশ্ব রচনা করিয়াছে, অধ্যাত্ম জগতে প্রেমও তদ্রূপ সম্বন্ধবিরহিত, বিচ্ছিন্ন মানবমনগুলিকে পরস্পর বাঁধিয়া এই সুন্দর সমাজ গঠন করিয়াছে। জড়ীয় আকর্ষণ বিনষ্ট হইলে এই বিশ্ব মুহূর্ত্তমধ্যে বিশ্লিষ্ট হইয়া নষ্ট হইবে; প্রেম-শক্তি অন্তর্হিত হইলে এই মানবসমাজেরও সেই দশা হইবে।

জনক জননীর হৃদয়ে যদি স্বভাবতঃ অপত্যস্নেহ না থাকিত; ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে যদি সহজ স্নেহ না থাকিত; পিতামাতার প্রতি যদি সন্তানের প্রীতি সহজ না হইত; প্রতিবেশীবর্গ যদি কেহ কাহারও সুখে দুঃখে সহানুভূতি না করিত, দুঃখীর প্রতি যদি কাহারও করুণা না জন্মিত; কেহ যদি কাহাকেও বিশ্বাস না করিত, তাহা হইলে এই মানব-প্রবাহ কি এতদিন রক্ষা পাইত?—মানব-সমাজের কি এত বৃদ্ধি ও উন্নতি হইতে পারিত?

ইতর প্রাণীগণের প্রকৃতিতেও যদি স্নেহাদি না থাকিত, তবে তাহারাও এক-কালে উৎসন্ন হইয়া যাইত। আবার মনুষ্যের মত যদি তাহাদের প্রেমবৃত্তি বিকাশ লাভ করিতে পারিত, তাহাহইলে এতদিন হিংস্র জন্তুতে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। প্রাকৃতিক স্নেহ তাহাদিগের বংশ রক্ষা করিতেছে; আবার, স্নেহের অতিশয় অল্পতা এবং হিংসা-বৃত্তির প্রাবল্য বশতই তাহাদের বংশ তাদৃশ বিস্তার লাভ করিতে পারিতেছে না। নতুবা হিংস্র প্রাণীগণ যেরূপ প্রতিবারে বহু সন্তান প্রসব করে, এতদিনে তাহারা পৃথিবী ছাইয়া ফেলিত।

প্রেমই আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছে; এবং আমরা মানবসমাজে যে কিছু সুখ শান্তি এবং আনন্দ লাভ করি—যাহার অভাবে আমরা একদিনও জীবন ধারণ করিতে পারি না,—সেসকলেরও মূলে প্রেম রহিয়াছে। পিতা মাতা যদি আত্মবিস্মৃত হইয়া,—অপরাজিত স্নেহে মুগ্ধ হইয়া—সন্তানের লালন পালন ও শিক্ষাবিধান না করেন; সন্তানের শত অপরাধ ভুলিয়া তাহাকে স্নেহ-ক্রোড়ে আকর্ষণ না করেন; ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে যদি স্বয়ং ক্লেশ পাইয়াও অপরকে সুখী করিবার ইচ্ছা না থাকে, এবং সকলেই আপনাপন সুখের জন্য ব্যস্ত হয়, ও অপরের দিকে না চায়; স্বামী যদি স্ত্রীর সুখ দুঃখের চিন্তা আদৌ না করিয়া কেবল নিজের সেবা শুশ্রূষাই আকাঙ্ক্ষা করেন; পত্নীও যদি পতির অবস্থা, হৃদয়েব ভাব, ও সুখ দুঃখের দিকে দৃষ্টি না করিয়া,—তাঁহার সুখে দুঃখে সঙ্গিনী, অংশিনী এবং সহায় না হইয়া—সর্ব্বদা কেবল নিজের অসার বাসনা ও নীচ সুখাসক্তি চরিতার্থ করিতে ব্যাকুল হয়েন, এবং পতি তাঁহার অভিলষিতসাধনে অসমর্থ হইলে তাঁহাকে বিদ্বেষ বা ঘৃণা করেন; তাহা হইলে সে পরিবারে কে সুখী হইতে পারে? পরি-বারের মধ্যে যদি কেহ কাহারও দোষ, ক্রটী, অপরাধ ক্ষমা না করে, একজনের ভ্রান্তি বা মতিভ্রম বশতঃ কোন ক্লেশ বা বিপদ ঘটিলে, আর সকলে তাহার সহায় না হয়; একজনের জন্য ক্লেশ স্বীকার করিতে অপরে কুণ্ঠিত হয়; সামান্য কারণে, রোষ ও অভি-মানের বশীভূত হইয়া পরস্পর কলহ ও বিরোধ করে; তবে সে গৃহ অপেক্ষা হিংস্রজন্তু-

পরিপূর্ণ গহন কাননও কি আদরনীয় নহে? ফলতঃ সে গৃহ শ্মশান অপেক্ষাও বিরক্তিজনক, নরকাপেক্ষাও দুরাবাস্ত।

যে গ্রামে প্রতিবেশীগণ পরস্পরের সুখ দুঃখে, সম্পদে বিপদে সহানুভূতি করে না; একজনের উন্নতিতে অপরের হিংসা জন্মে; একের দুর্গতিতে অপরের আনন্দ হয়; সকলেই পরস্পরের অমঙ্গল কামনা ও মন্দ চেষ্টা করে, এবং অকারণে অথবা সামান্য কারণে কলহ, বিবাদ ও শত্রুতাচরণ করে; সে গ্রামে বাস করিয়া কে সুখী হইতে পারে?

যে দেশে রাজা প্রজাগণের সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি করেন না; প্রজাপুঞ্জের জ্ঞানোন্নতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প কৃষির উৎকর্ষ সাধনেও সচেষ্ট নহেন; সর্ব্বদা প্রজাগণের ধন-সম্পত্তি হরণ করিয়া স্বয়ং বিলাস-ভোগে মত্ত থাকেন; প্রজাগণের ধন সম্পত্তি নিরাপদে রক্ষা করিতে মনোযোগী নহেন; আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রু হইতে দেশরক্ষার ব্যবস্থা করেন না;—যে দেশে সবল দুর্ব্বলের প্রতি যথেচ্ছ উৎপীড়ন করিতে পায়; চোর দস্যুগণ লোকের ধনপ্রাণ হরণ করিয়াও রাজদণ্ড অতিক্রম করিতে পায়; প্রবঞ্চক, শঠ, নরহন্তা, পরদারী প্রভৃতি দুষ্টগণ যে দেশে সচ্ছন্দে বিরাজ করিতে পারে; গুণবান ও সাধু লোকের যে দেশে সমাদর নাই, সে দেশে—সেই অরাজক দেশে বাস করিয়া কে সুখী হইতে পারে?

কি পরিবারগঠন, কি গ্রাম নগরাদিতে বহু পরিবারের একত্র অবস্থিতি; কি বহু গ্রাম নগর লইয়া দেশ ভেদ করা; কি সামাজিক বন্ধন, কি রাজ্যস্থাপন ও রাজার আনুগত্য স্বীকার; কি ব্যবসা বাণিজ্য; কি বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা;—সকল কার্য্যের মূলেই প্রেম বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রতিনিয়ত দ্বেষ হিংসা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, জীবের সুখ দুঃখে ঔদাসীন্য প্রভৃতি বিচ্ছেদজনক প্রবৃত্তিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া—মানবসমাজরূপ দেহের এই সকল বিকলতা ও কদর্য্যতা দূর করিয়া—প্রেমই ইহাকে সুন্দর ও সুখকর করিয়া তুলিতেছে। জগতের যে সভ্যতা,—যাহাতে সমস্ত পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্ন রীতি নীতি আচার ব্যবহার বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এক সহানুভূতিসূত্রে বাঁধিয়া সমগ্র পৃথিবীকে এক দেশ এবং সমগ্রমানব জাতিকে যেন এক পরিবারভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে—সে সভ্যতাও প্রেম-মূলক। অশান্তি, কলহ, বিবাদ, যুদ্ধ বিগ্রহাদিকে এক্ষণ অসভ্যতা বলিয়া সকলেই বলিতেছেন। অপিচ, সভ্যতার সম্প্রসারণে পৃথিবীতে, শান্তি ও মৈত্রীপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রেমের পতাকা মূলে সকল জাতি হাতে হাতে ধরিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের সেবায় নিযুক্ত হইবে; এবং পৃথিবীর সুখ বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে, জ্ঞানীগণ সভ্যতার এই ভাবী চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন।

পৃথিবীর সভ্যজাতি সকলের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যে দেশে যে পরিমাণে প্রেমের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, সেই দেশ সেই পরিমাণে সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিয়াছে। সভ্য দেশে লোকেরা দেশবাসীগণের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করিবার জন্য নিয়ত সচেষ্ট।

শ্রেণী, জাতি, ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ দূর করিবার জন্য তাহাদের কত যত্ন; দরিদ্রদিগের অন্নসংস্থান করিবার জন্য তাহাদের কত চেষ্টা! যাহারা বিপন্নের সহায়তা, পীড়িতের শুশ্রূষা, দুঃখীর সেবা, ও পাপীর উদ্ধারের জন্য পরিশ্রম করে, তাহারা তাহাদিগের প্রতি কত সম্মান ও সহায়তা করে! পূর্ব্বকালে যাঁহারা অত্যাচার, উৎপীড়ন, নির্য্যাতন, লোকনিন্দা ও অন্যবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া ঐ রূপ অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের প্রতি কত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছে ও কত যত্নে তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। এক্ষণকার দিনে দিগ্বিজয়, ধনৈশ্বর্য্যবৃদ্ধি, বা বীরত্ব প্রদর্শনকে কেহ তত গৌরবের কথা মনে করে না, লোকহিতানুষ্ঠানে, প্রেমরাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় যেমন মনে করে। স্বজাতি, স্বদেশ এবং সর্ব্বোপরি বিশ্বের প্রতি প্রেমের মাহাত্ম্যই সকলে ঘোষণা করিতেছে। ইয়ুরোপীয় জাতিসকল স্বদেশপ্রেমিক বলিয়াই বেশী অহঙ্কার করিতেছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর "তোমরা আপনাদিগকে কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ মনে কর?" অমনি উত্তর করিবে, আমরা স্বদেশ ও স্বজাতিকে প্রেম করি, তাহার উন্নতির জন্যে অবলীলাক্রমে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে পারি, সকল দুঃখ প্রফুল্ল চিত্তে সহ্য করিতে পারি, তৃণের ন্যায় এই দেহ উৎসর্গ করিতে পারি।"

যে জাতির প্রেম যত বিস্তৃত ও গভীর, সেই জাতি তত প্রশংসিত হইতেছে। যে জাতি যত স্বার্থপর, সে জাতি তত অসভ্য ও বর্ব্বর বলিয়া অভিহিত হইতেছে। আবার যে ব্যক্তির প্রেম যত গভীর ও বিস্তৃত তিনি তত উচ্চতর মহত্ত্বপদবীতে স্থাপিত হইয়াছেন, তত অধিকতর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রেমই ইংলণ্ডকে ক্ষমতাশালী করিয়াছে। আবার স্বদেশ ও স্বজাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষই ভারতবর্ষকে এই সাতশত বৎসর পরপদানত রাখিয়াছে।

রোম যতদিন স্বদেশ বিদেশে প্রেমের শাসন পরিচালিত করিয়াছিল, ততদিন জগতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে। যেদিন হইতে প্রেমের অনাদর হইল, সেইদিন হইতে তাহার পতন আরম্ভ হইল। গ্রীসের যতদিন একতা ছিল, পরস্পরের উন্নতি ও শান্তির জন্য গ্রীকজাতি যতদিন সচেষ্ট ছিল, ততদিন তাহার অতুল ক্ষমতা, অসীম ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বিজ্ঞানে ভূয়সী উন্নতি লাভ হইতেছিল। যেদিন গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হইল, স্বার্থপরতা-বিষ সমাজদেহে প্রবিষ্ট হইল, সেইদিন হইতেই তাহার ক্ষয় রোগ আরম্ভ হইল। স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেম, ধর্ম্মশাস্ত্রবিধানের প্রতি অনুরাগই এক সময়ে মুসলমানদিগকে প্রায় সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য দিয়াছিল। আজ সে প্রেমও নাই, সে আধিপত্যও নাই, তেজ নাই, বীর্য্য নাই, শৌর্য্য নাই আশা নাই— কিছুই নাই। হিন্দুজাতির ইতিহাস আলোচনা করিলেও ইহারই পুনরুল্লেখ করা হয় মাত্র।

প্রেম যে কেবল জাতিগত, সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ভুলাইয়া দেয়, তাহা নহে; দুরন্ত প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকেও দমন করিয়া শত্রুর মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত করে। সাধু মহৎ ব্যক্তি দিগের জীবনে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত

দেখা যায়। সামাজিক ভাবেও ইহার প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। চোর, দস্যু, প্রবঞ্চক, ব্যভিচারী, নরহন্তা প্রভৃতি পরপীড়ক ব্যক্তিদিগকে সকলেই সমাজের শত্রু বলিয়া ঘৃণা করে, এবং তাহাদের উচ্ছেদ সাধনার্থ সকলেরই যত্ন আছে। পৃথিবীর অসভ্যাবস্থায় চোরকে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। গুরুতর অপরাধীদিগকে শূলে দিয়া, সর্ব্ব শরীরে অস্ত্রাঘাত করিয়া ক্ষত স্থানে লবণ প্রক্ষেপ দিয়া; কুকুর দ্বারা ভক্ষণ করাইয়া, অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, ও আরও নানা প্রকার অসহ্য যাতনা দিয়া, লাঞ্ছনা করিয়া বিনাশ করা হইত,তাহাদিগের যাবতীয় সম্পত্তি হরণ করা হইত। এক্ষণে সে সকল প্রথা বর্ব্বরোচিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। নরঘাতকদিগকেও অনেক স্থলে কেবল সামান্য কারাদণ্ড মাত্র দেওয়া হয়। যেখানে প্রাণদণ্ড হয়, সেখানেও অপরাধী যাহাতে বিনাকষ্টে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার ব্যবস্থা আছে। আবার, কারাগারে যাহাতে বন্দীগণ উত্তম আহার, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা কারাগারস্থ অপরাধীগণের নীতি চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন, অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগকে সংশোধনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতেছে;—যাহাতে তাহারা বয়স্ক পরিপক্ক দুর্ম্মতিদিগের সংস্রবে পড়িয়া আরও দুষ্ট না হয়; বিদ্যা ও ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া উত্তর কালে সাধুজীবন যাপন করিতে পারে, তজ্জন্য কত সুব্যবস্থা হইতেছে। অপরাধীর শরীরের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, ডাক্তারের অভিমত লইয়া শারীরিক দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা হইতেছে। ফলতঃ নিষ্ঠুরতা সর্ব্ব প্রকারে পরিহার করিবার দিকেই একটা লক্ষ্য রহিয়াছে। ইহার ভিতরে কি প্রেমের লীলা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না ?

এক্ষণকার দিনে এক জাতি যখন অপর জাতির রাজ্য গ্রহণ করে, তাহাদের উপর প্রভুত্ব করে, তখনও জগতের নিকট যদি প্রমাণ করিতে না পারে যে তদ্দ্বারা সেই জাতির মঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাহা হইলে নিন্দাভাজন হইতে হয়। সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, কেবল উৎপীড়িতের রক্ষা, পদদলিতের উদ্ধার সাধন, নিজের অথবা অপরের স্বীয় অধিকার-রক্ষা প্রভৃতি নিঃস্বার্থ পরোপকার, অথবা আততায়ীহইতে আত্মরক্ষার একটা কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে, জগৎ সে যুদ্ধ বিগ্রহকে নিন্দা করিতেছে। ইহারও ভিতরে প্রেমের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ভগবানের প্রেমের হস্তই মানবসমাজকে পরিচালিত করিতেছে। ধীরে ধীরে প্রেমেরই রাজত্ব প্রসারিত হইতেছে;— প্রেমেরই জয় হইতেছে। শৌর্য্য বীর্য্য, ধনবল, বাহুবলের আশু জয় দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী; প্রেম আশু পরাজিত বলিয়া বোধ হইলেও, পরিণামে তাহারই জয় হইতেছে। দিগ্বিজয়ী মহাপরাক্রমশালী বীরগণের জয় পতাকা দেখিতে দেখিতে কালকুক্ষিগত হইয়াছে; আর সংসারে অপমানিত, ঘৃণিত, নিপীড়িত, পরিত্যক্ত, প্রেমিক ফকিরদিগের রাজ্য দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। কত যরক্ষাস, দেরায়স, নাদির সা, জঙ্গীস খাঁ আলেকজেণ্ডার, সিজার, নেপোলিয়ন লুপ্ত হইল; অপরদিকে বুদ্ধ, যিশু, চৈতন্য, মহম্মদ

লুথার; ব্যাস, বাল্মিকী, নারদ; শার্প, হাউয়ার্ড ডামিয়েন প্রভৃতি গৃহহীন ফকীরদিগের প্রভাব দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে। অবিশ্বাসী মানব এক বার চাহিয়া দেখ, দেখিয়া শিক্ষা কর, শিখিয়া জীবন গঠন কর; —প্রেমের আদর্শে জীবন গঠন করিয়া ধন্য হও, কৃতার্থ হও,— মানবজীবনের মহাব্রত পালন করিয়া বিধাতার ইচ্ছা পরিপূর্ণ কর।

বাঙ্গালীর শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান।

বাঙ্গালীর শিক্ষাতে বাঙ্গলা ভাষা এক্ষণে যে পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে, তদপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়া উচিত কি না, কয়েক বৎসর হইতে এই বিষয়ের জল্পনা চলিতেছিল। গত বৎসর অনেক গুলি কৃতবিদ্য লোক কলিকাতায় একটী সভা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার অধিকতর প্রচলনের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন; সে চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ সভ্যই ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধমতাবলম্বী। যাহা হউক, এবিষয়ে বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগের যুক্তি ও তর্কগুলির প্রতি মনোযোগ দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে প্রশ্নটী গুরুতর চিন্তার বিষয়; এবং সকলেরই এবিষয়ে যাহাতে একটা সুমীমাংসা হয়, তদ্রূপ চেষ্টাকরা উচিত।

এ বিষয়ে বিভিন্ন মতাবলম্বীরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোনও মতের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহার বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের কথা একেবারে অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। সকল দলেরই যুক্তি তর্কে বাস্তবিক কোন সত্য নিহিত আছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করা উচিত। ওকালতীর ন্যায় কেবল আত্মমত সমর্থনের চেষ্টা করিলে প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হওয়া কঠিন।

পক্ষান্তরে, একটা কথা শ্রুতিকটু বা ধৃষ্টতা-সূচক মনে হইলেও বলা আবশ্যক যে অধিকাংশ লোকের মতবিরুদ্ধ বলিয়া যাহা পরিত্যক্ত হইল তাহা অযথা; আর যাহা অধিকাংশের মতপোষিত বলিয়া রক্ষিত হইল তাহাই ঠিক, একথাও স্বীকার্য্য বলিয়া মানিতে পারি না। তাহা হইলে কোন পরিবর্ত্তনই যুক্তিযুক্ত হইত না। দেখিতে পাওয়া যায় যে যখন যে কোন মতই সাধারণের মধ্যে প্রবল থাকে, তখন সেই মতের বেগেই অধিকাংশ লোক চালিত হইয়া থাকে; তখন বিপরীত মতের কোন সত্য গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তিই হয় না, এবং যতদিন সেই সত্য অপেক্ষাকৃত প্রস্ফুটিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। সুতরাং অধিকাংশের মত বা অমত সত্যাসত্যের নিয়ামক বলিয়া স্বীকার করিতে কেহ বাধ্য নহে।

"শৈশবাবধিই ইংরাজিতেই শিক্ষা কার্য্য চলা উচিত," অধিকাংশ লোকই এই মতের পক্ষপাতী বলিয়া বোধ হয়। স্পষ্টতঃ অনেকে মুখে এ কথা না বলিলেও কার্য্যতঃ এই

মতের পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহাদের মতের সপক্ষে যে সকল যুক্তি ও কারণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে বা হইতে পারে, তাহার কতকগুলি সঙ্কলিত করা গেল।

১। ইংরাজি রাজভাষা। রাজদরবারে, রাজার বিচারালয়ে, রাজকার্য্যে, রাজজাতির বা রাজার সহিত সংসৃষ্ট সকল বিষয়েই ইংরাজি ভাষাতেই কার্য্য হইয়া থাকে। চাকরি দ্বারা অন্ন সংস্থান করিতে হইলে, বা ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় বা অপর অনেক ব্যবসায় অবলম্বনদ্বারা জীবিকার পন্থা অন্বেষণ করিতে হইলে, ইংরাজি ভিন্ন চলে না। রাজ্যশাসন বিভাগে বা বিচার বিভাগে বা যে কোন বিভাগেই বলুন, উচ্চপদস্থ বা নিম্ন পদস্থ চাকরিতে দেশীয় লোকের প্রবেশ বা উন্নতিলাভ ইংরাজী ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি ভিন্ন সম্ভবপর নহে।

২। ইংরাজি ভিন্ন রাজার সহিত প্রজার ঘনিষ্টতাই বা কি রূপে হইতে পারে; পরস্পর পরস্পরের অবস্থা ও ভাব গতিক প্রভৃতি বা কি রূপে পরিজ্ঞাত হইতে ও প্রকাশ করিতে পারিবে?

৩। ভারতে বহু প্রকার ভাষা প্রচলিত। ভারতবাসীগণের মধ্যে পরস্পর মিলিত হইয়া ও এক ভাষায় কথা কহিয়া পরস্পরের মনের ভাব ব্যক্ত করতঃ একতার বৃদ্ধি করিতে হইলে, সমস্বরে রাজার নিকট দুঃখ জানাইতে হইলে ইংরাজির আবশ্যক।

৪। জ্ঞানশিক্ষা সম্বন্ধেও ইংরাজি শিক্ষা ভিন্ন উপায় নাই। বাঙ্গালাতে পুস্তক কোথায়? আর যদিও কেহ অনুবাদাদি দ্বারা সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতির পুস্তক প্রণয়ন করেন, তথাপি মূল হইতে পাঠ করায় যত উপকার ও সুবিধা, অনুবাদ হইতে তত নহে; বিশেষত বাঙ্গালাতে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক কথা নাই। যদিও নূতন কথা প্রস্তুত করা যায়, তাহা এত কঠিন ও দুর্বোধ্য হয় যে তাহা অপেক্ষা ইংরাজি কথা পড়া ভাল।

৫। পাশ্চাত্য সাহিত্য পাশ্চাত্য জ্ঞানের ও চিন্তার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ। পাশ্চাত্য ভাষায় জ্ঞান শিক্ষা করিতে করিতে চিন্তার গতিও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ও উন্নত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইংরাজির জন্য। বাঙ্গালা ভাষার কিছুই ছিলনা বাঙ্গালা ভাষা কখনও লিখিত ভাষা ছিল কিনা সন্দেহ। যাঁহারা আধুনিক বাঙ্গালার জন্মদাতা বা সংস্কারকর্ত্তা, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ইংরাজিতে কৃতবিদ্য ছিলেন, অথবা ইংরাজির সহিত সংসর্গ রাখিতেন বলিয়াই বাঙ্গালাকে বর্ত্তমান অবস্থায় আনিতে পারিয়াছেন; তাহাতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের অস্তিত্ব।

৬। যেমন চিত্রকর একটি বর্ণকে আবশ্যক মত কখন গাঢ়, কখন অপেক্ষাকৃত ফ্যাকাশে, কখন খুব পাতলা করিয়া ফলাইয়া থাকেন, অথবা যেমন একই বস্তুকে বিভিন্ন দিক হইতে দেখাইতে হইলে, চিত্রে বর্ণের বিভিন্নতা ও গাঢ়ত্বের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে হয়, কিম্বা যেমন চিত্রটীকে সম্পূর্ণ ও স্বভাবানুরূপ করিতে হইলে চিত্রের বিশেষ বিশেষ স্থানে, বিশেষ বিশেষ পদার্থ অঙ্কিত করিতে হয়, ভাষাসম্বন্ধেও সেইরূপ। একই ভাবের গাঢ়তার বা মাত্রার তারতম্য বুঝাইতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

আবার উপমা বা রূপকের সাহায্যে ভাব প্রকাশের সুবিধা হয় বলিয়া নানা স্থান, নানা বিষয়ও নানা ভাব হইতে কথা লইয়া ব্যবহার করিতে হয়; কালে সেই কথা গুলির অলঙ্কারত্ব ঘুচিয়া গিয়া এমন হইয়া পড়ে যে সেই অলঙ্কারবাচক শব্দ বা বাক্য ভিন্ন যে ভাবটি প্রকাশের আর সন্তোষজনক উপায় থাকে না। এই সমস্ত সুবিধা ইংরাজীতে বেশী; বাঙ্গালা নূতন ভাষা, ও অতি অল্পসংখ্যক বিষয়ের ভাব প্রকাশে সক্ষম, তাহাও অতি মোটামুটী রকমে।

পাশ্চাত্যদিগের সংস্রবে এত নূতন বিষয় ও নূতন ভাব আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে যে তৎসংসৃষ্ট সকল ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দ বা প্রণালী এখনও বাঙ্গলায় হয় নাই, অথবা এমন ভাবে হইয়াছে যে তাহাতে ভাব হৃদয়ঙ্গম বা অর্থের স্পষ্ট অভিব্যক্তি হয় না। এই সমস্ত কারণেই হউক বা তৎসঙ্গে অপর কোন কারণই থাকুক, ফলে ইহাই দেখা যায় যে কোন একটা ভাব লোকের মনে প্রগাঢ়রূপে মুদ্রিত বা অঙ্কিত করিয়া দিতে হইলে বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে ইংরেজী ব্যবহারেই বেশী ফল হয়।

৭। দেখা যায় যে কোন বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করিলে বা লিখিলে বাঙ্গালী শ্রোতা বা পাঠক যেমন আগ্রহ সহকারে শ্রবণ বা পাঠ করেন, বাঙ্গালায় সেরূপ করেন না।

তবেই দেখা যাইতেছে ইংরাজী ভাষা শিক্ষাতে আমাদের বিস্তর উপকার। দেশ কাল পাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সকল দিক বিবেচনা করিলেই দেখা যায় ইংরাজীর সহিত আমাদের অবিচ্ছিন্ন চিরসম্বন্ধ; সুতরাং যাহাতে ইংরাজী ভাষাতে আমরা বিশেষ পারদর্শী হইতে পারি, তাহাই করা কর্ত্তব্য। আরও, ইংরাজীতে যখন জ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে, তখন সেই ভাষায় যাহাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও অভ্যস্ত হইতে পারি, তাহাই করা উচিত। এই জন্য শৈশবকাল হইতেই ইংরাজী ভাষা শিখিতে চেষ্টা করা উচিত। যে কোন বিষয়ে শিখিতে বা লিখিতে হইবে, ইংরাজীতেই তাহা করিলে ইংরেজী ভাষাও অভ্যস্ত হয়, কার্য্যেরও সুবিধা হয়। যদি শিশুর বাক্‌স্ফূর্ত্তির সময় হইতেই মাতৃভাষার সঙ্গেই ইংরাজীতে তাহাকে কথা কহিতে শিখাইতে পারা সম্ভব হয়, তবে তাহা করাও কর্ত্তব্য। এমন কি, পরস্পরের মধ্যে কথা বার্ত্তা কহা ও চিঠি পত্র লেখাও ইংরাজীতেই যতদুর সম্ভব করা ভাল। মাতাদ্বারা সন্তানের শিক্ষার বিশেষ সাহায্য হয়; এজন্য মহিলা ও বালিকাগণকেও ইংরাজী শিখাইলে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা। সুতরাং শিশুদিগের বা কৈশোরবয়স্ক বালক দিগের জ্ঞানশিক্ষা ইংরাজী ভাষাতেই হওয়া উচিত, তাহার আর কথা কি ?

এই গেল এক দলের কথা। ইহার বিরুদ্ধবাদী দুইটী দল আছে। তাহার এক দল ইংরাজীতে দেশের বিশেষ কোন উপকার হওয়া স্বীকার করিতে বড় একটা ইচ্ছুক নহেন, বরং তাহাতে বিশেষ অনিষ্টাপাত হইতেছে বলিয়া দুঃখ করেন। ইঁহারা সচরাচর যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহার কতকগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে।

ইংরাজী সাহিত্য পাঠে জাতীয়তা নষ্ট হইতেছে; ধর্ম্মদ্বেষ বা ধর্ম্মে বিতৃষ্ণা দেশ

মধ্যে বিস্তৃত হইতেছে; উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইতেছে লোকে গুরুজনও বয়োধিকের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইতেছে; যাহা কিছু পাশ্চাত্য, তাহারই প্রতি অনুরক্ত ও যাহা কিছু দেশীয় তাহার প্রতি ভাবতঃ বা কার্য্যতঃ যেন বীত-শ্রদ্ধ হইতেছে; যাহা বাস্তবিক সদ্‌গুণ ও যাহাকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বলা যায়, এরূপ সারবত্তার প্রাচুর্য্য না হইয়া, অধিকাংশ লোকে কেবল প্রচলিত রুচি বা সখের স্রোতে ভাসিয়া, গড্ডালিকাপ্রবাহের ন্যায় চলিয়াছে; এবং অন্ধভাবে কেবল পাশ্চাত্য সভ্যতার খোলস পরিয়া কৃতার্থম্মন্য ও সফলকাম মনে করিতেছে। জাতীয় ভাব, জাতীয় রীতি নীতি, এমন কি, জাতীয় ভাষার প্রতিও মমতার অভাব বহুল পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে, ইহা অতি শোচনীয় অবস্থা।

এই সমস্ত বা এইরূপ কতকগুলি কারণে বিপরীতবাদী একদল ইংরাজি ও সাধারণতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী।

অপর যে এক দলের কথা বলিয়াছি, ইঁহারা ইংরেজি শিক্ষার আদৌ বিরোধী নহেন; তবে ইঁহারা শিক্ষাতে বাঙ্গলা ভাষা আরও অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, এবং আমাদের যতদূর জানা আছে, তাহাতে ইঁহারা আপন মতের যুক্তি-যুক্ততা সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটী কারণ দেখাইয়া থাকেন।

১। কিশোরবয়স্ক বালক বা সুকুমার-মতি শিশুদিগকে মাতৃভাষাতেই প্রধানতঃ জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া উচিত; তাহাতে অল্পবয়সেই অধিক শিক্ষালাভের সম্ভাবনা। ইংরাজী ভাষাও শিখান কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা কেবল ভাষার খাতিরে। বড় হইয়া ইংরেজীতে বিজ্ঞান ও দর্শনাদি পুস্তক পড়িতে পারে, কৈশোরে ইংরাজিতে এইরূপ শিক্ষাই দিতে হইবে মাত্র।

২। ইহাতে আর এক উপকার এই যে, এতদ্দ্বারা দেশীয় ভাষা ও দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হইবে।

এই দুইটি কারণ ব্যতীত এই প্রকার মতাবলম্বীদিগের পোষক আরও দুই একটি গুরুতর কারণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে, যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করা যাইবে।

এই তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যে মতের পার্থক্য বা বৈপরীত্য থাকিলেও সকলেরই যুক্তির মধ্যে অল্প বিস্তর পরিমাণে সত্য নিহিত আছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

ইংরাজিশিক্ষায় দেশের উপকার হয় নাই, একথা বলাই অনুচিত। গবর্ণর জেনারেল বেণ্টিঙ্কের আমলে যখন কথা উঠিয়াছিল এদেশের লোকের শিক্ষা কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই আবদ্ধ রাখা উচিত, কি পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, সেসময় রাজা রামমোহন রায় ও লর্ড মেকলের যুক্তিপূর্ণ তর্কে যদি কোন ফল না ফলিত, তাহা হইলে আজ বাঙ্গালা দেশে শিক্ষা ও শিক্ষিত সম্প্রদায় কোথায় থাকিতেন, ও বাঙ্গালা ভাষাই বা কোথায় থাকিত, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। জ্ঞানশিক্ষা বিষয়েই বলুন, রাজ-কার্য্যে উচ্চপদের অধিকারিত্বই বলুন, আর অপেক্ষাকৃত সামান্য পদের অধিকারিত্বই বলুন; ভারতীয় বিভিন্ন জাতিসকলের মধ্যে একতা রক্ষণের উপায়স্বরূপই বলুন, অথবা অনেক স্থলে জীবিকানির্ব্বাহের হেতুস্বরূপই

বলুন, এইরূপ অনেক কারণেই ইংরাজি শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, ইংরাজিপ্রধান শিক্ষাপ্রণালী কি দোষহীন ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন-স্থায়ী মঙ্গলকর প্রণালী? প্রতিপক্ষের প্রদর্শিত দোষ গুলির কি কিছুমাত্র অস্তিত্ব নাই? পাশ্চাত্য সাহিত্যের বলবত্তায় লোকে যদি পাশ্চাত্য ভাব ও চিন্তায় অনুপ্রাণিত হইতে পারে, তবে পাশ্চাত্য সমাজের গুণভাগের সহিত দোষভাগও অভ্যস্ত হইবে না কে বলিল? দেশীয় ভাব, চিন্তা ও রুচির যে বিকৃতি হইবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? এ মতে চলিলে স্বদেশের ভাষা ও সাহিত্যের যে অবনতি হইবে না তাহার প্রমাণ কি? দেশীয় ভাষায় জ্ঞানশিক্ষা করিলে শীঘ্র শিখিতে পারা যায়, তাহা কি কল্পনা?

যাহা হউক, মীমাংসা যতক্ষণ রুচি বা খেয়ালের উপর নির্ভর করিবে, ততক্ষণ প্রত্যেক পক্ষ স্ব স্ব প্রধান থাকিতে পারিবে; কিন্তু কোন স্থির মীমাংসার সম্ভাবনা থাকিবে না; কেহ কাহারও পথে যাইতে স্বীকৃত হইবেন না, কেহ কাহারও কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন না বা বুঝিতে চাহিবেন না। কাহার মতে চলিতে হইবে, কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, ও ফলের দিকে লক্ষ্য করা আবশ্যক। লাভ ও ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করাও দরকার হইতে পারে। আবার লাভ লোক্‌সানের তুলনায় কেবল পরিমাণের দিকে দৃষ্টি রাখাও অনেক সময় ভ্রান্তিজনক। কোন আপাতঃ লাভ দূরবর্ত্তী গুরুতর ক্ষতির কারণ হইলে, তাহাকে ষোল আনা লাভ বলিয়া ধরা ভ্রম। সেইরূপ, যাহা সম্প্রতি বিশেষ লাভ বলিয়া বোধ হয় না, তাহা কোন স্থায়ী উপকারের হেতু হইলে, তাহাকে লোকসান মনে করা উচিত নহে। যে উপায় অবলম্বন করিলে এইরূপ লাভালাভের হিসাবে মূল উদ্দেশ্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে পারা যায়, তাহাই সদুপায়। আপাতঃ মধুর সামগ্রী রসনার তৃপ্তিসাধক হইলেও দেহপুষ্টির সহায় না হইতে পারে; "চাকচিক্যময় পদার্থ মাত্রেই সুবর্ণ না হইতে পারে।" এইজন্য, কোন্ দলের কথা ঠিক, বা কাহার কথার কতটুকু গ্রাহ্য, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, অথবা কোন্ পন্থায় লাভ অপেক্ষা ক্ষতির পরিমাণ কম, এবং কোন্ উপায় অপেক্ষাকৃত যুক্তিযুক্ত, তাহা স্থির করিতে হইলে, কয়েকটী মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত যথা :—

১। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, ও শিক্ষা বলিলে কি বুঝিতে হইবে?

২। ব্যক্তিগত বা জাতিগত উন্নতি বা অবনতির সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ কি?

৩। ভাষার সহিত শিক্ষার কি রূপ সম্বন্ধ?

লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে লোকে আপাতঃ সুন্দর পদার্থকে উত্তম বোধে আলিঙ্গন করিয়া হয়ত বিষম অনিষ্টের সুত্রপাত করিবে; না হয় ভ্রান্তের ন্যায় ভবিষ্যতের স্থায়ী উপকারের পন্থা পরিত্যাগ করিবে; আর লক্ষ্য স্থির থাকিলে অপেক্ষাকৃত সহজে ও

নিরাপদে গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য বিষয়ের বিচার করিতে পারিবে। ক্রমশঃ

আমার মোকদ্দমা।

(১৫০পৃষ্ঠার পর হইতে)

এখন সময় পাইলেই মোকদ্দমার চিন্তাই আমাকে অধিকার করিয়া বসিত। একদিন বৈকালে তামাক টানিতে টানিতে উঠানে বসিয়া ঐ বিষয় ভাবিতেছি, এমন সময়ে দাদা মহাশয় তাঁহার চিরাভ্যস্ত বেশে উপনীত হইলেন। দাদার পায় চটী, পরনে থানফাড়া ধুতি, গলায় হরিনামের মালা, কাঁধে মলমলের চাদর, হাতে নস্যাধার, আর কপালে চন্দনের রেখা, একই ভাবে সকল সময়ে বিরাজ করিত। তাঁহার চটির চট্ চটা শব্দেরও বিভিন্নতা ছিল না; শুনিয়া শুনিয়া আমার এমন অভ্যাস হইয়াছিল যে আমি দূর হইতেই তাঁহার শুভাগমন অনুমান করিতে পারিতাম। আজও তাহাই হইল; আমি তামাক খাওয়া বন্ধ করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া আগুণে ফুঁ দিতে লাগিলাম, এবং দাদা আসিবামাত্র তাঁহার হাতে হুঁকাটী দিলাম। তিনি তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন,"ভায়া,বড় ভুল হয়েছে; রামদাস যে এতটা চালাকি করবে, তা আমার মনেও হয়নি।" আমি সবিস্ময়ে বলিলাম "কি হয়েছে?" দাদা বলিলেন, "রামা সনাতনের জমিজায়গা সমস্ত বেনামি কোয়ালা ক'রে ফেলেছে। মতলব যে রেজিষ্ট্রী তমসুকের নালিশ ডিক্রী ত হবেই; তবে বেনামি কোয়ালা টা হ'লে পাকেপ্রকারে ফাঁকি দিবে। জমি জায়গা না থাকলে আর কি নীলাম করা যাবে?"

আমি রামদাসের কৌশলের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। মানুষে এত প্রবঞ্চনা করিতে পারে তাহা আগে জানিতাম না; আজ প্রত্যক্ষ করিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। দাদা বলিলেন, "ভায়া,বোধকরি বড় ভয় পেয়ে গেলে; কিন্তু তা হ'লে চলবে না; যেমন রোগ সেই রকম ঔষধের বিধান করতেই হ'বে।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম 'তবে কি কোন উপায় আছে?"

দাদা মহাশয়ের অধরপ্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল; অতি ধীরে নস্যের ডিবাটী খুলিয়া বেশ এক টীপ সজোরে টানিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত পৌছাইলেন; তারপর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "দাদা, বুড়ারমাথায় সব আছে; তবে তোমরা টাকা খরচে নিতান্ত কাতর; সেই জন্যেই আগে বলিনি; উপায় আর নাই?"

দাদার কথা শুনিয়া আমি কতকটা আশ্বস্ত হইলাম; খরচের কথাটা ভাবিতে ইচ্ছা হইল না; যেরূপে হউক,উপযুক্ত প্রতিবিধান

করিতে দাদাকে অনুরোধ করিলাম। দাদা বলিলেন "সেই জন্যই এসেছি। শুনলাম কোয়ালা হয়েছে,কাল নাকি রেজিষ্ট্রী কর্‌বার জন্য মাগিটাকে নিয়ে যাবে।"কোথায়রেজিষ্ট্রী হয় জানিতাম না, দাদার নিকট শুনিলাম চারি ক্রোশ দূরে সবরেজিষ্ট্রারের আফিশ, সোণার বৌ পাল্‌কিতে সেখানে যাইবে। দাদার পরামর্শে এইরূপ স্থির হইল যে অবিলম্বে সবরেজিষ্ট্রী অফিসে যাইয়া যাহাতে ঐ কোয়ালা রেজিষ্ট্রী না হয়,তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আর এদিকে আদালতে সম্পত্তি ক্রোকের প্রার্থনা করিয়া দুইদিনের মধ্যে ক্রোক আনিতে হইবে। এরূপ করিতে পারিলে রামদাসের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই সকল কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম; কিন্তু দাদার নিকট খরচের হিসাব শুনিয়া প্রাণ চমকিয়া উঠিল; কি বলিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। দাদা বলিলেন" ভায়া এ কেবল টাকার খেলা, যদি সঙ্গে সঙ্গে কাজ চাও, পয়সার মায়া কর্‌লে চল্‌বেনা; এতে যারই কাছ দিয়ে যেতে হবে, তাকেই সন্তুষ্ট কর্‌তে হ'বে।" আমি দেখিলাম উপায়ান্তর নাই। এত যে অর্থ ব্যয় করিলাম, কোয়ালা হইয়া গেলে সমস্তই পণ্ড হইবে; সুতরাং টাকার দিকে চাহিয়া আর কি করিব? দাদাকে বলিলাম "আপনি যা ভাল বুঝেন, তাই করুন্"দাদা বলিলেন "করাকরি নয়, এখনই যেতে হ'বে; ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত খরচ হবার কথা; আমার কাছে তোমার যা টাকা আছে, তাতেই হতে পারে। আমি তুমি এস।"এই কথা বলেই দাদা গাত্রোত্থান করিলেন এবং কয়েক পা যাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "দেখ, যে রকম তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে,তাতে আমরা যে যেয়েই ফিরে আস্‌তে পারব, তা সম্ভব নয়; আমি তাই বলি যে তোমার আর যেয়ে কাজ নাই; তুমি বাড়ীতেই থাক; ক্রোক নিয়ে পেয়াদা পৌঁছিলে ক্রোক করিয়ে দিবে। তবে একটা জবানবন্দী দিতে হ'বে;তার কি করা যায়?" আমি চুপ করিয়া রহিলাম; তিনি একটু পরে বলিলেন "আচ্ছা, রমানাথকে আমার সঙ্গে দিলে হয় না? সেই জবানবন্দী দিবে।" আমি বলিলাল 'রমানাথ ছেলে মানুষ,সে কি পারবে? আমি এতদিন যাচ্ছি, আমারই ভয় হয়।" দাদা হাসিয়া বলিলেন 'ভায়া, ছেলে বুড়ো সবাই ঠিক হয়ে যাবে, মুহুরি বাবুর শিক্ষাতে সবাই পাকা হয়ে উঠবে; তোমার কিছু ভয় কর্‌তে হবে না।" এত গুলি টাকা কি রূপে খরচ হয়, দেখ্‌বার জন্য আমার যাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু আমি বাড়ীতে না থাকিলে ক্রোক করা চলিবেনা শুনিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম শেষে দাদাকে জানাইলাম যে আমি পেয়াদার সহিত ফিরিয়া আসিতে পারিব; আমার কোন কষ্ট হইবে না। কিন্তু দাদা সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন 'ওহে ভায়া, রমানাথকে সঙ্গে নিবার একটা উদ্দেশ্যও আছে। ডিক্রী হ'বার আগে ক্রোকটা হাকিমেরা সহজে দিতে চান না। রমানাথ ছেলে মানুষ, তাকে দেখিয়ে কাজ হাসিলের চেষ্টা করব। ডিক্রীতে সেই

দাঁড় করিয়ে হাকিমের চ'খে ধূলা দিবার বড় সুবিধা হয়।" দাদার এই ফিকিরের কথা শুনে তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়ে মনে মনে বল্‌লাম "আপনার এই বুদ্ধির সহায়তা লাভ পরম ভাগ্যের কথা; আপনি যদি ফাঁকি দিয়েও টাকা নেন, তাহাতেও আমার ক্ষতি নাই; আপনাকে সন্দেহ করিয়া আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞের কাজ করেছি।" কিন্তু আমার মনে মনে কি স্রোত বহিয়া গেল, বোধ করি দাদার তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি বলিলেন, "কিন্তু ভায়া, অনেকগুলি টাকা খরচ; এটা তুমি থেকেই করা ভাল। তুমিই যাও, আমি পত্র লিখে দিচ্ছি, আমিই বাড়ীতে থাকি।" আমি বলিলাম,'তাও কি হয়,আমি কি জানি কি কর্‌ব? আর আপনি কি পর, যে আপনাকে অবিশ্বাস কর্‌ব?" দাদা বলিলেন 'না হয় তুমি রেজিষ্ট্রী অফিস পর্য্যন্ত চল;সেখান থেকে আমায় রমানাথে চলে যাব,তুমি বাড়ী ফিরে আস্‌বে। রাত হ'য়ে যাবে, তুমি না গেলে যেতে সাহস হবে না।" আমি বুঝিলাম, এটা কেবল দাদার কৌশল; রেজিষ্ট্রী অফিশের খরচা দেখিয়ে কি পরিমাণ ব্যয় হ'তে পারে, তৎসম্বন্ধে আমার একটা ধারণা করিয়ে দেওয়া মাত্র। যাহা হউক, দাদার কথামতে রমানাথকে সঙ্গে লইয়া তিন জনে যাত্রা করিলাম। রমানাথকে বিদায় দিয়া মাতার চক্ষু জলে ডব্‌ ডব্‌ করিতে লাগিল। আমরা সন্ধ্যার সময় সব রেজিষ্ট্রী অফিশে পহুঁছিলাম। কেরাণী বাবুর খোঁজ করা গেল,— তিনি বাসায় চলিয়া গিয়াছেন। রমানাথ ৪ ক্রোশ পথ চলিয়া কাতর হইয়াছিল; কাজেই বাসা লইয়া জলযোগ করিতে হইল। তার পর রাঁধিবার বন্দোবস্ত করিয়া, রমানাথের উপর ভার দিয়া আমরা কেরাণী বাবুর বাসায় গমন করিলাম।

কেরাণী বাবুর সহিত তাঁহার পূর্ব্বাবধিই আলাপ পরিচয় ছিল। কিন্তু রাত্রিতে বাসায় যাইতে দেখিয়া, বিশেষ কাজ রহিয়াছে বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না। তিনি বলিলেন "কে তোমরা?" দাদা বলিলেন "চণ্ডী বাবু, চিন্‌তে পার্‌ছেন না? আমার নাম বিশ্বম্ভর দাস।" চণ্ডী বাবু বল্লেন "কত শত দাস বোস ঘোষের সহিত আমার প্রতিদিন দেখা হয়, চিনিতে পারা সম্ভব নহে।"

দাদা বল্লেন 'আচ্ছা চিনিয়া কাজ নাই। এখন আমাদের কাজের কথা শুনুন্‌।' এই বলিয়া, দাদা সমুদয় কথা বলিলেন, এবং উপযুক্ত পারিতোষিক অঙ্গীকার করিলে না চণ্ডী বাবু বলিলেন "স্ত্রী লোকের উপর কোন রূপে যাহাতে অত্যাচার হবে,সে কাযে আমি থাকবো না,আপনারা যান।" দাদা বলিলেন, "না পারেন ত কাযেই যেতে হবে। আমরা ৫টাকা তক দিতে পারি!" চণ্ডী বাবু হাসিয়া উঠিলেন। শেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর ৯ টাকা ধার্য্য হইয়া বায়না স্বরূপ ৫ টাকা দেওয়া গেল, এবং সনাতনপত্নীকে ফিরাইয়া দিলে বাকি ৪টাকা দিবার কথা থাকিল।

টাকা দিয়া দাদা বলিলেন "চণ্ডী বাবু, সে মোকদ্দমার কথা মনে পড়ে? এক বৎসর হয় নি, এর মধ্যে ভুলে গেলে?"

এই বলিয়া চণ্ডী বাবুর উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়াই দাদা উঠিয়া পড়িলেন। আমরা বাসায় আসিয়া আহারান্তে নিদ্রা দেবীর

সেবায় নিযুক্ত হইলাম; কিন্তু মশার তাড়নায় দেবীর আবির্ভাব হইল না।

প্রভাতে উঠিয়া, দাদা ও রমানাথ যাত্রা করিলেন। সোনার বৌ ফিরিয়া গেলে কার্য্য সমাধার পর চণ্ডী বাবুর বাকি টাকাদিবার জন্য আমি থাকিলাম। প্রাতঃকালে স্নানাহার শেষ করিয়া, ৯ টার সময় অফিসে গেলাম। রাম দাস ভগ্নীকে লইয়া ইতিপূর্ব্বেই আসিয়াছিল। আমি তাহাদিগকে দেখা না দিয়া, গোপনে চণ্ডী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রামদাস কে চিনাইয়া দিলাম। ১১ টার সময় সব-রেজিষ্ট্রার বাবু বার দিয়া বসিলেন। চণ্ডী বাবুর নিকট দলিল দাখিল হইতে লাগিল। রাম দাস তাড়াতাড়ি আসিয়া কোয়ালা খানি কেরাণী বাবুর হস্তেদিল,এবং ঈশারা করিয়া দলীল খানি সত্বর রেজিষ্টীর জন্য অনুরোধ জানাইল। নিমেষমধ্যে চণ্ডী বাবু ক্রমান্বয়ে ১৮।১৯ খানি দলীল রেজিষ্ট্রী করাইলেন। রামদাসের কোয়ালার ডাক হইল না। রামদাস ২।৩ বার তাঁহাকে অব্যক্ত ভাষায় অনুরোধ জানাইল, এবং তাঁহার হস্তে আপন হস্ত মিশাইয়া কি যেন দিল। চণ্ডী বাবু বিদ্যুৎ গতিতে হস্ত-পতিত দ্রব্য পকেটস্থ করিলেন, এবং পূর্ব্ব-বৎ অপর দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে লাগিলেন।

তারপর চণ্ডীবাবু অতি মৃদুভাবে কাতরস্বরে সব রেজিষ্ট্রার বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন "হুজুরের বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে, মুখ খানিও শুকিয়ে গেছে; কোন অসুখ হয়েছে কি?" বাবু বলিলেন "চণ্ডী, ঠিক বলেছ, আমার শরীরটা কেমন ভার ভার বোধ হচ্ছে।" এই সময়ে রামদাস অধৈর্য্যভাবে যোড় হস্তে বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "ধর্ম্মাবতার! আমার ভগ্নীর একখানি কোয়ালা আজই রেজিষ্ট্রী না হলে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে।" চণ্ডী বাবু মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া বলিলেন "না, আজ আর হবে না; বাবুর অসুখ হয়েছে।" বাবু চণ্ডীবাবুকে বলিলেন "ও কি বলে? মেয়ে মানুষটিকে এনেছে নাকি?" চণ্ডী বাবু বলিলেন 'হুজুর, মেয়ে মানুষের রেজিষ্ট্রী করতে অনেক সময় লাগবে। শরীর আগে না কাজ আগে? হুজুরের এই দয়ার জন্যইত এত খাটিতে হয়।' এই বলিয়া রামদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওহে বাপু, যদি পাল্‌কি খরচের ভয় করছ, তবে ক'ল আর তোমার এসে কাজ নাই; বাবুর শরীর কেমন থাকে ঠিক নাই; গরীব লোক, আবার এসে ফিরে যাবে কেন? ৪দিন পরে তোমার দিন ফেলে দিলাম।' এই বলিয়া চাপরাশিকে লোক সরাইয়া দিবার আদেশ দিয়া, সকরুণভাবে সব রেজিষ্ট্রার বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বিরসমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চণ্ডী বাবুর ভাব দেখিয়া বাবুরও বোধ করি মনে হইল তাঁহার শরীর খারাপ হইয়াছে। তিনি অধিক বিলম্ব না করিয়া বেলা ৩টার সময় অফিস ত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিলেন। আমিও হাস্যমুখে চণ্ডীবাবুর হস্তে ৪টী টাকা দিয়া প্রনাম করিয়া যাত্রা করিলাম।

বাড়ী আসিয়াই দেখি, আদালতহইতে এক মুসলমান পেয়াদার আবির্ভাব হইয়াছে। সাক্ষীদিগের শমন লইয়া তিনি আসিয়াছেন। আমরা কেহই বাটীতে ছিলাম না; কাযেই পেয়াদা সাহেবের আহারের সম্পূর্ণরূপ ক্রটী

হইয়াছে। আমি তাঁহার সেবার বন্দোবস্ত করিয়া যাই নাই বলিয়াই যেন সাহেব আমার উপর গর্ গর্ করিতে লাগিলেন। আমি পঁহুছিতেই সাক্ষীদিগকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিবার নিমিত্ত আমার উপর আদেশ হইল। আমি বলিলাম "তাঁহারা আসিবেন কেন? আপনি যাইয়াই শমন জারি করিতে হইবে।" পেয়াদা বলিল "সেরকম জারির খরচা কে দিবে? এই আটজন সাক্ষীতে আট দ্বিগুণে ১৬ সিকা চারি টাকা তুমি কি বেশি দিতে পারবে?" আমি বলিলাম "সে কি? খরচা যা দিতে হবে তা তোমাকে দিব কেন?"

পেয়াদা চটিয়া উঠিল, এবং শমন জারি করিবে না প্রকাশ করিল। সে বলিল "তুমি মিঠাই খাবার খরচ দিতে রাজি আছ?" "আমি বলিলাম ' অবশ্য দিব; তবে আমরা গরিব লোক, ৪টাকা দিতে কোথা পাব?" এই বলিয়া আমি বাড়ীর ভিতরে যাইয়া নিজের বাক্স খুলিলাম। তাহাতে একটী সিকি মাত্র ছিল; আনিয়া পেয়াদার হাতে দিলাম। পেয়াদা জলিয়া উঠিল; সিকিটি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। এসব বিষয়ে ন্যায় বিচারের আশা কিরূপ, তাহা পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলাম, কাযেই আমি কিছু বলিলাম না; মিষ্ট কথায় বসিতে বলিয়া বাড়ীতে গেলাম। মাতা ও পত্নীর নিকট সন্ধান করিয়া জানিলাম তাঁহাদের নিকটেও চারি আনা পয়সার অধিক নাই। অগত্যা সেইগুলিও লইয়া পেয়াদাকে দিলাম; পেয়াদা সাহেব লইলেন না, ক্রোধভরে উঠিয়া পড়িলেন। আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম, পেয়াদার দয়া হইল না; সে বলিল "তুমি পয়সার যোগাড় কর; আমি ফিরে যাবার সময় শমন জারি করে যাব।" এই বলিয়া পেয়াদা সগর্ব্বে চলিয়া গেল; আমি কাণ্ড দেখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তারপর দুইদিন পাঠশালা বন্ধ করিয়া পেয়াদার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম, বাবুর শুভাগমন হইল না।

দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্নে দাদা ও রমানাথ অপর এক পেয়াদা সঙ্গে লইয়া পঁহুছিলেন। সঙ্গে একজন ঢুলিয়াও ছিল। অবিলম্বে সকলে সনাতনভবনে উপস্থিত হওয়া গেল— ঢুলে ডিব্ ডিব্ শব্দে ঢোল বাজাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গ্রামের ছোট বড় অনেকে সমবেত হইলেন, এবং সকলে একবাক্যে দাদা মহাশয়ের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তখনই সনাতনের তাবৎ ভূসম্পত্তি ক্রোক করিয়া কাহাকেও কোনরূপে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে নিষেধ করা হইল। রামদাস গৃহের বাহিরে আসিল না; বাড়ীর ভিতরে বসিয়া রহিল।

তারপর পেয়াদাবাবুর বিদায় দাদা মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইল। দাদা বলিলেন, পেয়াদা বাবু যা পরিশ্রম করেছেন, তাঁর উপযুক্ত পুরস্কার হইবার নহে।" দাদার মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইয়া ২৲ দুইটী রজত মুদ্রা লইয়াই পেয়াদাটি সন্তুষ্ট হইলেন। বলা বাহুল্য, সেই রাত্রি তাঁহার সেবাতেই আমাকে অতিপাত করিতে হইয়াছিল। ক্রমশঃ

কবি রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১৪১পৃষ্টার পর হইতে)

রমাপতি ব্রহ্ম বিষয়ক, শ্যামাবিষয়ক, কৃষ্ণবিষয়ক, ভবানীবিষয়ক নানা প্রকার সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়াও বেশ আমোদজনক গান অনেক গুলি রচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই সকল গানে রাগ রাগিণীর বৈচিত্র প্রদর্শনও তাঁহার একটী লক্ষ্য ছিল। সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শী প্রাচীন কালের গায়কেরা যে সকল গান রচনা করিয়াছেন, সে সকলের ছন্দ ও শব্দযোজনা প্রায়ই আধুনিক সঙ্গীতের মত পাঠকালে সুললিত এবং মনোরম বোধ, হয় না। কিন্তু গীত হইলেই তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারা যায়। রমাপতির রচনাও সর্ব্বত্র তাদৃশ প্রাঞ্জল নহে; তথাপি সুগায়কের কণ্ঠে গীত হইলে বেশ ভাবোদ্দীপক হইয়া থাকে। আমরা তাঁহার বিভিন্ন প্রকারের কয়েকটি সঙ্গীত পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

জয়জয়ন্তি— ঝাঁপ তাল।

জননীর কোলে বসি কেনরে অবোধ মন
কাতরে কর রোদন মাতৃ হীন শিশু প্রায় ॥
নয়নজল সম্বর কর রে তায় অবলম্বন।
হন সতত স্বত পরত তিনি নিরুপায়ের উপায়॥
সুখ সমাজে বিহর ,তায় কররে অভিবাদন।
ঘোর বিপদে কি অসময়ে হইবেন ধ্রুব সহায় ॥
জড়াকারে যে উদরে করে আদরে প্রতিপালন
জাননাক সেকি ত্যজিবে এখন অনাদরে
তোমায় ॥
নিদয় মনে যদি স্বজন করে মন বিসর্জ্জন।
বৃথা অনুশোচনে কাতর হয়ো না
সে বিড়ম্বনায় ;
নয়ন হেলে করে যেজন সৃজন বিশ্বজন।
জাননাক সে কি ত্যজিবে এখন
তোমায় অবহেলায় ॥
তপন শশী করেন আসি তব কুশল সাধন।
পবন বারি তোমা সবারি হয়েন
জীবন উপায় ॥
দিন যামিনী আরো যে দেখ ঋতুর পরিবর্ত্তন
কত যতনে করেন পালন তোমারে
মঙ্গল ছায়ায় ॥
যাঁহার শরণাগত মন তুমি সে জগজ্জীবন।
জলচর খেচরাদি সকলেরি তিনি সহায় ॥
দিবসকর শশিরকর আদি গগণ শোভন।
তাঁহার অধীন আর সকল
জ্যোতিহীন তথায় ॥
অলস পরিহরি সহসা কররে অবলোকন।
তাঁর অপার মহিমার তিনি উপমা উপমায় ॥
যাঁহার করে সৃজন আরো পালন অপিচ নিধন
অবশ মন কর জীবন যাপন তাঁরি সাধনায় ॥

এই সঙ্গীতে নিরাশ প্রাণে কেমন ঈশ্বরের দয়ার স্মৃতি উদ্রেক করিয়া দিতেছে। আবার ঈশ্বরের নিকটত্ব অনুভব করিয়া কবি গাহিতেছেন;—

নক্সগোল — ফেরা

বিরাজে যে মানসে হয় সবার প্রধান সে।
মঙ্গলকর চরাচর নাই কিছু তাঁহার অগোচর॥
তেঁই বলি তোমারে, ভাবহে মনে তাঁহারে।
সৃজন পালন করেন, আর যে সংহারে॥
জীবনের সে জীবন, নয়নের নয়ন।
সর্ব্বত্রে সমান আর সর্ব্ব মঙ্গলায়ন॥
সর্ব্বসুখময় তিনি সর্ব্বজীবদাতা
যিনি হন জগতবিধাতা, বিশ্বপাতা;
অতুর অচলে, পালেন অবহেলে
জগত করুণানিধান সে॥

শ্যামাবিষয়ক গান গুলির মধ্যে অতি কৌশলে গভীর আধ্যাত্মিক ভাব প্রকটিত করিয়া রমাপতি নিজের জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েরই যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। দনুজদলনীবেশে শ্যামার বর্ণনা করিতেছেন;—

ভক্তাবলী কানেড়া—কাওয়ালী।

কার বামা এল সমরে।
জলদ রূপসী চঞ্চলা শোড়ষী, করেতে অসি সঘনে নাদকরে। চরণঝঙ্কারে শঙ্কিত কলেবর, ভয়ে কম্পিতা মেদিনী থরথর পদতলে পতিত দিগম্বর দশনে অধর ধরে॥

সমরক্ষেত্র হ'ল পবিত্র বামার শুভাগমনে; করিমনে—ক্ষান্ত হয় রণে, শ্রীচরণে প্রাণ সঁপি যতনে; অভয়া দয়া করে কি না করে, অপাঙ্গে বামা হেরে কি না হেরে; সমরবেশে যদি এ বামা নাশে, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অন্তকালে পাই, কালে না ডরাই; লীন হলে পদেনিরাপদে রব চির সম্পদে এ ধন কি ছার; পলকেতে করে প্রলয় যে পশুপতি, বামা এখন তাহারি অধিপতি; এ বামা ভগবতী, ভবয়ের মাপতি, এ বামারে কেবা মারে॥

আবার শ্যামার করুণার আশা সে আশ্বস্ত হইয়া উৎসাহপূর্ণ অন্তরে গাহিতেছেন;—

কালেংড়া—মূল।

যাওয়া হবে না কেন রে ওমন ভবনদীপারে।
নিস্তারকারিণী শ্যামা ভাবরে অন্তরে॥
ভবনীরে তনুতরী, ভাসাওরে মন ত্বরা করি,
বসে থাক তদুপরি জ্ঞান হালি ধরে॥
শ্রদ্ধাভক্তি সুবাতাসে তরণী ধর,
কুমতি কুটিল কুবাতাস পরিহর;
ছজন দাঁড়ি কি কাজ বল,
দুর্গা নামে বাদাম তোল,
হলো সুগম চল ভক্তিপবন ভরে॥
এখন হতে তোমায় রে মন বলে রাখি শুন,
কাল চড়া আছে, তরী না ঠেকে তায় যেন;
জ্ঞানহালি ধর জোরে, দুর্গানাম পালি ভরে,
লয়ে চল এ সুন্দরে চিন্তামণি পুরে॥

আবার ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া গাহিতেছেন :—

বিভাস—একতালা।

আমার অসময় কালে ইচ্ছাময়ী যা কর।
ক্রীড়াসক্তে হল বাল্যকাল হত, যুবাকাল রসবিলাসে বিগত; ভয়ানক কাল নিকটাগত, দেখে সশঙ্কিত কলেবর।
দারাসুত আদি যত পরিজন, আত্মবন্ধু আর সুজন স্বজন, নাহিক এখন বলিতে আপন, স্বদেহ হতেছে ভয়ঙ্কর॥
ক্রমে হইলাম ইন্দ্রিয় দৈন্য, দেখিতেছি সকল দিক শূন্য, গতি নাহি আর ওপাদ

ভিন্ন, ডাকে রমাপতি হয়ে কাতর ॥

মহাদেবের যোগীবেশ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা স্মরণ করিয়া কবি গাহিতেছেন,—

ভৈরবী—ঠেকা।

ছি মা কে মাধবে যোগী সাজায়েছে।
মনোহর রূপ ভস্মকূপেতে মজায়েছে॥
চিকুরে নাই অলকার, খসায়েছে অলঙ্কার।
নাহি জানি ভাবে কার, এ ভাব ঘটায়েছে ॥
পীতাম্বর নাহি আর, বাঘাম্বর হয়েছে সার
বাঁশী তেয়াগিয়ে শিঙ্গা অধরে ধরায়েছে ॥
নাহি সে কেয়ুর হার, গলায় রুদ্রাক্ষভার,
চূড়া ছাড়ি শ্রীমুরারি, জটাধারী হয়েছে ॥
দ্বিজ রমাপতি ভাবে, বুঝি শ্যাম যোগীর ভাবে
মান ভিক্ষা চাহি লবে মানিনী রাইর কাছে

ক্রমশঃ।

——**——

সংবাদ।

জগবন্ধু বাবুর ছুটি ও বাগ্‌চি মহাশয়ের শুভাগমন।— শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় পাঁচ বৎসর কাল কাঁথির সব্‌ডিবিসনাল অফিসারের কার্য্য করিয়া আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে তিন মাসের অবকাশ গ্রহণ করায়, তাঁহার স্থলে তম্‌লুকের সব্‌ডিবিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল বাগ্‌চী মহাশয় কাঁথি মহকুমার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। জগদ্বন্ধু বাবুর ন্যায় উদারস্বভাব অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক হাকিম-দিগের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না। তিনি সুশাসনের নিমিত্ত একদিকে গবর্ণমেণ্টের নিকট যেরূপ প্রতিষ্ঠা ভাজন হইয়াছেন, অন্যদিকে তাঁহার নিরহঙ্কার স্বভাবের গুণে অধীনস্থ কর্ম্মচারী, উকিল মোক্তার ও সাধারণের প্রীতিও আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন।

ইহার যত্ন ও চেষ্টায় এস্থানের কয়েকটী স্থায়ী উপকার হইয়াছে। তন্মধ্যে মগরা জলার জল নিকাশী খাল কাটান ও নন্দকুমার পুকুরের পঙ্কোদ্ধার এ দুইটীর বিশেষ উল্লেখ আবশ্যক। মগরা জলা প্রতি বৎসর জলে ডুবিয়া গিয়া বিস্তর জমী আবাদ হইতে পারিত না, খাল হওয়া অবধি তথায় বেশ ধান হইতেছে। নন্দকুমার একটী বৃহৎ পুকুর; ইহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের লোকের এই পুকুর ভরসা ছিল। এটী বুজিয়া যাওয়ায় লোকের যে কি কষ্ট হইয়াছিল তাহা বলিবার নয়; তা ছাড়া পুকুরটী হইতে একটা ভয়ানক দুর্গন্ধ উঠিত এবং লোককে অগত্যা সেই জল নানা কারণে ব্যবহার করিতেও হইত। ইহাতে স্বাস্থ্যের বিষম অনিষ্ট হইত। এই পুষ্করিণীটীর পঙ্কোদ্ধার হইবার পর লোকের বিশেষ উপকার হইয়াছে। ইহারা চিরকাল দুই হাত তুলিয়া জগদ্বন্ধু বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিবে। হয়ত তিনি আর কাঁথিতে ফিরিয়া না আসিতেও পারেন। বাগচী মহাশয় একজন সুশিক্ষিত লোক। শুনিতে পাই গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার কার্য্যদক্ষতারও বিশেষ প্রশংসা আছে। ভরসা করি ইঁহার শুভাগমনে আমাদিগকে জগদ্বন্ধু বাবুর অভাব অনুভব করিতে হইবে না।

কাঁথিতে টোল। — কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত মৈথনা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দিবাকর মিশ্র বেদান্ত পঞ্চানন মহাশয় কাঁথিতে একটি টোল খুলিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় ৺কাশীধাম হইতে শিক্ষা করিয়া আসিয়া প্রধানতঃ ন্যায় ও দর্শনের অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোকের অর্থ সহায্যে অধ্যাপক মহাশয়ের ও চারিটি ছাত্রের গ্রাসাচ্ছাদনে কথঞ্চিত নির্ব্বাহ হইতেছে। অধ্যাপক মহাশয়ের যেরূপ শাস্ত্র জ্ঞান ও উদ্যোগ দেখিতেছি তাহাতে স্থায়ী হইলে এই চতুষ্পাঠীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অবশ্যম্ভবী। আশা করি, এই মহকুমার বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ ইহার স্থায়ীত্বকল্পে অর্থ সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

রাজা ও প্রজা। — পুনার ভীষণ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ গত বারের কান্তিতে যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। হত্যাকারীদিগের এপর্য্যন্ত কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কর্ত্তা কর্ম্মচারীদিগের বিশ্বাস যে সম্ভবতঃ দেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্র সমূহের উত্তেজনায় ও পুনার ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে ও জ্ঞাতসারে এই কার্য্য সাধিত হইয়াছে। পিউনিটিভ পুলিস্ স্থাপন ব্যপদেশে পুনাবাসীদিগের প্রায় তিনলক্ষ টাকা দণ্ড করিবার বিষয় পুর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে পুনার কয়েকটি সংবাদ পত্রের সম্পাদককে রাজবিদ্রোহের উত্তেজনা করা অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়া দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। বোম্বাই হাইকোর্টে দায়রায় এই সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহাদের বিচার হইবে। এইসকল আসামীদের মধ্যে বালগঙ্গাধর তিলক নামক একজন বোম্বাই প্রদেশের প্রধান লোক আছেন। দেশে ইহার এত প্রতিপত্তি যে ইনি বোম্বাই লাট সভার এক জন মনোনীতসদস্য ইনি সম্প্রতি লক্ষ টাকার জামিনে খালাস আছেন অন্যান্য সম্পাদকগণ হাজতে আছেন। বাস্তবিক যদি সংবাদপত্রে লিখিয়া ইঁহারা রাজবিদ্রোহের জন্য জনসাধারণকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন তাহা হইলে ইঁহারা রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন তাহাতে আমরা দুঃখিত হইবনা। যাঁহারা সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়া অযথা রাজবিদ্রোহের উত্তেজনা করিবেন তাঁহারা স্বদেশের ও স্বজাতির শত্রু, এবং তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের কোনও প্রকার সহানুভূতি নাই। সম্পাদক মহাশয়দিগের জুরির দ্বারা বিচার হইবে, সুতরাং তাঁহাদের সুবিধা হইবার আশা আছে।

পুনার সর্দ্দার বলবন্তরাও নাটু এবং তাঁহার ভ্রাতা রামচন্দ্র নাটুর প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন, এরূপ সচরাচর দেখা যায় না। বাজীরাও পেশোয়ার সময়ে এই দুই সর্দ্দারের পূর্ব্বপুরুষেরা ইংরাজের সহায়তা করায় ইংরাজরাজ ইঁহাদিগকে ত্রিশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক আয় বিশিষ্ট জায়গীর প্রদান করেন। এখন, কি সন্দেহে বলিতে পারি না, গবর্ণর জেনেরেলের আদেশমতে একটী পুরাতন আইনের বলে ইঁহাদিগকে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে এবং ইঁহাদের সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

বালেশ্বর-রাজবংশ।

উৎকল প্রদেশের উত্তর সীমা বালেশ্বর জেলা। উক্ত জেলার প্রধান নগরের নাম বালেশ্বর। ইংরাজ রাজত্বে এই নগরেরশোভা সৌন্দর্য্য দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ক্রমশঃ জনসংখ্যার বৃদ্ধি সহকারে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষাদির উন্নতি হইতেছে। এই জেলার প্রধান প্রধান বিচার আদালত সকল এই নগরে সংস্থাপিত। সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ রাস্তা এই জেলার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে কটক ও পুরী জেলাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। বালেশ্বর জেলার প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়। বিবিধ প্রাকৃতিক মৃত্তিকা-সংযোগে এই জেলার সর্ব্বত্র সুগঠিত। এক দিকে কত প্রকার স্তর-মণ্ডিত প্রস্তরময় স্থান, অন্য দিকে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী কর্দ্দম ও বালুকামিশ্রিত ভূভাগ। এক দিকে অপার নীলাম্বুরাশিপরিশোভিত জলনিধি বিশাল বক্ষ বিস্তারে শোভা বিকাশ করিতেছে, অন্য দিকে নবীননীরদমালাপ্রতিম নীলগিরি দণ্ডায়মান আছে। এক দিকে শাল, পিয়াশাল, আসনা, আবলুস, ইত্যাদি পার্ব্বত্য তরুরাজি, অন্য দিকে সমুদ্রোপকূলজাত কেওড়া, কিয়া ও সুন্দরী প্রভৃতি জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। বর্ত্তমান কালে এই নগরের যেরূপ উন্নতি ও শোভা সৌন্দর্য্য পরিলক্ষিত হইতেছে, কিছুদিবস পূর্ব্বে ঠিক তদ্রূপ ছিল না। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই নগরের সন্নিহিত "পিপ্পলি" নামক স্থান ব্যবসা বাণিজ্যের উৎকর্ষ নিবন্ধন বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র সুযশ সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই সময়ে ইংরাজ রাজ বণিক বেশে এ দেশে প্রবিষ্ট হইয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। তৎকালে মুসলমান গৌরবরবি অস্তমিতপ্রায়, অথচ ভারতের রাজলক্ষ্মী তখনও ইংরাজের অঙ্কশায়িনী হন নাই।

এই সময়ে বাণিজ্যব্যপদেশে বাঙ্গালা দেশ হইতে সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক এবং তাম্বুলি বা তামলি জাতীয় কতকগুলি লোক এই বালেশ্বর জেলায় আসিয়া আপনাদিগের বাসস্থান মনোনীত করেন। আমরা অদ্য যে বংশের বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইঁহারা জাতিতে তাম্বুলী। এই বংশীয় জয়কৃষ্ণরাম দে নামক এক ব্যক্তি পুত্র কলত্র ও পরিবার আদি সহ এখানে আগমন করিয়াছিলেন। তদবধি এই পরিবার এই স্থলে পুরুষানুক্রমে অবস্থিতি করিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মপথে থাকিয়া যে বিপুল সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই উপার্জ্জিত অর্থের বহুল অংশ নিঃস্বার্থে সাধারণের জ্ঞান ধর্ম্ম ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে ব্যয় করিতেছেন। সেই সদ্ব্যয়ের পুরস্কারস্বরূপ মাননীয় ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট, এই বংশের বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরের স্বর্গীয় পিতা শ্যামানন্দকে প্রথমতঃ "রায় বাহাদুর", তৎপরে "রাজা", তদনন্তর "রাজা বাহাদুর" এই

সম্মানাত্মক উপাধি প্রদান করিয়া অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই রাজোপাধি যোগ্য পাত্রেই অর্পিত হইয়াছিল। এই বংশীয়গণ তদবধি "বালেশ্বর-রাজ" এই সম্মানসূচক উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়া, উক্ত জেলার জমিদার শ্রেণীর শীর্ষ স্থানে আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা এই বংশীয় দিগের উন্নতি, সুখ সৌভাগ্য ও সদনুষ্ঠানের বিবরণ নিম্নে বিশদরূপে বিবৃত করিব।

হুগলি জেলার জাহানাবাদ সবডিবিজানের অন্তর্গত মায়াপুর নামক যে গ্রাম খানি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, এই বংশীয় দিগের আদি নিবাস ঐ স্থানে ছিল। মায়াপুর ও তৎসন্নিহিত অপর নয় খানি গ্রামে তাম্লি জাতীয় ব্যবসায়ীগণ বসবাস করিতেন। এই দশখানি গ্রামের মধ্যে আট খানি গ্রাম অধিকতর বিখ্যাত ছিল। এজন্য উক্ত গ্রাম সমূহ সাধারণতঃ "অষ্টগ্রাম" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই অষ্টগ্রামে অবস্থিতি নিবন্ধন উক্ত জাতির প্রধান শাখার নাম "অষ্টগ্রামী" হইয়াছে। রাজা বাহাদুরেরা এই সম্প্রদায়ভুক্ত। তাম্‌লি জাতির মধ্যে চারি, চৌদ্দ, বিয়াল্লিশ, ও আট, পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

তামলিগণ যে সময়ে মায়াপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানে বসতি করিতেন, তৎকালে তাঁহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ে পরিব্যাপ্ত ছিলেন। তৎকালে প্রত্যেক গৃহস্থের আর্থিক অবস্থাও উৎকৃষ্ট ছিল। ধর্ম্মপথে সদ্ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকিলে নিশ্চয় উন্নতি হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রকৃত পক্ষে ব্যবসায়ীগণই লক্ষ্মীর বরপুত্র।

বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে দ্বেষ হিংস পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি অসদ্গুণ পূর্ণ মাত্রায় পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; কিছু দিবস পূর্ব্বে এরূপ অবস্থা ছিল না। তৎকালে স্বদেশের ও স্বগ্রামের অথবা স্বজাতির উন্নতি সুখ সাচ্ছন্দ্য অবলোকন করিলে, প্রকৃত পক্ষেই লোকে সুখী হইত। একজন লোক অপরের উন্নতিতে আনন্দ, অপরের দুঃখে দুঃখানুভব এবং অন্যের বিপদকে নিজ বিপদের ন্যায় জ্ঞান করিত। বিশেষতঃ আত্মীয় বন্ধু, জ্ঞাতি কুটুম্ব দিগের মধ্যে সহানুভূতির অভাব ছিল না। এক পরিবারের অসম্মানে অন্য লোকও আপনাকে অবমানিত মনে করিত। মায়াপুরনিবাসী তাম্‌লি জাতির মধ্যে এইসকল গুণনিচয় যথেষ্টই ছিল।

ধর্ম্মপথে থাকিয়া সদ্বৃত্তি অবলম্বন করিলে নিশ্চয় উন্নতি হইবে, এই মুল মন্ত্র অনুদিন অনুধ্যান করিয়া যে সময়ে তাম্‌লিগণ সুখ সচ্ছন্দে আনন্দ উৎসবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, সেই সময়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন একটি দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল যে সেই আকস্মিক আপদে এই সম্প্রদায়স্থ লোকের সুখ সাচ্ছন্দ্য অন্তর্হিত হইল। আমরা সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার বর্ণন করিবার পূর্ব্বে বঙ্গ দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ও রাজ্য-শাসনসম্পৃক্ত কএকটি কথা ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি।

ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় জাতীয় অবনতির পূর্ব্বে সেই সম্প্রদায়স্থ লোকের ধর্ম্মজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যায়; তখন আর ন্যায়ান্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, কোন জ্ঞানই থাকেনা। যে দিন দৃশদ্বতী

নদীতীরে ভারতের হিন্দুস্বাধীনতাসূর্য্য চিরদিনের নিমিত্ত অস্তমিত হইল, যে দিন মহম্মদ ঘোরির অমিত পরাক্রমে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হইলেন, সেইদিন মুসলমানবিজয়-বৈজয়ন্তী ভারতে উড্ডীয়মান হইল। সেই দিনই হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত হইল। তদবধি প্রায় ৭০০ শত বৎসর ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় মুসলমানগণ এই ভারতে একাধিপত্য করিতেছিলেন। যখন মুসলমান গৌরব-রবি মধ্যাহ্নকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় জ্যোতিষ্মান্ ছিলেন, তৎকালে আকবরের ন্যায় সমদর্শী ও ন্যায়বান সম্রাট জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। কালসহকারে মুসলমান-গৌরব-রবি অস্তমিত হইবার প্রাক্কালে আরঙ্গেব প্রভৃতির ন্যায় নির্দ্দয় নৃশংস শাসন-কর্ত্তাগণই ভারতের ভাগ্যবিধাতা হইয়া-ছিলেন। এই সময়ে হিন্দুর অদৃষ্ট ভাঙ্গিল, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্মের উপরি দিন দিন নানা প্রকার অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হইল। রাজা, রাজপ্রতিনিধি ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ—সকলেই যেন এক ছাঁচে গঠিত হইতে লাগিলেন। মানুষের অনু-করণেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী; নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা প্রায় উচ্চ শ্রেণীর লোকের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়া থাকে। অত্যাচারী সম্রাটের কার্য্যের অনুকরণে নিম্নস্থিত নবাব ও আমীর ওমরাগণ পূর্ণ মাত্রায় অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে অধিকতর অত্যাচার সংঘটিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালা দেশের শাসনজন্য সময়ে সময়ে এক একজন রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতেন। এই প্রতিনিধি বাঙ্গালার নবাব নামে অভিহিত। ইনি প্রায় মুরসিদাবাদ রাজভবনে বিলাস-সুখে নিমগ্ন থাকিতেন। প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তাগণই দেশ শাসন করিতেন। এই মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণই দেশের সর্ব্বে-সর্ব্বা ছিলেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বাঙ্গালা দেশে ঘোরতর দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়। এই সময়ে অধিকাংশ মুসলমান রাজকর্ম্ম-চারীগণ উদ্দাম ষণ্ডবৎ স্বীয় স্বীয় অধিকার-মধ্যে বিচরণ করিত। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি ও বিলাসসুখসাধনই ইহাদের জীবনের ব্রত স্বরূপ ছিল। এই সকল শাসনকর্ত্তাগণের উদ্দেশ্য ও শাসনপ্রণালী নিতান্তই অপকৃষ্ট ছিল। অবিবেকী পাষণ্ড ও নৃশংস লোকের হস্তে প্রভুত্ব থাকিলে কদাচ সুফলের আশা করা যাইতে পারে না। উন্মত্তের হস্তে তীক্ষ্ণ-ধার খড়্গ, মূর্খের হস্তে প্রভুত্ব থাকিলে কি রক্ষা আছে? বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সময় সেইরূপ শাসনকর্ত্তাগণের হস্তেই প্রভুত্বভার পতিত হইয়াছিল।

মায়াপুরে অবস্থিতিসময়ে রাজা শ্যামানন্দের পূর্ব্ব বংশে একটী অসামান্য-রূপা সুন্দরী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে সুন্দরী রমণীর সতীত্ব রক্ষা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। যে বংশে সুন্দরী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিত, সেই পরিবারের সুখ শান্তি অন্তর্হিত হইত। কখন কি সর্ব্বনাশ হইবে, এই চিন্তায় পরিবারস্থ সমস্ত লোক দিগকে সশঙ্কিতাবস্থায় অতিবাহিত করিতে হইত। এখানেও সেইরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। সেই লাবণ্যময়ী ললনার রূপ-

মাধুরীর কথা অচিরাৎ মুসলমান শাসন কর্ত্তার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। এই সংবাদে দুরাচার একবারেই উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তখন ছলে, বলে, কৌশলে, অর্থব্যয়ে সেই নারীরত্নকে হস্তগত করিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। পাষণ্ডের পাপ-প্রবৃত্তি পরিতৃপ্তির জন্য কয়েক জন সহচর নিযুক্ত হইল। উহারা চতুর্দ্দিকে কৌশলজাল বিস্তার করিতে লাগিল। লোভ, ভয় ও আত্মীয়তা প্রদর্শন ও উন্নতির প্রলোভন, কোনরূপ ষড়যন্ত্রের অভাব থাকিল না।

যে কোন গতিকে হউক, সুন্দরীকে হস্তগত করিতে হইবে, যবন রাজপ্রতিনিধির এই কঠোর আদেশ। একদিন এই ললনার আত্মীয় স্বজনের নিকটে যবন-দুত আসিয়া উপনীত হইল। ধর্ম্মভীরু নিরীহ লোকেরা যম-দুতকে যাদৃশ ভয় না করিত, যবন-দুতকে তদপেক্ষা অধিক ভয় করিত। দুরাত্মা যবন শাসনকর্ত্তার অনুমতি অচিরে সুন্দরীর আত্মীয় স্বজনের নিকটে বিজ্ঞাপিত হইল।

নির্ব্বাত সাগর যেমন সহসা প্রবল ঝটিকায় আন্দোলিত হইয়া উঠে, হঠাৎ দুতমুখে এই সমাচার অবগত হইয়া পরিবারস্থ সমস্ত লোক তদ্রূপ বিচলিত হইয়া উঠিল। সকল লোক কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সেই যবনকিঙ্করকে বলিলেন— "আমরা বিবেচনা করিয়া দুই দিনের মধ্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিব"।

ক্রমশঃ

শ্রী চন্দ্র নাথ শর্ম্মা
মেদিনীপুর।

প্রেম ও চরিত্র।

পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে যে প্রেম মানবচরিত্রে ধৈর্য্য, বীর্য্য, সাহস, উদ্যম উৎসাহ, আশা, শক্তি সামর্থ্য, দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা বিজ্ঞতা প্রভৃতি বিকশিত করে; অতএব তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই প্রস্তাবে মানবচরিত্রের কোমলতর অংশের উপর প্রেমের কিপ্রকার প্রভাব, তাহারই কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

প্রেম হইতে সেবা-প্রবৃত্তি জন্মে। যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহাকে সেবা করিতে ইচ্ছা জন্মে। যাহাকে ভাল বাসিতে পারা যায় না, তাহাকে সেবা করিতে ইচ্ছাও হয় না। পরন্তু, তাহার সেবা করা বিষম ক্লেশকর ও মনস্তাপজনক শাস্তি স্বরূপ বোধ হয়। প্রেমপাত্রের সেবায় প্রাণ দিয়াও সুখ জন্মে; অপ্রেমের স্থলে বাক্যটী পর্য্যন্ত দেওয়াও ক্লেশকর। শারীরিক শ্রম, অর্থব্যয়, চিন্তা, —প্রেমপাত্রের জন্য মানুষ এ সকল অনায়াসে সহ্য করে। এই প্রেমের প্রভাবেই পিতা মাতা সন্তানের সেবা করিতে ক্লান্ত হয়েন না; বন্ধু বন্ধুর সেবা করিয়া সুখী; সতী পতির সেবা করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ মনে করেন। প্রেমের জন্যই স্বদেশ-প্রেমিক দেশের সেবায়, বিশ্বহিতৈষী বিশ্বের সেবায়,

ভক্ত ভগবানের সেবায় দেহ মন সমর্পণ করিতেছেন।

সেবা-প্রবৃত্তি হইতেই স্বার্থত্যাগ উপস্থিত হয়। স্বার্থপরতা ও সেবা একত্র বাস করিতে পারে না। প্রেমিক স্বার্থপর হইতে পারেন না। অরুণোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় প্রেমোদয়ে স্বার্থপরতা আপনা আপনি হৃদয় হইতে কোন্ পথে পলায়ন করে, তাহা জানিতেওপারা যায় না। যদি স্বার্থপরতা বিনাশ করিতে চাও, প্রেমাস্ত্র গ্রহণ কর; অপর সাধনে কদাপি সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। যাহাকে ভাল বাস, তাহার জন্যে সহস্র ক্লেশওক্লেশ বলিয়াই বোধ হয় না; অনাহার, অনিদ্রা, পর্য্যটন, ভারবহন,—কিছুতেই মনে তাপ জন্মে না, অসন্তোষ জন্মে না। তাহার জন্যে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া যায়, অগ্নিতে প্রবেশ করা যায়; দুর্গম শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন কাননে প্রবেশ করা যায়; উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করা যায়, মৃত্যুমুখে অগ্রসর হওয়া যায়, বিষ পান করা যায়, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ফকীর হওয়া যায়। শুধু যে এই প্রকার করা যায় তাহা নহে, করিতে প্রাণে কত আগ্রহ জন্মে।

অপরের সামান্য চর্ম্মরোগ হইলে, সেই গৃহ বাসের অনুপযুক্ত বলিয়া, ঐ রোগ সংক্রামক বলিয়া,— তথা হইতে দূরে গমন করিবে। পুত্রের বসন্ত, কলেরা কিংবা কুষ্ঠ রোগ হইলে, স্বয়ং তাহাকে বুকে রাখিয়া তাহার পুঁজরক্ত মূত্র পুরীষ পরিস্কার করিতে কেহই কুণ্ঠিত হয় না, ইহার কারণ কি? প্রেম! পরের হাতে তোমার একটী কপর্দ্দক হারাইলে তাহাকে কত তিরস্কার ও দণ্ড বিধান করিবে, চোর বলিয়া মনে করিবে; কিন্তু তোমার পত্নী, পুত্র কন্যা কিম্বা কোন বন্ধু হীরকখচিত স্বর্ণ ঘটিকাটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও, "দৈবাৎ ঘটিয়াছে" বলিয়া উপেক্ষা করিবে, ও তাঁহারা পাছে দুঃখিত বা লজ্জিত হয়েন, তজ্জন্য কত মিষ্ট কথা বলিবে। অনাহার-ক্লিষ্ট শীর্ণকায় মৃতপ্রায় ভিখারী তোমার দ্বারে একমুষ্টি তণ্ডুল পাইয়া আর এক মুষ্টি প্রার্থনা করিলে তাহাকে দূর করিয়া দিবার জন্য দারোয়ানকে হুকুম দিবে; কিন্তু নিজে বন্ধুবান্ধবদিগের ও পুত্রকন্যাদিগের অনাবশ্যকীয়, দেহ মনের ক্ষতিজনক অসার ও নিকৃষ্ট বিলাসভোগের জন্য, ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি পরিচালনার জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিতে বা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া যাইতে কত আনন্দ পাও! দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত নিরন্ন লোকদিগের এক মুষ্টি অন্নের ব্যবস্থা করিবার জন্য চাঁদার খাতা লইয়া কেহ তোমার দ্বারে আসিলে বলিবে "আমার নিজের খরচ কুলাইয়া কিছুই বাঁচে না, কোথাহইতে টাকা দিব?" পর মুহূর্ত্তে তুমিই আবার বিড়ালের বিবাহ দিতে কাকাতুয়ার জন্য সোনার নূপুর গড়াইতে, পুত্রের বিবাহে বাইনাচ করাইতে, বারোয়ারীর সং সাজাইতে, অভ্যাগত বাবু বন্ধুগণের অভ্যর্থনার জন্য সুরা ও বারাঙ্গনার ব্যবস্থা করিতে, বা পুত্র কোথায় কুসঙ্গে কুক্রিয়াসক্ত হইয়া কাহাকে হত্যা করিয়া আসিয়াছে তাহাকে রক্ষা করিতে অবলীলাক্রমে অজস্র অর্থ ঢালিবে; তৈলাক্ত মস্তকে তৈল

ভালবাসার খাতিরে লোকে লজ্জা ভয়, কুল, মান—কি না ত্যাগ করিতে পারে? দৃষ্টান্তের অভাব নাই,—আলোচনা বাহুল্য মাত্র। ভালবাসিতে গিয়া, লোকের যেমন সর্ব্বনাশ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। সেই ভালবাসা চরিতার্থ হইলে সর্ব্বনাশও সুখকর। প্রেম মানুষকে ত্যাগী করিয়াই পরম সুখী করে। প্রেমের ত্যাগে গভীর সুখ পাওয়া যায়, নতুবা লোকে ত্যাগ করিবে কেন ?

যেখানে প্রেম বর্ত্তমান, সেখানে স্বার্থপরতা তিষ্ঠিতে পারে না। অতএব মানবাত্মার প্রতি প্রেম জন্মিলে, লোক কাহা-রও প্রতি স্বার্থপরতাচরণ করিতে পারে না।

স্বার্থপরতা যদি চলিয়া গেল, তবে কপটতা, কুটীলতা, প্রবঞ্চনা, শঠতা থাকিবে কি প্রকারে ? প্রেমপাত্রের নিকট হৃদয়দ্বার যে একেবারে উন্মুক্ত! প্রেমপাত্রের নিকট মিথ্যাচরণ কে করে ? তাহাকে প্রতারণা কে করে ? তাহার সুখের উপাদান সংগ্রহ করিতেই ব্যস্ত; হরণ করিবে কি প্রকারে ? তাহার সামান্য দ্রব্যটী পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে প্রাণ দেওয়ার জন্য ব্যাকুলতা, বিশ্বাসঘাত-কতার চিন্তা মনে আসিবে কেন ?

প্রেম ব্যভিচার করিতে জানে না। কপট প্রেমের বা অপ্রেমের গৃহেই ব্যভিচার-প্রবৃত্তি প্রবল। যে স্বামী পত্নীকে প্রেম করিতে পারে না, সেই পরদারাসক্ত হয়। যে পত্নী স্বামীকে প্রেম করিতে পারে না, সেই পরপুরুষ ইচ্ছা করে। যেখানে প্রেম যায়, মনও সেই দিকে ধাবিত হয়। প্রেম শিক্ষা দাও, কোন গৃহে আর ব্যভিচার থাকিবে না।

অতএব, প্রেম যদি অপাত্রে অর্পিত না হয়, অথবা ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ না হয়, এবং মানবাত্মার প্রতি যদি প্রেম করিতে পারা যায়, তবে চরিত্র সহজেই সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল ও মহৎ হইবে সন্দেহ কি ? যে সকল গুণ মানুষের মনুষ্যত্ব এবং মহত্বজ্ঞাপক, প্রেম হইতে সে সকলই জন্মে; অপ্রেম হইতে জন্মিতে পারে না। সুতরাং প্রেমকেই মহৎ চরিত্রের উৎস কেন বলিব না ? বৃক্ষ যদি মূলে রস পায়, এবং সেই রস আকর্ষণ করে, তবে আপনাহইতেই সহজে নূতন পল্লব পত্র পুষ্প প্রসব করিয়া পুষ্ট ও সুন্দর হইতে থাকে; দেহ যদি উপযুক্ত খাদ্যাদি পায়, এবং তাহা জীর্ণ করিতে পারে, তবে আপনা হইতেই পুষ্টি, কান্তি, বল উৎপন্ন হয়। তেমনি, হৃদয়ে যদি প্রেমরস সঞ্চারিত হয়, চরিত্রে মহৎ গুণ সকল আপনিই বিকশিত হইতে থাকে, অন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন কি ?

যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহাকে দেখিলেই মনে আনন্দ উথলিত হয়। তাহাকে আলিঙ্গন করিতে, অভ্যর্থনা করিতে, আসন বসন, ভোজন ও শয্যা দিতে গৃহের ভৃত্যগণের উপর আধিপত্য দিতে, সামগ্রীনিচয়ের উপর স্বামিত্ব দিতে প্রান ব্যাকুল হয়। তাহার ত্রুটীতে উপেক্ষা, এবং গুণে আদর সহজেই করা যায়। তৎপ্রতি মিষ্ট কথা, মিষ্ট ব্যবহার ভিন্ন কর্কশতাচরণ কে করিতে চায় ? সেখানে যতই করি, কিছুতেই যথেষ্ট বোধ হয় না, "কিছুই করিতে পারিলাম না" বলিয়াই বোধ হয়। খাওয়াইয়া, পরাইয়া, আদর করিয়া যেন মনের সাধ মিটে না। সর্ব্বদাই তাহার কুশল প্রশ্ন করি, কুশল

সাধনে ব্যাকুল হই। তাহার সুখের কথায় সুখী, দুঃখের কথায় দুঃখিত হই। তাহার সম্পর্কীয় যে যেখানে আছে, সকলেরই কুশল প্রার্থনা করি। তাহার সম্মুখে নিজের দুঃখ কষ্টের কথা তুলিলে যদি মনে ব্যথা পায়, সেই আশঙ্কায় সে সব যেন ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকি। তাহার কোন প্রয়োজন হইলে, অগ্রে ছুটিয়া গিয়া তাহা সাধন করিবার জন্য ব্যাকুল হই। অতএব প্রেম কেমন সহজে ক্ষমা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, শীলতা, বিনয়, সহানুভূতি ও উদারতা আনয়ন করে! ভদ্রসমাজে লৌকিক ব্যবহারে এই প্রেমেরই সাজ সজ্জা দেখানের চেষ্টা। কিন্তু প্রেমোত্থিত হৃদয়গত ভদ্রতা, এবং লৌকিক ভদ্রতা, এ দুয়ে বিস্তর প্রভেদ। প্রেমই প্রকৃত ভদ্রতা শিক্ষা দেয়।

প্রেমে উৎকৃষ্ট বৈরাগ্য জন্মে; প্রকৃত সন্ন্যাস-ব্রত জীবনে পরিণত হয়। প্রেমে সেবা আনুগত্য, ক্ষমা, সন্তোষ, ধৈর্য্য, কষ্টসহিষ্ণুতা, সদাচার, শিষ্টতা, বিনয়, শীলতা, সাধুতা, সরলতা প্রভৃতি তাবৎ সদ্‌গুণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। প্রেমের তুল্য চরিত্র গঠনের উপায় আর কোথায় পাইবে? অপ্রেমিক শত চেষ্টাতেও এ সকল লাভ করিতে পারে না। বহুকাল তপ জপ যোগ ধ্যানের আলোচনা করিয়া করিয়া প্রাচীন ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, ভগবানে প্রেম করিতে পারিলেই জীব সহজে মুক্ত হয়। জ্ঞান-শাস্ত্রে বলে,—"সহস্র সহস্র জন্ম তপস্যা কর, ব্রত কর, নিয়ম কর, তবে মুক্তি পাইবে।" ভক্তিশাস্ত্রে বলে,—*"একবার ভক্তিপূর্ব্বক হরিনামোচ্চারণ* করিতে পারিলেই মুক্তি।" ধন্য—প্রেমের শক্তি!

প্রেম সংক্রামক;— মানুষের সকল বৃত্তিই সংক্রামক। ক্রোধ দেখিলেই ক্রোধ জন্মে, শোক দেখিলেই শোক জন্মে; তেমনি প্রেম দেখিলেই প্রেম জন্মে। মানুষ পিতা মাতার নিকট যেরূপ প্রেম পায়, ভ্রাতাভগ্নীর নিকট যেরূপ ভালবাসা পায়, আত্মীয়বর্গ ও প্রতিবেশীবর্গের নিকট যেমন সৌহার্দ্দ লাভ করে, প্রভুর নিকট যেমন ব্যবহার পায়, ঠিক তদনুরূপ গঠিত হয়। প্রেম পাইয়াই প্রেম শিখে। প্রেমের যেরূপ ব্যবহার বাল্যাবধি চতুর্দ্দিকে দেখিতে পায়, সেইরূপ ব্যবহারই করিতে শিখে।

মানব-প্রকৃতির মধ্যে প্রেম ও স্বার্থ-পরতা নিয়ত সংগ্রাম করিতেছে। প্রেম আত্ম-বিস্মৃতি জন্মাইতে চায়, স্বার্থপরতা আপনার দিকেই দেখায়। শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মানুষ যদি নিজের শক্তি প্রেমের অনুকূলে নিয়োজিত করে, তবে স্বার্থপরতা বিনষ্ট হয়। আর যদি কুশিক্ষার দোষে প্রেমকে ক্ষুদ্র সীমায় রাখিয়া অন্যত্র স্বার্থপরতার রাজ্য বিস্তারে সহায়তা করে, তবে ঐ ক্ষুদ্রসীমায় অর্থাৎ ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের সম্বন্ধে আত্মত্যাগ করে বটে, কিন্তু অন্যত্র তাহা পারে না। আবার যাহারা অজ্ঞানতাবশতঃ কোন নির্দ্দিষ্ট পথে না চলিয়া, সাময়িক ভাবেই উত্তেজিত হয়, তাহারা কখনও প্রেম প্রকাশ করে, কখনো বা স্বার্থপরতা দেখায়। তাহারা প্রেমও ছাড়িতে পারে না, স্বার্থপরতাও ছাড়িতে পারে না। তবে বাল্যকালাবধি অপরের *দৃষ্টান্তে যে যেমন শিক্ষা করে,* তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে এই ভাবের

বাহ্যবিকাশের ইতর বিশেষ কিছু কিছু দেখা যায় বটে। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীস্থ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। ধার্ম্মিক লোক ভিন্ন কেহই এ শ্রেণীতে থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণীতেও বড় বেশী লোক নাই। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত লোকই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। সম্পূর্ণ স্বার্থপরতাবর্জিত নিষ্কাম,স্বাভাবিক, উদারও পবিত্র প্রেম বড় দুর্ল্লভ। ভগবদ্ভক্ত মহাজন ভিন্ন সে ধন কেহই লাভ করিতে পারে না। মানুষ সাধারণতঃ প্রেমকে স্বার্থের দাস করিয়া রাখে। স্বার্থের সহিত সংঘর্ষণ হইলে,প্রেমকেই অগ্রে সরায়। প্রেম যদি প্রকৃতিগত না হইত, তবে জগৎ হইতে কবে লুপ্ত হইয়া যাইত। অন্যান্য বৃত্তি চরিতার্থ করার যেমন প্রয়োজন, প্রেমবৃত্তি চরিতার্থ করাও তেমনি প্রয়োজন। "প্রেমটা মনের এক কোণে পড়িয়া থাকুক, সময় সময় একটু কাজ করাইয়া লওয়া যাইবে; কিন্তু সাবধান,যেন বড় বাড়িয়া না উঠে; যেন অন্য প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করার পথে অন্তরায় না হয়," এই ভাবেই যেন লোকে প্রেমকেদেখে। অথবা প্রেম-শাস্ত্র না জানাতে, উহাকে বহুশাখাবিশিষ্ট করিতে গিয়াই প্রেমের বিনাশ সাধন করে। সুতরাং প্রেমের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ যে তৃপ্তিও সুখ তাহাও ভোগ করিয়া ধন্য হইতে পারে না।

প্রেমের ভিতর এই স্বার্থপরতার বীজ নিহিত আছে বলিয়াই জগতে এত দুর্গতি-পাপ তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা! তাই আমরা, এই ক্ষীণ চরিত্র লইয়া পড়িয়া আছি; তাই আমাদের পুত্র কন্যারাও [illegible] পারিতেছে না। নিষ্কাম উদার প্রেম ভিন্ন চরিত্র সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ হইতে পারেনা, সুতরাং অপরকেও প্রকৃত প্রেম শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না;— অপরের চরিত্রও নির্ম্মল করিতে পারা যায় না। আমার জীবনের কলঙ্ক অজ্ঞাতসারে পৃথিবী ছাইয়া পড়িতেছে। আমি যে আপনা ভুলিয়া প্রেম করিতে পারিতেছি না; আমার স্বার্থপরতা গোপনে গোপনে জগতে ছড়াইতেছে। আমার বিকৃত প্রেম জগতে ছড়াইয়া অপরের প্রেমেও বিকৃতি উৎপাদন করিতেছে।

বুদ্ধদেব বিশ্ব-প্রেমে আপনাকে হারাইয়াছিলেন। তাঁহার সংস্পর্শে কত-লোকের প্রাণে প্রেম জাগিল, তাহারাও মুহূর্ত্তমধ্যে পবিত্র হইল; আশক্তিবন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইল; এবং প্রেমে মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রেম বিতরণ করিতে ধাবিত হইল। যীশু সেই অমৃত কল্পতরুর ফল স্বরূপ অক্ষয় অনন্ত প্রেমধনের অধিকারী হইয়াছিলেন; তিন বৎসর মধ্যে পৃথিবীতে অনন্ত কালের জন্যে এক প্রেমস্রোত প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। অশিক্ষিত, দরিদ্র, সমাজের অতি নিম্ন শ্রেণীস্থ কয়েকটী সামান্য লোক যেমন তাহার সংস্পর্শে আসিল, অমনি যেন পরশমণির স্পর্শ পাইল! প্রেমের মন্ত্র যাই কানে দিলেন, অমনি তাহারা জগতের দীন দুঃখীর সেবায়, সমাজের পরিত্যক্ত পাপী তাপীর উদ্ধারার্থ ছুটিল।

এই সে দিন বঙ্গদেশে প্রেমিকবর গৌরচন্দ্র কি অদ্ভুত লীলা দেখাইলেন! [illegible]

সেই পাগল হয়। যাহাকে কোল দিলেন, সেই আত্মহারা হইল। নিজে জীবের দুঃখে যেমন কাতর, নিকটে যে আসে, সেও তেমনি হইতে লাগিল।

অপরের চরিত্র গঠনে প্রেমের কি আশ্চর্য্য শক্তি! বিস্তর শিক্ষা দিয়া, নিয়ত উপদেশ দিয়া, শত সহস্র ঘটনা দেখাইয়াও আমরা লোকের চরিত্র ভাল রাখিতে পারিতেছি না। কিন্তু প্রেমিকগণের দর্শন স্পর্শনে মহাপাপীও মুহূর্ত্ত মধ্যে উদ্ধার লাভ করিয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত বিস্তর আছে। প্রেমই পাপী তরাইতে পারে, আর কেহই পারে না। যাঁহারা জগতের পাপীদিগের সেবায় নিযুক্ত হইতে চান, তাঁহারা যেন অগ্রে চিন্তা করেন, প্রেম সাধনে কতদূর সক্ষম হইয়াছেন।

ভালবাসায় পড়িয়াই মানুষ ভাল অথবা মন্দ হয়। ভাল লোকের ভালবাসায় পড়িলেই ভাল হয়, মন্দ লোকের ভালবাসায় পড়িলেই মন্দ হয়। যাহাকে কোন মতে বশীভূত করিতে পারিলে না, ভালবাসায় ফেলিতে পারিলেই সে বশীভূত হইবে। প্রেমই বশীকরণের মহামন্ত্র। এই মোহনমন্ত্র-প্রভাবে সাধুগণ পাপীদিগকে উদ্ধার করেন, আর অসাধুগণ, সরল-প্রাণ, দুর্ব্বলহৃদয় ব্যক্তিদিগকে পাপপথের পথিক করে। কুসঙ্গে পড়িয়া, যাহাদের সহিত প্রণয় আছে, তাহাদের কুকার্য্যে প্রবৃত্তি দেখিয়াই, মানুষ কুপথে পদার্পণ করে। পাপের দৃষ্টান্ত না দেখিলে কেহই পাপী হইত না। বাল্যকালাবধি যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখে, চরিত্র আপনা আপনি সেইরূপ হইয়া পড়ে। বহু প্রকারের দৃষ্টান্তের মধ্যে যাহাদিগকে মানুষ বেশী ভালবাসে, তাহাদের দৃষ্টান্তই তাহার জীবনে বিশেষ রূপে প্রতিফলিত হয়। অতএব, পিতা মাতা যদি সন্তানকে ভালবাসিয়া, সন্তানের ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিতে পারেন; যদি এমন ভালবাসা দিতে পারেন, যাহাতে তাহারা আর অপর কাহারও ভালবাসা পিতা মাতার ভালবাসা অপেক্ষা বেশী বোধ করিতে না পারে; পিতা মাতা যদি স্বস্ব চরিত্রে পবিত্রতা ও মহত্ত্ব রক্ষা করিতে পারেন; যদি সন্তানদিগকে অসৎ লোকের সঙ্গ হইতে দূরে রাখিতে পারেন, এবং সাধু লোকের সংসর্গে রাখিতে পারেন, তবে সে সন্তান নিশ্চয়ই সদাত্মা হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অধিক কি, মাতা একাই যদি সন্তানকে সাধু দৃষ্টান্তের সহিত প্রেম দিতে পারেন, তাঁহা হইলেই সন্তান সাধু জীবন লাভ করিবে। কেননা বাল্যকালে সন্তান সহজেই মাতাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসে, এবং সহজেই তাঁহার আচরণ, ভাব ও চিন্তাসকল জীবনে গ্রথিত করে।

মানুষ ভালও হয় প্রেমে, মন্দও হয় প্রেমে। পবিত্র প্রেমে পড়িলেই পবিত্র হয়; কলুষিত,— বিকৃত প্রেমে পড়িলেই কলুষিত ও বিকৃত হয়।

প্রেমের এই সংক্রামকত্ব ও বশীকারকত্ব, এই দুইটী গুণের প্রভাব বশতই প্রেম অপরের চরিত্র গঠনের উৎকৃষ্টতম একমাত্র উপায়। আর প্রকৃত, সুবিকাশিত প্রেম সহজেই চরিত্রকে যে প্রকারে উন্নত করে, তাহা এই প্রস্তাবের প্রথমেই আলোচিত হইয়াছে। এই প্রেমরূপ রজ্জু ধরিয়াই পৃথিবী স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইবে, অন্য পথ নাই।

———

আমার মকদ্দমা।

(১৭২ পৃষ্ঠার পর)

মোকদ্দমার দিন আসিল; কিন্তু শমনজারি না হওয়ায় সাক্ষীরা কেহই যাইতে চাহিল না। কাযেই আমি একাই যাত্রা করিলাম। অবকাশের দরখাস্ত করিলেই অন্য দিন ধার্য্য হইবে, ইহাতে কঠিন ব্যাপার কিছুই নাই; এই কারণে দাদা মহাশয় গমন করিলেন না।

যথাসময়ে পঁহুছিয়া উকীল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। বাবু মুখ তুলিয়া কথা কহিলেন না; হঁ হাঁ করিয়া মোহরির নিকট যাইবার আদেশ দিলেন।

আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। মুহুরি বলিল, "সময় পাওয়া সহজ নহে।" কথা শুনিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। কি উপায়ে মোকদ্দমা স্থগিত হয়, তাহার উপায় করিতে অনুরোধ করিলাম। মুহুরি বলিল "তোমার পীড়া হইয়াছে বলিয়া দরখাস্ত করা যা'ক; সেই সঙ্গে একটা অ্যাফিডেবিট করিলে নিশ্চয়ই অবকাশ পাওয়া যাইবে; তুমি কিন্তু উকীল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে না।"

উকীল বাবুর সহিত ইতিপূর্ব্বেই দেখা করিয়াছি জানাইলাম। মুহুরি তাহা শুনিয়া চিন্তিত হইল, এবং অগত্যা প্রকৃত কারণ দেখাইয়াই আবেদন করা হইল। তখন কোন হুকুম হইল না; কাযেই আমি তীর্থের কাকের ন্যায় হাকিমের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

প্রথমেই বাদী শ্রীধর ঘোষের ডাক হইল। ডাক হইবামাত্র উভয় পক্ষের লোকে আদালতের গৃহ পূর্ণ হইল। কাহারও হাতে দপ্তর, কাহারও কানে কলম; কেহ বা পান হাতে লইয়া,কেহবা পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া উপনীত হইল। উকীল, মোক্তার ও মুহুরি দলে দলে প্রবেশ করিলেন। উকীল বাবুরা সকলে বসিবার স্থান পাইলেন না; কাযেই নব্যসম্প্রদায় যাত্রাদলের মুড়ির শোভা বিকাশ করিতে লাগিলেন।

কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলাম মোকদ্দমা গুরুতর। বিশেষ বিবরণ জানিতে ঔৎসুক্য জন্মিল। একটি বৃদ্ধ আমার পার্শ্বে বসিয়া ছিল; তাহার আকার প্রকার দেখিয়া মনে হইল সে যেন মোকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যক্তি-গণের পরিচিত। তাহার সহিত আলাপ করিয়া সবিশেষ অবগত হইলাম,— শ্রীধর গঙ্গাধর সহোদর দ্বয়ের পাঁচ কাঠা জমির জন্য এই মোকদ্দমা হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ শ্রীধর এই জমির নিমিত্ত কনিষ্ঠ গঙ্গাধরের নামে ফৌজদারীতে নালিশ করিয়া দণ্ডিত করেন। গঙ্গাধর পাঁচশত টাকা ব্যয় করিয়াও সে হুকুম রহিত করিতে পারে নাই। কাজেই দেওয়ানীতে স্বত্বের মোকদ্দমা স্থাপিত হয়। এক বৎসর ভোগের পর বিচারের দিনে আইনের তর্কে হাকিম মোকদ্দমাটি ডিশমিস করেন। গঙ্গাধরের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে নিম্ন আদালতের যুক্তি আপীলের হাকিমের ভাল লাগিল না; তিনি মোকদ্দমা ফিরাইয়া প্রমাণ গ্রহণের আদেশ দেন।

শ্রীধর ছাড়িবার পাত্র নহেন—হাইকোর্টে আপীল করিয়া ভাল ভাল উকীল বারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ফল হইল না--- হুকুম রহিত হইল না। কাজেই এই পুনর্জন্ম বা পুনরবতণার পর সংস্কারনিয়মে মোকদ্দমাটী ঘোরা ফেরা করিয়া এগার মাস বয়সে কা'ণ হইতে বিচারে উঠিয়াছে ; বাদীরও জাবানবন্দি হইয়াছে।

এই সব কথা শুনিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসিলাম "মশাই, আপনার কথা শুন্‌লে মনে হয় মোকদ্দমাটী যেন আপনার নিজের।"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল এক রকম তাই বটে। শর্ম্মার যুক্তিতেই সমস্ত কাজ হয়েছে। আমি না থাক্‌লে গঙ্গাধরের সাধ্য কি যে শ্রীধরের সঙ্গে এতদিন যুদ্ধ করতে পারে? কিন্তু এমনই কলিকাল, শেষে আমিই দুষমন হয়েছি।"

আমি বলিলাম 'আপনার সহিত মনান্তরের কারণ?' বৃদ্ধ বলিল "সে অনেক কথা, আমরা বেবনেদি লোকের মত হাত টান করে খরচ কর্ত্তে পারিনি, এই অপরাধ।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আচ্ছা মশায়, এই সকল মোকদ্দমার খরচ কত হয়েছে?"

বৃদ্ধ বলিল "খরচ? আমি তিনমাস পূর্ব্বের কথা বল্‌চি, গঙ্গাধরের ফৌজদারী হ'তে মোট ৫৬৬৩৲ টাকা খরচ হয়েছিল। শ্রীধর বাবুর আরও বেশী, কারণ তাঁকে মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ কর্ত্তে হয়েছে"।

খরচের কথা শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। শুনিলাম, শ্রীধরের পিতার যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীধর গঙ্গাধর ইতিপূর্ব্বে আর এক নম্বর মোকদ্দমা করিয়াছেন। তারপর আবার এই মোকদ্দমা হ'য়ে বাস্তু ভিটে উভয়েই বন্ধক দিয়াছেন। রাম কুমার মিত্র নামক এক মহাজন উভয়েরই বন্ধু হ'য়ে বিনা ওজরে টাকা কর্জ্জ দিয়া সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়াছেন। এই সকল গল্প চলিতেছে, এমন সময় চাপরাশি আসিয়া বৃদ্ধের হাত ধরিল এবং আদালত গল্পের স্থান নহে বলিয়া ধমক দিল। আমরা চুপ করিলাম—চাপরাশি আমাদিগকে আর কিছু বলিল না; কিন্তু অনেকের অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিলে গতিক দেখিয়া বার আনা লোক পলাইয়া গেল—আদালত গৃহ কতকটা শান্তভাব ধারণ করিল।

ক্রমশঃ

অহিফেন।

পদ্যপাঠের কবি এক স্থানে কৌতুক করিয়া লিখিয়াছেন;—

ভোজনে নিপুণ বটে অন্ন, রুটি, ডাল,
কিসে জন্মে? জিজ্ঞাসিলে ঘটিবে জঞ্জাল।
চিনি জন্মে ইক্ষুদণ্ডে মূলে কিম্বা ফলে,
তুষ হতে বহির্গত তণ্ডুল কি কলে,
এ সকল পরস্পর মীমাংসা করিয়া,
পরম কৌতুকে তারা যায় মাঠ দিয়া।

অহিফেন এক প্রকার বাঙ্গালী গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য; অথচ ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে

আমাদের এরূপ অজ্ঞতা যে তদ্বিষয়ে কোন কথা লিখিবার পূর্ব্বেই বাল্যকালে অভ্যস্ত উপরি উক্ত কবিতাটী স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। অনেকেরই ধারণা আছে যে অহিফেন উদ্ভিজ্জাত পদার্থ বিশেষ;— কিন্তু ইহার উৎপত্তিস্থান "মূলে কিম্বা ফলে" সে বিষয়ে অনেক কৌতুকাবহ মত শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল মতভেদ দূর করিবার অভিপ্রায়ে আমরা, প্রথমে অহিফেন কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

অহিফেনের আবাদ করিতে হইলে অত্যন্ত উর্ব্বরা জমির আবশ্যক। ভারতবর্ষে গঙ্গানদীর তীরবর্ত্তী ছয় শত মাইল দীর্ঘ ও ও দুই শত মাইল প্রশস্ত প্রদেশে অহিফেনের চাষ হইয়া থাকে। এই প্রদেশটী কাশীর পশ্চিম ভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ব্বে বিহার প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অহিফেনের বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে জমিতে বেশ ভাল করিয়া লাঙ্গল দিয়া মাটীকে গুঁড়া করিয়া ফেলিতে হয়। পরে সেই মৃত্তিকাতে বীজ বপন করিয়া তাহাতে জল সেচন করিতে হয়। তাহার পর গাছ জন্মিয়া গেলে আর বিশেষ কোন পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন হয় না,— তবে গাছগুলি খুব ঘেঁসাঘেঁসি না হয়, ইহা দেখা আবশ্যক; এবং মধ্যে মধ্যে ঘাস ও অন্যান্য গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হয়।

ভারতবর্ষে সচরাচর কার্ত্তিক মাসেই অহিফেন বৃক্ষের বীজ বপন করা হয়, এবং পৌষ মাসের শেষে অথবা মাঘ মাসের প্রথম ভাগেই অহিফেন বৃক্ষে ফুল ধরে। ইহার প্রায় এক মাস পরেই ইহার ফলগুলি আমড়ার ন্যায়বড় হয় এবং এইরূপ অর্দ্ধপক্ক ফলের রস হইতেই নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসারে ব্যবহারোপযোগী অহিফেন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অহিফেন বৃক্ষের ফল হইতে রস বাহির করিবার জন্য চারিটী ছোট ছোট ছুরিকে পরস্পরের সহিত বাঁধিয়া এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করা হয়। এই যন্ত্রে ছুরীর ফলা কয়েকটী পরস্পরের সহিত সমান্তর ভাবে অবস্থিত থাকে। এইরূপ একটী যন্ত্র লইয়া একজন লোক প্রত্যেক অহিফেন ফলটিকে বিদ্ধ করিয়া দিয়া যায়। পরদিন প্রাতঃকালে সেই সকল ফল হইতে নির্গত রসকে চাঁছিয়া লইয়া একটী মৃত্তিকা নিৰ্ম্মিত পাত্রে একত্রিত করা হয়। এই পাত্রটী পূর্ণ হইয়া গেলে তাহা বাটীতে লইয়া গিয়া,সেই রস একটি পিত্তলের থালার উপর রাখিয়া, থালাটি একটু কাত করিয়া রাখিতে হয়। তাহাহইলে জলবৎ তরল একটা রস গড়াইয়া পড়ে। এই তরল রস যতই বাহির হইয়া যায়, ততই অহিফেন প্রস্তুতের পক্ষে সুবিধা হয়। ইহার পর তিন চারিসপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহ ইহাকে উল্টাইয়া দিতে হয়। যাহাতে সকল অংশ সমান বাতাস লাগিয়া সমান ভাবে শুষ্ক হইয়া সমান ঘন হয়, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। তাহার পরে ইহা বাতাস লাগিয়া কিয়ৎ পরিমাণে ঘন হইলে মৃৎপাত্রে ভর্ত্তি করিয়া গবর্ণমেণ্টের ফ্যাকটরি বা কারখানায় লইয়া যাওয়া হয়। সেই সকল কারখানায় অতি বৃহৎ পাত্র আছে। তাহাতে ঢালিয়া বেশ করিয়া পেষণ করিয়া, সেই পেষিত কর্দ্দমবৎ দ্রব্যটিকে গোলাকার বা চ্যাপটা

করিয়া পাকান হয়, এবং পরিশেষে উত্তমরূপে শুকাইলে তাহাই বাজারে বিক্রয়ার্থ বাক্সবন্দী করা হয়।

শীতকালই অহিফেন ফল হইতে রস সংগ্রহ করিবার প্রকৃষ্ট সময়। কারণ অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইলে রস শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা; আবার অধিক বৃষ্টি হইলেও রস একেবারে ধুইয়া গিয়া বিশেষ ক্ষতি হইয়া যায়।

ভারতবর্ষ ব্যতীত তুরস্ক, মিসর, পারস্য ও চীন দেশেও অধিক পরিমাণে অহিফেনের চাষ হইয়া থাকে। ইউরোপের কোনও অংশে এবং ইংলণ্ডেও অল্প পরিমাণে খুব ভাল অহিফেন আবাদ হইয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অহিফেন চাষ করিতে দেন না। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও বিহার প্রদেশের যে যে জেলাতে অহিফেন চাষ করিবার অনুমতি আছে, তত্তৎ স্থানেও লাইসেন্স বা পাশ না লইলে চাষ করিবার উপায় নাই। সকল বৎসর সমান পরিমাণে জমি চাষ হয় না। তবে কোনও কোনও বৎসর এক মাত্র বেহার প্রদেশেই প্রায় কুড়ি লক্ষ বিঘা জমিতে অহিফেন চাষ হয়। প্রত্যেক বিঘা জমিতে তিন হইতে পাঁচসের পর্য্যন্ত অহিফেন পাওয়া যায়।

এই প্রকারে প্রস্তুত অহিফেন গবর্ণমেণ্টের সাধারণতঃ পাঁচ টাকায় এক সের করিয়া ক্রয় করিয়া থাকেন। তবে যে আমাদিগকে প্রায় চল্লিশ টাকা করিয়া সের ক্রয় করিতে হয়, অহিফেনের উপর রাজকরই তাহার কারণ। একমাত্র অহিফেন হইতেই ১৮৯৫-৯৬ সালে গবর্ণমেণ্ট মেদিনীপুর জেলাতে ১৪১২৮১৲ টাকা কর আদায় করিয়াছেন। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলাতে অহিফেনের উপর ৭৯৬৯২৲ টাকা কর আদায় হইয়াছিল। এই রাজকরের দ্বৈগুণ্য দেখাইয়া কাঁথি স্কুলে সভা আহ্বান করিয়া কলিকাতা হইতে আগত ধর্ম্মপ্রচারক বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন চন্দ্র পাল, এবং সম্ভবতঃ বিপিন বাবুর বক্তৃতার ছায়া অবলম্বন করিয়া, মে মাসের কান্তিতে একজন প্রবন্ধলেখক দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, যে মেদিনীপুর জেলাতে ২০ বৎসরের মধ্যে অহিফেনের ব্যবহার প্রায় দ্বিগুণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মেদিনীপুর জেলাতে ১৮৭৫-৭৬ সালে একশত চৌদ্দ মণ সাঁইত্রিস সের অহিফেন বিক্রয় হইয়াছিল। আর গত বৎসর একশত ছাব্বিশ মণ পঁচিশ সের অহিফেন বিক্রয় হইয়াছে। বলা বাহুল্য ১২৬ কোন যুক্তিবলেই ১১৪র দ্বিগুণ হইতে পারে না। মেদিনীপুরের জনসংখ্যা এই বিংশতি বৎসরে ২৫৪০৯৬৩ স্থলে ২৬৩১৫১৬ হইয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে কুড়ি বৎসরে মেদিনীপুরে অহিফেনের ব্যবহার অতি সামান্য মাত্র বাড়িয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। প্রচারক ও প্রবন্ধলেখক মহাশয়গণ গড্ডালিকা-প্রবাহে পতিত হইয়া কাকতালীয়বৎ যুক্তিপরম্পরা অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেণ্টের উপর অযথা যে দোষারোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞজনোচিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক আবকারী বিবরণী

(Administration Reports) গুলি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, যাহাতে দেশ মধ্যে মাদক দ্রব্যের প্রচার অধিক না হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে করের হার বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। সেই হার বৃদ্ধি, অহিফেন প্রস্তুতের ব্যয় বৃদ্ধি, এবং আমাদের বংশ বৃদ্ধিই গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে অহিফেন করজাত আয়দ্বৈগুণ্যের প্রধান কারণ। উহা অহিফেন ব্যবহারাধিক্যের পরিচায়ক নহে।

অহিফেনের অনেকগুলি গুণ বাঙ্গালি মাত্রেই দেখিয়া ও ঠেকিয়া অবগত আছেন। অহিফেন শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয়গত অর্থ সর্পবিষ। বাস্তবিক বিষাক্ততায় ইহা সর্পবিষ অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। কোনও কোনও স্থলে চারি গ্রেণ মাত্র অহিফেন সেবন করিয়াই পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে ভবলীলা সম্বরণ করিতে দেখাগিয়াছে। শিশুগণ এক গ্রেণের এক অষ্টমাংশ অহিফেনও অনেক সময় সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, অহিফেনের এইরূপ তীব্র বিষাক্ততার বিষয় ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছেন। পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ অজাতশ্মশ্রু বালক হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বশ্রূাদিপরিজনকলহবিধুরা অসূর্য্যম্পশ্যরূপা অভিমানিনী কুলললনা পর্য্যন্ত সকলেই আত্মহত্যা করিতে হইলে প্রধানতঃ অহিফেনেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক সমস্ত জগতে যত আত্মহত্যা হইয়া থাকে তাহার মধ্যে অর্দ্ধেকেরও অধিক অহিফেন দ্বারা সাধিত হয়। বিষাক্ততার অন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন।

অহিফেনসেবন ভারতবর্ষের অধিবাসীগণের একটি প্রধান নেশা। অভ্যাস করিলে এ নেশা ছাড়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। এদেশে সাধারণতঃ লোকে বৃদ্ধ বয়সে অনিদ্রা বা কোনও সেবনীয় রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই অহিফেন সেবন আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহার এমন গুণ যে মাসাবধি ব্যবহার করিলে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। আরম্ভকালে সকলেই অতি অল্প মাত্রায় অহিফেন সেবন করিয়া থাকেন; কিন্তু, কিছুদিন পরে "মৌতাৎ" না বাড়াইলে আর কোনও উপকার বোধ হয় না। এইরূপে অনেক স্থলে "মৌতাৎ" বাড়িতে বাড়িতে এত বাড়িয়া যায় যে তখন অহিফেনে আর কোনও উপকার না হইয়া একটি খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। অধিক মাত্রায় যাঁহারা নিয়মিত অহিফেন সেবন করেন তাঁহাদের শরীরের রক্ত এত বিষাক্ত হইয়া যায় যে বিষধরসর্প দংশন করিলে তাঁহাদের কোন অপকার হওয়া দূরে থাকুক, সর্প নিজে দংশনমাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যকে নিয়মিত প্রত্যহ দুইভরি পর্য্যন্ত অহিফেন সেবন করিতে দেখা গিয়াছে। অনেকে অহিফেন সেবন না করিয়া অহিফেন হইতে প্রস্তুত দেশীয় মাদক বা গুলি ও চণ্ডু সেবন করিয়া থাকেন। অনেকে আবার বিলাতী মতে প্রস্তুত অহিফেনের "লডেনম" নামক আরক সেবন করিয়া থাকেন। ইংরেজী সাহিত্যে সুপরিচিত ডি কুইন্সী সাহেব এক এক বারে আড়াই পোয়া পর্য্যন্ত "লডেনম্" সেবন করিয়া নেশা করিতেন।

অহিফেনের বা অহিফেন জাত অন্য মাদক দ্রব্যের নিয়মিত সেবনের গুণ দোষ বিচার করিয়া যেসকল লেখা পড়া হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় যে, অল্প মাত্রায় নিয়মিতরূপ সেবনে শরীরের বিশেষ কোনও অপকার হয় না, বরং সময়ে সময়ে উপকার হইয়া থাকে। তবে কোন নেশারই বাড়াবাড়ি ভাল নহে,এবং পার্থিব সমস্ত বিষয়েই "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং"।

বিষাক্ততাগুণবিশিষ্ট পদার্থ মাত্রেরই ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। অহিফেন অনেক কবিরাজী ঔষধে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পাশ্চাত্য দেশের ঔষধেও ইহার প্রচলন বড় অল্প নহে। ব্রিটিশ ফার্মেকোপিয়া নামক ইংরেজী মতে ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর পুস্তকে অহিফেন হইতে প্রস্তুত কুড়ি রকম ঔষধের নাম দৃষ্ট হয়। "মর্ফাইন্" নামক একটি পদার্থের উপরই অহিফেনের শারীরযন্ত্রের উপর ক্রিয়া নির্ভর করে। ঔষধার্থে ¼ হইতে ৩ গ্রেণ পর্য্যন্ত অহিফেন প্রদত্ত হইয়া থাকে। অহিফেন "খোর" দিগের পক্ষে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। অনিদ্রা, উদরাময় ও যন্ত্রণার পক্ষে এরূপ ঔষধ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অহিফেন সেবন করিলে মস্তিষ্কের কার্য্যকারিতার হ্রাস হইয়া নিদ্রা উৎপাদন করে এবং ঘর্ম্ম ব্যতীত অপর কোন শারীরিক মল বাহির হইবার ব্যাঘাত জন্মায়। শেষোক্ত কারণেই অহিফেন উদরাময়ের এক প্রধান ঔষধ। অহিফেন সেবন করিলে বাহ্য পদার্থে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না—সেইজন্য অনেক সাহিত্যব্যবসায়ী লোকে একাগ্রতা উৎপাদন করিবার জন্য অহিফেন সেবন করেন।

এক কথায়, অহিফেন কৃষকের অন্ন সংস্থান, রাজকোষের এক প্রধান সম্বল, আত্মহত্যাকারীর সুলভ আশ্রয়স্থল, জরাজীর্ণ-বৃদ্ধের শান্তি-বিধাতা, নানাবিধ নেশার জন্মদাতা এবং ডাক্তার ও কবিরাজের হস্তে অমোঘ ঔষধরূপে বিরাজিত হইয়া কত প্রকারে যে মনুষ্যের ব্যবহারে লাগিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

কাত্তন।

কাঁদে অলি আকুল নয়ানে।
বলে, আলি আমার কোন্ খানে
(শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণে)
গুন্ গুন্ ক'রে
করুণ—স্বরে
ফুলসখী ব'লে গাঢ় অভিমানে।
(ভাসি আঁখিজলে)। *

---

* লোফা

বলে
আমি তোমা দেখি নাক
কোথা তুমি ফুটে থাক
কেহ নাহি বলে কিছু কাণে গো।
(তবু কেমনে তা জানি গো)
(বল কিসে তা জানিনু গো)

তুমি
দেবতা-দুর্লভ ধন
আমি অতি অকিঞ্চন
(তবু) দৈবশক্তি কেবা দিল প্রাণে গো।
(দীন ভোমরায় গো)

আমি
থাকি যে ঘুমের ঘোরে
কেন জাগাও ডেকে মোরে,
জেগে উঠি মরমের ডাকে গো।
(নয় কে জাগিত গো)

(কেবা শিখাইল—ডাক শুনিবারে, বল)
(কার শিক্ষা দীক্ষা গো)
অপরূপ তাড়িত টানে
সদা বাঁধা প্রাণে প্রাণে,
(অলি আর ফুল গো)

মরণে (ও) বিচ্ছেদ নাহি থাকে গো।
(দূরে বা নিকটে গো)
(তাত জান, জান সই গো)

তুমি
চির চারুতার খনি
সাধুজন-শিরোমণি
কদাকার কুৎসিত অতি আমি গো।
(পদরেণু সম নই গো)
(কালিমা-জড়িত গো)

তবু
অতৃপ্ত উদাম আশা
মরমদাহী পিয়াসা
বুকে ধরি হনু বনগামী গো
(কার এ ছলনা মরম দহিবারে' বল)

কালো বুকে উঁচু আশা
কালো প্রাণে ভালবাসা
অপরাধ সেত নয় আমার গো।
(কারে দোষ দিবে সই)

এখন
পিয়াসু ভিখারী, সখি,
আরে মরে দেখিছ কি?
খোল বক্ষ ঢাল সুধাধারা গো,
(বদনে আমার গো)। *

পাতার আড়ে ব'সে
ফুল রাণী হাসে
মকরন্দ-করে অলি ধরি আনে,
(ভরা বক্ষ মাঝে)। * *

---

* দশকুশী।

* * লোফা।

কার এ হৃদয় ?

"মরিয়ে দেখিতে বাসনা হয় !"
বলেছিলে সখি "কার এ হৃদয়
মরিয়ে দেখিতে বাসনা হয় !"
নির্ম্মল শরদাকাশে
পূর্ণ চন্দ্র পরকাশে
বসিয়া গৃহের ছাদে, হাসিয়ে আমায়
বলেছিলে, প্রিয়তমে, কথায় কথায়,—
"আমি এ হৃদয়েশ্বরী ? কার এ হৃদয়,
মরিয়ে দেখিতে বাসনা হয় !"
স্বর্গের বিহঙ্গী তুমি,
ত্যজি পাপ মর্ত্ত্য ভূমি,
গিয়াছ উড়িয়ে,
প্রণয়িনি লো আমার !
দিন মাস কত কত
ক্রমশঃ হইল গত,
মরিনু পুড়িয়ে,
আদরিণি লো আমার !
মরিনু পুড়িয়ে প্রাণে,
ডুবি মাত্র তব ধ্যানে
স্নিগ্ধ করি প্রাণ,
প্রাণেশ্বরি লো আমার !
তুমি স্বর্গে, আমি মর্ত্ত্যে,
আঁখির মিলন নাই;
তুমি স্বর্গে, আমি মর্ত্ত্যে
তোমারে ডাকি না পাই;
মানময়ি লো আমার !
স্বর্গের বিহঙ্গী তুমি,
ত্যজি পাপ মর্ত্ত্যভূমি,
গিয়াছ উড়িয়ে,
সোহাগিনি লো আমার !
স্বর্গ হ'তে একবার
দেখ দেখ প্রাণাধার,
অথবা নামিয়ে,
প্রেমময়ি লো আমার,
অন্তরে প্রবেশ কর, অন্তরীক্ষ বাসিনি,
মিনতি আমার !
অন্তরে প্রবেশ করি,
দেখ, প্রাণ সহচরি,
বুকের ভিতর এই জ্বলন্ত হৃদয়
তোমার, না, কার !
নিবেছে তোমার চিতা, নিবেনি যে প্রাণ,
দেখ, প্রাণ সহচরি, কার সে পরাণ !
কেবা সে প্রাণের পরে
আজিও রাজত্ব করে
দেখ এস একবার, ত্রিদিব বাসিনি !
এ হৃদয় শিলা তলে
সদা অন্তঃশিলা চলে,
দেখ আসি একবার, কোন্ তরঙ্গিনী !
ভুলেছ মর্ত্ত্যের ব্যথা,
ভুলেছ মর্ত্ত্যের কথা,
আপন বদন ছবি ভুলেছ কি সখি ?
দর্পনে সে ছবি তবে আইস নিরখি !
শত পারিজাত প্রতিবিম্বিত যেখানে,
নন্দনে স্বর্ণদী কূলে দাঁড়ায়ে সেখানে,
দেখো মুখ নত করি;
মন্দাকিনী আলো করি
একখানি মুখপদ্ম উঠিবে ফুটিয়া,
পারিজাত প্রতিবিম্বে মলিন করিয়া !

পারিজাত পত্র গুলি
ধীরে ফেলি, ধীরে তুলি,
ধীরে ধীরে মন্দাকিনী বারি নাচাইয়ে,
ধীরে ধীরে সেই প্রতিবিম্ব কাঁপাইয়ে,
ধীরে ধীরে কহিবেক মলয় পবন —
"অই চারু প্রতিবিম্ব তোমার (ই) বদন!"

তখন অন্তর মাঝে প্রবেশি আমার,
দেখিবে অন্তরে ছবি বিরাজিছে কার!
মন্দাকিনী জলে প্রতিবিম্বিত যে ছবি,
এহৃদয়ে চিরাঙ্কিত হেরিবে যে ছবি,
তুলনা করিয়ে দেখো এক কি বা নয়;
তখন বুঝিবে, সখি, কার এ হৃদয়!

——**——

সংবাদ।

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে আমাদের কার্য্যালয় একমাস বন্দ থাকায় বর্ত্তমান সংখ্যা প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইয়াছে। গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের কান্তি একত্রে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।

নন্দীগ্রাম থানার অধীনস্থ গ্রাম সমূহের দেওয়ানী এলাখা কাঁথি মুন্সফী হইতে তমলুক মুন্সফীর অন্তর্ভূত হইল। ১লা নবেম্বর হইতে তমলুক মুন্সফীতে ঐ সকল স্থানের মোকর্দ্দমা রুজু হইবে এবং কাঁথি দ্বিতীয় আদালতে যে সকল মোকর্দ্দমা দায়ের ছিল তাহাও তমলুক মুনসফীতে বিচার হইবে, কাঁথি হইতে নথি তমলুক প্রেরিত হইয়াছে।

উক্ত পরিবর্ত্তনে অতঃপর কাঁথিতে তিনটি মুন্সফী ও তমলুকে চারিটি মুনসফীহইল এবং গুমগড় ও আরঙ্গনগর পরগণা, এবং জলামুঠা পরগণার অর্দ্ধাংশ এবং সুজামুঠা ও কেওড়ামালের কিয়দংশ দুইশতের ও অধিক গ্রাম তমলুকের এলাকাভুক্ত হইল।

বলা বাহুল্য এই পরিবর্ত্তনে কাঁথির গুরুত্বের সম্পূর্ণই হানি হইবে। কিন্তু তাহা হইতে কান্তির স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহের কিছু মাত্র কারণ নাই।

অতঃপর নন্দীগ্রাম থানার নীলামের তালিকা কান্তিতে প্রকাশিত হইবে কি না অনেকেই জানিতে চাহিয়াছেন এবং নিলাম গুলি যাহাতে পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত হয় তজ্জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন নীলামের তালিকা কান্তিতে প্রকাশিত হওয়ায় সাধারণের বিশেষ উপকার হইতেছে এবং দুষ্ট প্রবঞ্চকগণের অভীষ্ট সাধনে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। জেলার মহিমাবর জজ সাহেব বাহাদুরের অনুগ্রহেই আমরা কাঁথি আদালত হইতে নীলামের তালিকা পাইয়া থাকি। তাঁহার নিকট তমলুকের নীলামের তালিকা পাইবার নিমিত্ত আবেদন করা হইবে। আমরা দয়াবান্ সাহেব বাহাদুরের নিকট বিফল মনোরথ হইবনা বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস।

আমাদিগের বিবেচনায় এই

পরিবর্ত্তনে নন্দীগ্রাম থানার অধিকাংশ লোকেরই অসুবিধা হইবে। এবং গর্ভর্ণমেণ্টের ও ক্ষতি হইবে। তবে ইহাতে মহিষাদল রাজারই যে বিশেষ সুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তমলুক ইঁহাদের জমিদারী সেখানে তাঁহাদের নিয়োজিত উকিল মোক্তার কর্ম্মচারী প্রভৃতি রাখিতে হইয়াছে। অতঃপর তাঁহাদের গুমগড় প্রভৃতি জমিদারীর জন্য কাঁথিতে পৃথক কর্ম্মচারী বা উকিল রাখিতে হইবেনা; তমলুকের কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক সমুদয় কার্য্যই সমাধা হইবে। ইহাতে ব্যয়ের লাঘব হইবে বলা বাহুল্য। নন্দীগ্রাম থানায় অধিকাংশ লোককে হলদি নদী পার হইয়া তমলুকে যাইতে হইবে। হলদি মহিষাদল জমিদারী ভুক্ত; হরিখালী ও তেরপেখ্যা দুইটী প্রধান ঘাট—একটী রাজার দেওয়ান ও পাট্টাদার শ্রীযুক্ত বাবু নীলমনি মণ্ডলের অধীন; আর একটী রাজার প্রদত্ত মতে তদীয় আশ্রিত ব্যক্তির আয়ত্ত। প্রজাগণের সহিত রাজার প্রায়ই মালী মোকদ্দমা হইয়া থাকে। অধীনস্থ রাজ কর্ম্মচারীগণ বিপক্ষ পক্ষের পারাপারের নানারূপ অসুবিধা ঘটাইয়া প্রজাগণের মোকদ্দমায় হানি করা অসম্ভবনহে।

হরিখালী ঘাটে নীলমনি বাবুর আয়ের যথেষ্টই বৃদ্ধি হইবে কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই পরিবর্ত্তনে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের আয়ের সম্পূর্ণ ক্ষতি হইবে। নন্দিগ্রাম বাসীগণকে কাঁথি আসিতে হইতে রসুলপুর নদী পার হইয়া আসিতে হয়। রসুলপুর গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি, কালীনগর ও রসুলপুর ঘাট হইতে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের যথেষ্ট আয় হইয়া থাকে। অতঃপর আর সেরূপ আয় হইবেনা।

ইতিপূর্ব্বে কাঁথিতে তিনটি মুনসেফির উপযুক্ত গৃহই ছিল। কয়েক বর্ষ যাবৎ বহুব্যয়ে চতুর্থ আদালত গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে অতঃপর সেই গৃহ অকারণে পড়িয়া থাকিবে এবং তমলুকে নূতন গৃহ প্রস্তুত করিতে হইবে সন্দেহ নাই। ইহাতে গভর্ণমেণ্টের ব্যয় বৃদ্ধি হইবে বলা বাহুল্য।

শতাধিক বর্ষ নন্দীগ্রাম বাসিগণ কাঁথি এলাখা ভুক্ত রহিয়াছে। এতাবৎ কাল তাহারা ইহাতে অসন্তুষ্ট নহে বা কোন আপত্তি উপস্থিত হয় নাই। নন্দীগ্রামের উত্তর পার্শ্বস্থ কয়েক খানি গ্রাম ব্যতীত আর সকল স্থান হইতেই কাঁথি অপেক্ষা তমলুক দুরবর্ত্তী। তমলুক সহর নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, বাসোপযোগী ঘর নাই, এবং বাসা পাইবারউপায় নাই; যাহা আছে তাহাও আবার জঘন্য স্থানে সন্নিবিষ্ট, মোকদ্দমার পক্ষগণকে অতিকষ্টে সঙ্কীর্ণ স্থানে সময়াতিপাত করিতে হইবে। একেই তমলুকে কলেরার অভাব নাই, তাহতে বহুসংখ্যক নন্দীগ্রামবাসী উপস্থিত হইলে সকলের অদৃষ্ট যে কি ভয়াবহ ফল ফলিবে তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার উপর আবার পরিস্কার পানীয় জলের সম্পূর্ণ অভাব; বিস্তৃত নির্ম্মল পুস্করিণী আদৌ নাই বলিলেই হয়। এই সকল ভয়াবহ অভাবের সহিত কাঁথির সুন্দর বাসোপযোগী গৃহ, মনোরম কর্দ্দম শূন্য বালুকাময় প্রান্তর, বিস্তৃত আয়তন বিশিষ্ট সহর, সমুদ্রাগত দক্ষিণাবায়ু আর নির্ম্মল-জল-বিশিষ্ট কূপের তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই পরিবর্ত্তনে প্রজাবৃন্দকে কিরূপ বিপন্ন করা হইয়াছে।

শ্রীমতী রাণী হরিপ্রিয়া দেবী ও শ্রীযুক্ত রাজা ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায় বাসুদেব

পুরের জমিদার। কেওড়ামাল ও জলামুঠা পরগণা ইহাদের জমিদারী। কেওড়ামালের তিনটি গ্রাম বিরুলিয়া, সুবদি, আমদাবাদ, এবং জলামুঠার কতক অংশ নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত। এই পরিবর্ত্তনে সেই সকল স্থান তমলুকের অধীন হইয়াছে। বাসুদেব পুরের জমিদারগণের অবস্থা বড় ভাল নহে। বিশেষতঃ ভূপেন্দ্র বাবুর ইষ্টেট ঋণদায় গ্রস্থ। এই দারুণ সময়ে তাঁহাদিগকে তম-লুকে পৃথক কর্ম্মচারী উকীল মোক্তার আদি নিযুক্ত করিয়া ও পৃথক কাছারী স্থাপন করিয়া ব্যয় ভার গ্রস্থ হইতে হইবে। ঐ গ্রাম তিনটির [illegible]ও ইহাতে নিতান্ত অসন্তুষ্ট। তাঁহারা মহিমাবর ছোট লাট বাহাদুরের নিকট ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন। শুনিতেছি তাঁহারা এই পরিবর্ত্তনে এতদূর অসুবিধা মনে করেন যে অন্ততঃ ঐ গ্রাম তিনটিকে নন্দীগ্রাম থানা হইতে পার্শ্ববর্ত্তী খাজুরি ও ভগবান পুরের অন্তর্ভুত করিয়াও তাঁহাদিগকে কাঁথির অধীনে রাখিবার প্রার্থনা করিয়াছেন।

এবম্প্রকারে এই পরিবর্ত্তনে যদি প্রজাদিগের লাভ বা সুবিধা না হইয়া কষ্ট ও দুর্দ্দশারই বৃদ্ধি হইল, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের আয়ের যথেষ্ঠ ক্ষতি হইতে চলিল, গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা হইল তবে এই পরিবর্ত্তনের আবশ্য-কতা কি আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এবিষয়ে আমাদিগের বারান্তরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

বালকদিগের পট্কা লইয়া খেলা করিবার ইচ্ছা স্বতঃই প্রবল; কিন্তু ৺কালী পূজার সময় তাহা অধিক মাত্রায় বৃষ্ট হইয়া থাকে। এখনকার তুঁইপট্কা বড় ভয়ঙ্কর দ্রব্যের মিশ্রণে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। যাহার সাহায্যে পাহাড় পর্ব্বত চূর্ণ করা হয়, ডিনামাইট প্রস্তুত হইয়া শত সহস্র লোকের প্রাণবধ ঘটিয়া থাকে সেই প্রধান উপাদান ক্লোরেট্ অব পোটাশ এই পট্কার প্রধার মশলা। ইহা হইতে সময়ে সময়ে ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। সম্প্রতি কাঁথিতে দুইটি শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে। মুন্সেফী আদালতের আমলা শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্রটি একটি পট্কা লইয়া একটি ছোট কাঠি দিয়া তাহাতে ছিদ্র করিতে ছিল। এই সামান্য সংঘর্ষনেই প্রদাহ উপস্থিত হইয়া বালকের বাম হস্তের অঙ্গুলী গুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ বালককে হাঁসপাতালে আনা হইয়া ছিল। বাম হস্তটি সমুদয় কাটিয়া দিয়া বালকের প্রাণ রক্ষা করিতে হইয়াছে।

একটি ধীবর বালক ক্লোরেট ও মনঃশীলা হামানদিস্তায় রাখিয়া মিশাইতে ছিল। আর একটি বালক তাহার নিকট বসিয়া ছিল। সংঘর্ষণে হঠাৎ অগ্নি উৎপত্তি হইয়া হামানদীস্তাটি চূর্ণ বিচূর্ণিত হইয়া একটি বালকের কপালে দারুণ আঘাত করে। একটি বালকের দুইটি হাতারেই অঙ্গুলী গুলি জখম হইয়া যায় এবং আর একটির চক্ষু ভীষণ রূপে আহত হয়। উভয়কেই হাঁসপাতালে আনিতে হইয়া ছিল একটির বাম হস্ত ও দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী কাটিয়া দিতে হইয়াছে। উভয়েই অতিকষ্টে রক্ষা পাইয়াছে। বালক ও অভিভাবকগণ সাবধান।

আমার মকদ্দমা।

(১৯১ পৃষ্ঠার পর)

গল্পে মাতিয়া অন্যমনস্ক ছিলাম। পেয়াদার প্রতাপে গল্প ভাঙ্গিলে চাহিয়া দেখি বাদীর সাক্ষী কাঠরায় দাঁড়াইয়াছে; বাদীর উকিল তাহাকে প্রশ্ন করিতে উঠিয়াছেন। উকিল জিজ্ঞাসিলেন "তুমি নালিশি জায়গা চিন?" সাক্ষী বলিল 'আঁ— কি বল?' উকিল আবার জিজ্ঞাসিলেন যে জমির বিবাদ হচ্ছে, সে জমি তুমি জান?" সাক্ষী উত্তর দিল না, হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইল সে আদলত বা এত লোকজন কখন দেখে নাই; বোধ হইল চারিদিকে উকীল হাকিম দর্শক প্রভৃতি দেখিয়া তাহার মাথা বেঠিক হইয়া গিয়াছে। উকীল বাবু সেই প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করিলেন; সাক্ষী কেবল মাত্র এক সুদীর্ঘ 'আঁ' উচ্চারণ করিয়া ক্ষান্ত হইল। সাক্ষীর গতিক দেখিয়া বাদীর উকীল বাদীর ও তাহার লোকের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বাদী অপরাধীবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

তারপর অদ্ভুত ধীরতা সহকারে দুই চারি বার "আঁ" শুনিয়া, 'তুমি' 'তোমার' প্রভৃতি দ্বিতীয় পুরুষে সম্বোধিত হইয়া বাদীর উকীল বাবু আপন জিজ্ঞাস্য সমাধা করিয়া বসিলে বিবাদীর উকীল ব্যাঘ্র ঝম্পনে জেরা করিতে উঠিলেন। অনেক দিন হইতে জেরা শুনিবার সাধ ছিল। দাদা বলিতেন "যেমন ইন্দ্রের বজ্র, বিষ্ণুর চক্র, তেমনই উকীলের জেরা। এই অস্ত্রবলে তাঁহারা ভুবন জয় করেন, হয়কে নয়, নয়কে হয় আর সত্যকে মিথ্যা করেন; ইহারই সহায়তায় প্রকৃত অপরাধী খালাস পায়; নির্দ্দোষীর দণ্ড হয়"। সেই জেরা শুনার সাধ আজ পূর্ণ করিব ভাবিয়া আনন্দে হৃদয় নাচিয়া উঠিল। বাদীর উকীল আশ্বাস বাক্যে ধীরে ধীরে সাক্ষীর নিকটে অতি যত্ন সহকারে করেকটি কথা বাহির করিয়া ছিলেন। কিন্তু বিবাদীর উকীল সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে কঠোরতার সহিত নির্ম্মম বজ্রগম্ভীর নিনাদে জেরা আরম্ভ করিলে বোধ হইল তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, সে উকীলের চোগাচাপকানমণ্ডিত বরবপু আর চসমা শোভিত নয়ন, বিমুগ্ধবৎ দর্শন করিতে লাগিল। কাজেই উকীল বাবুর বড় সুবিধা হইল তিনি বেচারার সরলতা আপন উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী বুঝিয়া সেইভাবে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; অভিপ্রেত সিদ্ধ হইল, যাহা ইচ্ছা সাক্ষীর মুখ হইতে তাহাই বাহির করিতে লাগিলেন। বাদীর উকীল তাঁহার প্রশ্নে বারবার আপত্তি করিয়া পরাস্ত হইলেন; হাকিম কোন আপত্তিই গ্রাহ্য করিলেন না। শেষ বিবাদীর উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন "যে যায়গার নালিশ তুমি সে যায়গা ত আর দেখ নি?" সাক্ষী বলিল "না।" উকীল বাবু উৎসাহিত হইয়া আবার প্রশ্ন করিলেন "সে যায়গা গঙ্গাধর বাবুই ত দখল করেন?" সাক্ষী উত্তর দিল "হাঁ।" হাকিম বলিলেন "তবে যে এখনই বলছিলি জমি দেখিশ্ নি?" সাক্ষী বলিল

"কি বল ?" হাকিম বিরক্ত হইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাক্ষীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; সাক্ষী যোড়হস্তে সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। হাকিম বলিলেন "তোকে আমি ফৌজদারী সোপরদ্দ কর্‌ব; সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা কথা!" বোধ হয় সাক্ষী তাহার অপরাধ বুঝিতে পারে না, কেননা সে পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিল "কি কর্‌বে কর, আমি কি করেছি ?" হাকিমের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল; অসভ্য সাক্ষী আদালতের অসম্মান করিয়া 'তুমি' বলিবে সমাগত ব্যক্তির নিকট হাকিমকে হেয় করিবে ইহা যেন তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত শিক্ষা দান উচিত বোধে সাক্ষীর ১০৲ টাকা অর্থদণ্ড করিলেন এবং টাকা না দিলে আদালতে আটক থাকিবার আদেশ প্রদান করিলেন। দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়াও দুষ্ট সাক্ষী সম্ভ্রম শিখিল না; আবার হাকিমকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি কেন রাগ কর্‌ছ, আমি ত তোমায় কিছু বলিনি।" হাকিম তাহার দিকে আর চাহিলেন না; সাক্ষিকে নামাইয়া দিতে পিয়াদাকে আদেশ দিলেন। কাঠরা হইতে নামিয়া সাক্ষী পলায়নের উদ্যোগ করিল, পিয়াদা বাহির হইতে দিল না, পেস্কার বাবুর নিকট লইয়া গেল; তিনি তাহার সম্মুখে জবানবন্দী পড়িতে লাগিলেন।

কাঠরায় দাঁড়াইয়া উভয় পক্ষের উকীল আর হাকিমের তাড়নায় ভয়ে সম্ভ্রমে সাক্ষী কোনদিকে চাহিতে পারে নাই; তাহার উপর আবার ফৌজদারী সোপরদ্দের ভয়, অর্থদণ্ড ইত্যাদিতে তাহার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। এখন সময় পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, আর হাঁ করিয়া হাকিমের আকৃতি, উকীলের পোষাক, পেয়াদার পাগড়ি ছাদ ঘড়ি ইত্যাদি দেখিয়া লইতে লাগিল; সেই সময়ে পেস্কার বাবুও বায়ুগতিতে আপন কর্ত্তব্য সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পড়া শেষ হইলে বাবুটি সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কথা বলেছ ত ?" সাক্ষীর যেন ঘুম ভাঙ্গিল, সে বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বোধ করি প্রশ্নটি তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল না, কাযেই কোন উত্তর দিতেও পারিল না। পেস্কার বাবু কিন্তু ছাড়িলেন না, বলিলেন, "হাঁ বল্‌রে বাপু, আর কত ভুগাস"; সাক্ষী তখন বলিল 'হাঁ।' পেস্কার জবানবন্দী লইয়া হাকিমের নিকট উপস্থিত হইলেন, হাকিম তাহাতে কি লিখিয়া দিলেন। আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সাক্ষীর জবানবন্দীতে হাকিম আবার কি লিখিলেন ?" বৃদ্ধ বলিল "সাক্ষী শুনিয়া ঠিক হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিল" এই কথা গুলি লিখিয়া দস্তখত করিলেন।

এদিকে দ্বিতীয় সাক্ষীর জবানবন্দী চলিতে ছিল। বৃদ্ধ বলিল, "ঐ সাক্ষীর কাছে বিবাদীর উকীলের ভারি ভুরি খাটবে না। এ অনেক কাপ্তেন ভাসিয়েছে।' আমি বলিলাম, হাতে হাতে সাক্ষীর দুর্দশা দেখে ওকথা বিশ্বাস কর্‌তে ইচ্ছা হয় না।' বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, 'তুমি উকীলদিগকে চিননা ব'লে ওকথা বলচ; তাঁরা নরমের বাঘ, শক্তের নিকট বড় একটা এগোতে পারেন না।' ফলতঃ কার্য্যতঃ তাহাই দেখিলাম। প্রথম সাক্ষীর জেরার সময় উকীলের [illegible] আস্ফালনের সীমা ছিল

না। কিন্তু এ সাক্ষীকে জেরা করিতে উঠিয়া উকীল বাবু পূর্ব্বভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এই সাক্ষী নালিশি স্থান শ্রীধরের একার দখল প্রমাণ করিল। বিবাদীর উকীল অপর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ত্রিশ বৎসর কাল কোন্ সনের কি মাসে কোন তারিখে কেমন সময় কিরূপে দখলের কি কার্য্য হইয়াছে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; আর সাক্ষী অদ্ভুত স্মরণশক্তি প্রভাবে অবলীলাক্রমে যথাযথ উত্তর দিতে লাগিল। হাকিমও বিনা বাক্যব্যয়ে শিষ্ট শান্ত 'তৃতীয় ভাগের গোপালের' মত মহামূল্যবান গদ্যে সমস্তই কলমবন্দ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে আরও তিনটি সাক্ষী লওয়া হইল। ইহারা সকলেই সমতুল্য, সবাই প্রখর স্মরণশক্তিসম্পন্ন। বাদী প্রথম সাক্ষীটি আনিয়া উকীল বাবুর নিকট তাড়না খাইয়া বাছা বাছা দখলের পাকা সাক্ষী আনিতে লাগিল, আর বিবাদীর উকীলও সেই একই প্রশ্ন সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সাক্ষীরাও সমানভাবে একই উত্তর দিল, এক চুল তফাৎ হইল না। কেবল শেষের সাক্ষীটি একটু গোলকরিয়া ছিল; অমনি বিবাদীর উকীল হাকিমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'নিশ্চয়ই হুজুরের কানে লাগিয়াছে, বাদীর ৪ জন সাক্ষী ১২৭২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে অপরাহ্নে তিন জন লোক মাটিকাটার কথা বলিয়াছে; শেষ সাক্ষী সেরূপ বলিতে পারে নাই; সে বলে সেই সময়ে দুই জন মাত্র লোক ছিল। হাকিম বলিলেন প্রকৃত কি এইরূপ বলিয়াছে?' বিবাদীর উকীলের স্ফূর্ত্তির সীমা নাই; তিনি বলিলেন "একথা সম্পূর্ণ সত্য। এ বিষয়ে হজুরের নোট লওয়া আবশ্যক, কারণ প্রকৃত দখলকারী নির্দ্ধারণ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়।" হাকিম জবান বন্দী দেখিয়া পেন্‌সিল চিহ্ন দিলেন।

তারপর এই মোকদ্দমা স্থগিত থাকিয়া পেশ আরম্ভ হইল। প্রথমেই আমার মোকদ্দমা ডাক হইল, আমার বুক গুর গুর করিতে লাগিল, আতঙ্কে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম নবীন বাবু সেখানে নাই। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম, চারি দিকে ছুটা ছুটি করিলাম, নবীন বাবুকে দেখিতে পাইলাম না। এদিকে পেয়াদা বার বার উচ্চকণ্ঠে আমার নাম ডাকিতেছে; আমি যে কি করিব, কোন দিকে যাইব বুঝিতে পারিলাম না; নিকট দিয়া যে যাইতে লাগিল বিহ্বল চিত্তে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম 'নবীন বাবুকে দেখেছ'। এমত সময়ে মোহরি আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাকে দেখিয়া আমি যেন প্রকৃতিস্থ হইলাম। মোহরি বলিল 'তোমার মোকদ্দমা ধরা হয়েছে তুমি কি করছ?' আমি যে নবীন বাবুর চেষ্টায় ছুটাছুটি করিতেছি মোহরিকে বলিলাম। মোহরি বলিল 'উকীলখানায় না খুঁজিয়া এখানে সেখানে গেলে কি হ'বে?' এই বলিয়া আমাকে আদালতে যাইতে বলিয়া সে নবীন বাবুকে ডাকিতে গেল, আমি আদালতগৃহে প্রবেশ করিলাম।

প্রবেশ করিলাম বটে কিন্তু অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। হাকিমের ভাব গতিক বড় ভাল বোধ হইলনা। আমার

আসিতে বিলম্ব হওয়ায় হাকিম চটিয়া গিয়াছেন। কলম ধরিয়া ডিশমিশ করিতে বসিয়াছেন।

এমন সময় নবীন বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অবকাশ না পাইলে আমার অত্যন্ত ক্ষতি হইবে জানাইলেন। 'বাদী নিশানদার না দেওয়ায় সমন জারি হইল না' লিখিয়া পেয়াদা রিপোর্ট দিয়াছিল; তাহা দেখিয়া হাকিম বলিলেন, "বাদী নিজে ইচ্ছা করিয়া ত্রুটি করিবে আর সেই ত্রুটির নিমিত্ত তাহাকে আবার সময় দিতে হইবে?' এই বলিয়া উকিল বাবুর কোন কথা না শুনিয়া দরখাস্ত অগ্রাহ্যের হুকুম লিখিতে উদ্যত হইলেন।

কাণ্ড দেখিয়া উকিল বাবু হা'ল ছাড়িয়া দিলেন, জোয়ারের তেজে নৌকা ভাসিয়া চলিল, আমি চারিদিক আঁধার দেখিতে লাগিলাম। পরিশেষে সাহস করিয়া অগ্রসর হইয়া যোড়হস্তে বিনীত ভাবে নিবেদন জানাইলাম। আমি বলিলাম "হজুর পেয়াদা যাইয়া শমন জারি করিলনা, আমার কোন অপরাধ নাই'। আমার কথা হাকিমের কানে পঁহুছিল কিনা বুঝিলাম না; কিন্তু আমার সমীপাগমন তাঁহার সহ্য হইলনা; তিনি গরম হইয়া আমাকে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন। পেয়াদা আসিয়া আমার হাত ধরিল দেখিয়া মানের দায়ে আমি নিজেই সরিয়া আসিলাম। রাম দাস উপহাসের হাসি হাসিতে লাগিল। লজ্জায় আমার মাথা কাটা হইয়া গেল। মনে হইল 'মা বসুন্ধরে বিদীর্ণ হও প্রবেশ করি, এ লাঞ্ছনা আর সহ্য হয় না।'

সত্যের তেজ অপরিমিত। আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে যে সত্য কথা, যে প্রকৃত অত্যাচারের কথা বাহির হইয়াছিল হাকিম অগ্রাহ্য করিলেও বোধ করি তাহা তাঁহার প্রাণে আঘাত করিয়াছিল। কেননা নথি দেখিয়া দেখিয়া হাকিম নবীন বাবুকে বলিলেন 'আচ্ছা পেয়াদা যে ত্রুটি করেছে সে বিষয়ে আপনার মক্কেল আফিডেবিট করতে পারে?' এই বলিয়া আফিডেবিট আনিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সময় দিয়া অপর কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

নবীন বাবু বাহিরে আসিলেন; আমি আর মোহোরি সেই সঙ্গে আসিলাম। সত্য কথা লিখিয়া আফিডেবিট করিব ইহাতে যুক্তি বা বিবেচনায় কোন কথা থাকিতে পারে তাহা আমার জ্ঞানে ছিল না। কিন্তু উকীল বাবুর সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম যে কথা বা ঘটনা প্রকৃত হইলেই হয় না, প্রকৃত বলিয়া প্রমাণ দেওয়া চাই। ঘটনা সত্য বা মিথ্যা যাহাই হউক সাক্ষীর সাহায়তায় তাহা সাব্যস্ত না করিলে চলিবেনা। আফিডেবিট মিথ্যা প্রমাণ হইলে দণ্ড হইতে পারে। তখন আমার চৈতন্য হইল। বুঝিলাম ব্যাপার সহজ নহে। এক মোকদ্দমাতেই যথাসর্ব্বস্ব যাইতে বসিয়াছে তাহার উপর আবার কোন্ সাহসে আর এক মোকর্দ্দমা বাধাইব? লাভ নাই অথচ বিপদের সম্ভাবনা। এই সব ভাবিয়া আফিডেবিট দিতে সাহস হইল না। নবীন বাবু এজলাসে পুনঃ প্রবেশ করিয়া চেয়ারের উপর বসিলেন। আমি বিরস মুখে তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া

রহিলাম।

আমাদিগকে দেখিয়া হাকিম হাস্য-মুখে আফিডেবিটের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নবীন বাবু বলিলেন 'আজ্ঞে, আফিডেবিট করা হইল না; প্রবল শত্রুপক্ষ সাহস করিতে পারা গেল না।'

হাকিম হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, ইহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি। আপনাদের কেন আপশোস থাকিয়া যায় সেই কারণে আমি আফিডেবিট দিতে বলিয়া ছিলাম। আফিডেবিট যে আসিবেনা তাহা বুঝিতে বাকি ছিল না।"

তারপর হাকিম আপনার জন্মাদির ঊর্দ্ধকালের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া বলিলেন "পাকাচুলের কাছে ফাঁকি দেওয়া বড় সহজ নয়! দরখাস্ত দেখিয়াই বুঝিয়াছি বাদীর কথাটা সম্পুর্ণ মিথ্যা।" পাকাচুলের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া এত বিপদেও আমার হাসি আসিল। কিন্তু হাসিতে সাহস হইল না। নবীন বাবুর মুখেও হাসির রেখা দেখা দিল, তিনিও হাসিলেন না বা কোন প্রতিবাদ করিলেন না, কেবল মাত্র ধীরভাবে বলিলেন 'হুজুর, নানাদেশ দেখিয়াছেন কাজেই হুজুরের অভিজ্ঞতা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর; আমাদের সে সুবিধাটুকু নাই।' হাকিম আপন শ্মশ্রুরাজিতে হস্তাবর্ত্তন করিয়া আপনার দেহের প্রতি চাহিয়া লইলেন এবং গম্ভীরভাবে কলম লইয়া আমাকে বলিলেন, রেজিষ্টি তমসুক বলিয়া অ.র একবার তোমাকে অবকাশ দিলাম; কিন্তু সাবধান! বারান্তরে কোন অনুগ্রহ পাইবেনা।" তৎপরে বিবাদী-পক্ষকে ৫৲টাকা মুলতবি খরচ দিয়া এক মাসের সময় পাওয়া গেল, আর তৎক্ষণাৎ সাক্ষীর তলবানা ২॥৹টাকা দাখিল করিতে হইল। উকীল বাবুও মোহরির পূজার ত্রুটি হইলনা; কাজেই নিমেষ মধ্যে ১০।১১ টাকা কোথায় উড়িয়া গেল।

আমি আদালতের বাহিরে আসিয়া নিজের দুইটি কান নিজে মলিলাম। বুঝিলাম মোকদ্দমা করিতে গেলে পরিধেয় বন্ধক দিয়াও অগ্রে বাজে খরচের বন্দোবস্ত করা উচিত। এই অভিজ্ঞতাটুকু ছিলনা বলিয়াই এতটা দুর্দ্দশা ও মনোকষ্ট সহ্য করিতে হইল।

ক্রমশঃ

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া।

(১)

করিয়ে অনেক আশা
এসেছি তোমার কূলে,
যমুনা সুন্দরি!
জানি কোথা চলিয়াছ
ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার দিনে,
নব বেশ ধরি!
পুত নীরে করি স্নান,
আছে বসি যমরাজ,
তব প্রতীক্ষায়;

শুভক্ষণে দিবে ফোঁটা,
স্নেহময় ললাটে তুমি,
শুভ কামনায়!
ভ্রাতার ভগিনী যেই,
ভগিনীর যেই ভ্রাতা,
তাহাদের তরে!
এমন সুখের দিন,
এমন সাধের দিন,
নাহি ধরা পরে!
ভগিনীর এক প্রাণে,
কামনা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী—
ভ্রাতার মঙ্গল!
ভ্রাতার একটি প্রাণে,
সহস্র প্রাণের তৃপ্তি,—
কি দৃশ্য বিমল!
ভ্রাতার ভগিনী আমি,
আমিও দিব যে ফোঁটা,
আমার ভ্রাতায়;
চন্দনের বাটী ল'য়ে,
ফিরিলাম ঘরে ঘরে,
খুঁজিয়া তাহায়;
আমার এ ভাঙ্গা প্রাণে,
তন্দ্রায় আছিল স্মৃতি,
সহসা জাগিল!
দারুণ নিষ্ঠুর স্মৃতি,
হাসিয়ে বিকট হাসি,
আমারে কহিল—
"যমুনার ভাই যম,
হরিয়ে ভ্রাতায় তোর,
রেখেছে বাঁধিয়ে:
যমের ললাটে ফোঁটা,
দিতে, সে যমুনা আজি
যেতেছে সাজিয়ে!"

শুনেছি তুমি গো নদি,
দয়ার যে প্রতিকৃতি;
তবে, দয়াবতি!
কহ মোরে দয়া ক'রে;
আমারে লবে কি তুমি,
তোমার সংহতি?
করিয়ে অনেক আশা,
এসেছি, যমুনে আজি,
তোমার সদনে;—
ল'য়ে এ চন্দন বাটী,
ধরিয়ে অঞ্চল তব,
যাব তোমা সনে!
বহুদিন অদর্শনে,
ব্যথিত সে ভ্রাতা মম,
আমারে দেখিয়া,—
ছিঁড়িয়ে বন্ধন রজ্জু,
আনন্দে অধীর হ'য়ে,
আসিবে ছুটিয়া;
"দিদি" ব'লে কোলে এসে,
জড়ায়ে ধরিবে গলা,
বুকে রাখি মুখ,
অমর আলয়ে আমি,
পাইব অমৃত ভাণ্ড;
ভুলে যাব দুখ!
আদরে চিবুক ধরি,
উঠায়ে বদন খানি,
করিব চুম্বন!
কল্যাণ কামনা করি,
দিব এক ফোঁটা তার,
ললাটে চন্দন!
ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার দিনে,
ভগিনীর কামনা সে—
ভ্রাতার মঙ্গল!

সে কামনা সিদ্ধপথে
কাঁটা দিতে কেবা পারে ?
কে হেন প্রবল ?
যমেরে দিয়াছ ফোঁটা,
করেছ অমর তারে,
তুমি কি জাননা—
ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার দিনে,
অসিদ্ধ না হয় কভু,
ভগ্নীর কামনা ?
হইবে কামনা মম—
ভ্রাতার যে অমরতা,
এ কামনা করি,
আদরে ললাটে তার,
দিব চন্দনের ফোঁটা,—
চিবুকটি ধরি !
প্রাণভরা কামনায়,
আদরের ভ্রাতা মম
লভিবে জীবন !
যমলোকে জড় দেহ
ধরিবে, অপূর্ব্ব দৃশ্য
জুড়াবে নয়ন !
বসিয়ে স্বরগ ধামে,
হাসিয়ে মর্ত্ত্যের হাসি,
অমনি ভ্রাতায়
কোলে ল'য়ে ছুটে এসে,
জননীর শূন্য ক্রোড়ে,
বসাব তাহায় !
গেল দিন গেল মাস,
গেল কত বর্ষ চলি,
মায়ের বদনে
দেখিনি হাসির রেখা;
দেখেছি কেবল অশ্রু
যুগল নয়নে ;
হারান রতনে পুনঃ
বুকে ধরি, মা আমার
হাসিবেন সুখে !
প্রাণ ভ'রে চেয়ে রব
সুখ শান্তিময় সেই
জননীর মুখে !
করিয়ে অনেক আশা
এসেছি তোমার কূলে,
যমুনা সুন্দরি !
ল'য়ে চল সঙ্গে মোরে
এ ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া দিনে,
এ মিনতি করি !

(২)

এত বলি বিষাদিনী
যমুনার স্বচ্ছজলে
পড়িল ঝাঁপিয়ে !
ভ্রাতৃস্নেহ উচ্ছ্বাসেতে—
যমুনার স্নিগ্ধবারি
উঠিল ছিটিয়ে !
যমুনার খর স্রোতে,
বিষাদিনী, ডুবে ভেসে
লাগিল চলিতে !
এখন (ও) যমুনা কূলে,
ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার দিনে,
পাইবে শুনিতে—
"ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার দিনে
ভগিনীর কামনা যে
ভ্রাতার মঙ্গল !
সে কামনা সিদ্ধিপথে
কাঁটা দিতে কেবা পারে ?
কে হেন প্রবল ?

শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

আমাদের শ্রাদ্ধ তর্পণের প্রথা ইদানীং ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। এখন আর আমরা এই শ্রাদ্ধ তর্পণকে আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্যই করিনা, এমন কি ইহার মধ্যে যে একটী মধুরতা ও একটী সৌন্দর্য্য আছে,ইহার যে কোন আবশ্যকতা ও উপযোগিতা আছে তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। যে দেশে প্রতিদিন পিতামাতা প্রভৃতিকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ পূর্ব্বক উদকাঞ্জলি অর্পণ করা পুরুষ পরম্পরায় লোকের নিত্য কর্ম্ম ছিল, স্নানাহ্নিকের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃকুল মাতৃকুল এমন কি পরলোকগত "বান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্য জন্মনি বান্ধব" গণের আত্মার উদ্দেশে নিত্য কর্ত্তব্য বোধে জলাঞ্জলি প্রদান না করিয়া কেহ জলগ্রহণ করিতেন না সেই দেশে এই স্বল্প কালের মধ্যে লোকের গতি মতি যে তদ্বিপরীত দিকে ধাবিত হইয়াছে ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই পরিবর্ত্তন কেন হইল ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা সহজেই এই কয়েকটী কারণ দেখিতে পাই :—

(১) আর্য্যদিগের অনুষ্ঠানাদির মূলতত্ত্বের অনভিজ্ঞতা।

(২) অনুকরণপ্রিয়তা, অর্থাৎ যাহাদিগকে আমরা অনুকরণ করিতে ভাল বাসি তাহাদের মধ্যে শ্রাদ্ধাদির প্রচলন বা আদর না থাকায়, আমরাও এই অনুষ্ঠানের অনাদর করি।

(৪) পাশ্চাত্য শিক্ষা জ্ঞানপ্রধান। কেবল জ্ঞানের বৃদ্ধিতে ভাবের হ্রাস হয়। সুতরাং আমাদের স্বাভাবিক ভাবুকতা জ্ঞানপ্রধান শিক্ষার প্রভাবে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

ইয়ুরোপে কখন শ্রাদ্ধ তর্পণাদির ন্যায় কোনও অনুষ্ঠান একবারেই ছিলনা এমন নহে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জাতির মধ্যে দেবগণ পিতৃগণ ও মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে তর্পণের ব্যবস্থা ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। অদ্যাপি ইউরোপের দক্ষিণ দেশীয় খ্রীষ্টীয় সমাজে All saint's day, All soul's day প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দিনে পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনায় উপাসনার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। জ্ঞানপ্রধান শিক্ষার বৃদ্ধি ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভাবপ্রবণতাও হ্রাস পাইতেছে এবং ভাবব্যঞ্জক ও ভাবের স্ফূর্ত্তিকারী অনুষ্ঠান গুলিও ক্রমশঃ কুসংস্কার মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে।

ইদানীং সভ্য প্রদেশে শ্রাদ্ধ তর্পণের প্রচলন না থাকিলেও তৎ সদৃশ ভাবাত্মক অনুষ্ঠান বিভিন্ন আকারে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। আজি কাল ইউরোপে কোন কোন মৃত মহাত্মার স্মরণের জন্য, তাঁহার প্রতি জাতীয় কৃতজ্ঞতার ভাব বজায় রাখিবার জন্য তাঁহার গুণ গ্রামের আদর করিতে শিখিবার জন্য, তাঁহার মৃত্যুর সাম্বৎসরিক দিনে লোকে দেশ প্রচলিত প্রথানুসারে সভা, বক্তৃতা প্রভৃতি করিয়া

পরিতৃপ্ত করে এবং শ্রদ্ধা ,কৃতজ্ঞতা, প্রভৃতি ভাবের দ্বারা হৃদয়কে অলঙ্কৃত করিতে শিখে। সুখের বিষয় এই যে আমরাও সেই দেখাদেখি এইরূপ সদনুষ্ঠানের সৌন্দর্য্য ও উপকারিতা এক আধ টুকু বুঝিতেছি; তাই দেশীয় প্রথার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেও পাশ্চাত্য প্রণালীর অনুকরণ করিয়া আমরাও আমাদের দেশীয় পরলোকগত মহাত্মা রাম মোহন রায় প্রভৃতির মৃত্যুর সাম্বৎসরিক দিনে সভা বক্তৃতাদি করিয়া তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁহাদের সদ্গুণের আদর করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, যেমন জাতীয় ভাবে এইরূপ একটী কর্ত্তব্যের দিকে আমাদের চেষ্টা হইতেছে, তেমন ইহা হইতে শত সহস্র গুণ গুরুতর আমাদিগের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের প্রতি সেইরূপ আমাদের দৃষ্টি পতিত হইতেছে না। দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দু দিয়াও যে জনক জননীর ঋণ শোধ হয় না, সন্তানের জন্য যাঁহাদের এক দিনের ক্লেশ ও উদ্বেগ স্মরণ করিলেও রোমাঞ্চিত হইতে হয়, যাঁহাদের যত্ন, ত্যাগস্বীকার, অনুপম স্নেহ ভাবিয়াও সম্যক উপলব্ধি করা যায় না; আমাদের দেহ মন, জ্ঞান, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, আয়ু, সকল বিষয়ের জন্যই যাঁহাদের চরণে আমরা চিরঋণী; শ্রদ্ধা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতার শ্রেষ্ঠতম আস্পদ, প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ সেই পরলোকগত জনক জননীর বিষয় আমরা কয় বার ভাবি? অন্য সময়ের কথা দূরে থাকুক, এখন আমরা কি তাঁহাদের মৃত্যুর সাংবৎসরিক দিন উপলক্ষে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতার ভাব হৃদয়ে জাগরিত করি, বা বাহ্যিক অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা ব্যক্ত করি? যেখানে ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যজ্ঞানের এতাদৃশ অসদ্ভাব সেখানে জাতীয় কর্ত্তব্য জ্ঞান বৃদ্ধির আশা করাই ভ্রম।

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—বাহ্যিক আড়ম্বরের আবশ্যকতা কি? অন্তরেই ভক্তি, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা পোষণ করিলেই যথেষ্ট। এ প্রশ্নের উত্তর না দিলেও চলিতে পারে। কে না জানে, কে না বুঝে, যে বাহ্যিক অনুষ্ঠান দ্বারা আন্তরিক ভাব বদ্ধমুল ও স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তদ্ভিন্ন ইহার অন্য প্রকৃষ্ট উপায় নাই। শ্রাদ্ধ তর্পণাদির অনুষ্ঠান প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। কিরূপে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি মানব হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি গুলি বিকাশ প্রাপ্ত হয়; যে কৃতজ্ঞতা না থাকিলে মানুষ পশু অপেক্ষাও অধম হইত, সেই কৃতজ্ঞতা কিরূপে হৃদয়ে যে বদ্ধমুল হয়; কিরূপে বিশ্বজনীন প্রেম ও সহানুভূতির বিকাশ দ্বারা হৃদয়ের উদারতা বৃদ্ধি করিতে হয়; কিরূপে সদ্গুণের আদর করিতে হয়, কিরূপে দেশের মহাত্মাগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে হয়, হিন্দুরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন; তাই পিতা মাতা, পূর্ব্ব পুরুষ, আত্মীয় স্বজন, বান্ধবের উদ্দেশে তর্পণাদির ব্যবস্থা; তাই আপনার আত্মীয় স্বজনেই প্রেম আবদ্ধ না রাখিয়া, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎ, দেবতা ও পিতৃগণ হইতে আরম্ভ করিয়া চরাচর স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত বিশ্ব সংসারের যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর প্রতি

উদকাঞ্জলির ব্যবস্থা; তাই দেশের গৌরব স্বরূপ, মানবের আদর্শস্থানীয়, সত্যব্রত, জিতেন্দ্রিয়, ন্যায়পরায়ণ, মহাবীর, ধার্ম্মিক-প্রবর, অপুত্রক ভীষ্মদেবকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করিয়া, প্রত্যেক হিন্দুসন্তান তাঁহার সন্তানস্থানীয় হইয়া, তাঁহাকে তর্পণকালে উদকাঞ্জলি অর্পণ করিতেন। আমরা সে সব ভুলিয়া গিয়া এখন কেবল পুস্তক মুখস্থ করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা শিখিতে চাই ও শিখাইবার ব্যবস্থা দিই; বক্তৃতা দ্বারা হৃদয়ের ভাব প্রস্ফুটিত করিবার প্রয়াস পাই। হাওয়ার কথা হাওয়ায় মিশাইয়া যায়, ভাব আর হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না; অনুষ্ঠান ভিন্ন হইবে না, হইবার কথাও নহে।

শ্রাদ্ধ তর্পণাদি অনুষ্ঠানের প্রতি আমাদের আস্থার খর্ব্বতা মৃতের প্রতি ভক্তির খর্ব্বতার পরিচায়ক। মৃতের প্রতি প্রেমের খর্ব্বতা জীবিতের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেমের লাঘবের পরিচায়ক। কে না বুঝিতে পারিতেছে যে আজ কাল আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তির ভাব ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে, কিন্তু কেন যে কমিতেছে, কোথায় যে তাহার মূল কারণ, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি যাইতেছে না। কেবল বালক দিগকে নীতি শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনাইলে হইবে কি? এদিকে কাহাকেও শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতে দেখিলে তাহাকে আমরা কুসংস্কারাবিষ্ট জ্ঞানালোকবর্জ্জিত মূর্খ বলিয়া বালক দিগের সমক্ষে উপহাস করি; আবার পরক্ষণেই তাহাদিগকে উপদেশ দিই "পিতামাতা গুরুজনকে ভক্তি করিবে"। এ উপদেশের দিকে দৃষ্টি করিনা, এবং অপরের দেখাদেখি হিন্দুসন্তানকে "পিতৃপূজক," "প্রেতপূজক" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকি। ফলতঃ একালের জ্ঞানালোক আমাদের চক্ষের পক্ষে অত্যন্ত তীব্র হইয়াছে; এই আলোকের আধিক্যে আমরা অন্ধ হইয়া পড়িতেছি। পরের রত্ন গ্রহণ কর, সুখের কথা; কিন্তু ঘরের রত্ন নষ্ট করা বুদ্ধির কায নহে।

বাস্তবিক হিন্দুর শ্রাদ্ধ তর্পণাদির উদ্দেশ্য অতি মহৎ ও উদার। ইহা যে মানুষ-পূজা বা প্রেতপূজা নহে, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। ভট্ট মোক্ষমূলর খৃষ্টীয়ান হইয়াও হিন্দুর শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, এবং এই সুন্দর প্রথা খৃষ্টীয় দেশে প্রচলিত নাই বলিয়া পরিতাপ করিয়াছেন। তিনি বলেন "মৃত ব্যক্তি দিগের উদ্দেশে এই সকল অনুষ্ঠান না করা ও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে স্মরণ ও তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করা ইদানীন্তন খৃষ্টীয় ধর্ম্মের একটি প্রকৃত অভাব। যদিও সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে ভ্রমাত্মক মত ও সংস্কার প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তথাপি তাহার মধ্যে যে প্রগাঢ় পিতৃভক্তি ও ধর্ম্মভাব প্রবাহিত হইতেছে, তাহার অবরোধ করা বিধেয় নহে।.........
.... আমাদের কর্ত্তব্য এই যে তাঁহাদের স্মরণার্থ সময়ে সময়ে সৎকার্য্য ও দানাদি করিয়া হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করি। (Maxmuller on What India Can Teach Us)

করিয়া আপাততঃ শ্রাদ্ধ কি, শ্রাদ্ধ কয় প্রকার, শ্রাদ্ধ কখন করিতে হয়, এই প্রস্তাবে তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

আশ্বলায়ন কৃত গৃহ্যসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে গৃহী ব্যক্তি অহরহঃ পঞ্চযজ্ঞ করিবেন। সেই পঞ্চযজ্ঞ এইঃ—দেবযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, ও মনুষ্যযজ্ঞ (আশ্বলায়ন ৩।১)। অগ্নিতে আহুতি দিয়া দেবগণের উদ্দেশে যে যজ্ঞ করা যায় তাহার নাম দেবযজ্ঞ; জীবজন্তুকে অন্নাদি দানের নাম ভূতযজ্ঞ; পিতৃগণকে পিণ্ডোদক দানের নাম পিতৃযজ্ঞ; বেদাধ্যয়নের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, ও অতিথি-সেবার নাম মনুষ্যযজ্ঞ। মনুসংহিতায় এই পঞ্চ যজ্ঞের কথা উক্ত হইয়াছে।

এই পঞ্চযজ্ঞ সম্পাদন না করিয়া হিন্দুগণ জল গ্রহণ করিতেন না; ইহা গৃহী ব্যক্তির প্রাত্যহিক কর্ম্ম। অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে সর্ব্বাগ্রে অগ্নি, সোম, ধন্বন্তরী, কুহূ (অমাবস্যা), অনুমতি (পূর্ণিমা), প্রজাপতি, দ্যাবাপৃথিবী ও স্বিষ্টকৃৎ, এই বিশ্বেদেবগণের উদ্দেশে সেই অন্নাদির কিয়দংশ দান করিয়া, ভূচর খেচর জন্তুগণকে কিছু কিছু দিয়া তৎপরে পিতৃগণকে স্মরণ করা হইত; তৎপরে অতিথি অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে ভোজন করাইয়া গৃহী ব্যক্তি আহার করিতেন।

পিতৃযজ্ঞের পদ্ধতি এই যে প্রাচীনাবীতী হইয়া (অর্থাৎ বাম স্কন্ধ হইতে দক্ষিণ স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া) "স্বধা পিতৃভ্যঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে পিণ্ড ও জল নিক্ষেপ করিবেক। (আশ্বলায়ণ ২।১১)

মনুসংহিতার মতে শ্রাদ্ধ এই পিতৃযজ্ঞের অন্যতর নাম। কিন্তু আশ্বলায়ণকৃত গৃহ্য সূত্রের টীকাকার গার্গ্যনারায়ণ বলেন যে "পিতৄনুদ্দিশ্য যদ্দীয়তে ব্রাহ্মণেভ্যঃ শ্রদ্ধয়া তচ্ছ্রাদ্ধং" পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে যাহা দান করা যায়, তাহার নাম শ্রাদ্ধ। আরও পুলস্ত্যসংহিতায় আছে—

"সংস্কৃতং ব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতং।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে॥"

সুসংস্কৃত ব্যঞ্জনাঢ্য দধি দুগ্ধ ঘৃত সংযুক্ত অন্ন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রদত্ত হওয়াতে এই কর্ম্মকে শ্রাদ্ধ বলে। অতএব পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অন্নাদি দানের নাম শ্রাদ্ধ; পিণ্ডোদকদান পিতৃযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ নহে। পিতৃগণের উদ্দেশে জলপিণ্ড দানরূপ কর্ম্মকে যে সাধারণে শ্রাদ্ধ বলিয়া থাকে, তাহা ভ্রম। পিতৃগণকে জল পিণ্ড দান শ্রাদ্ধের অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু প্রধান কার্য্য পিত্রুদ্দেশে দান। কাহারও মৃত্যু হইলে হিন্দুগণ অশৌচান্তে ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর অন্নাদি দান করিতেন। গৃহে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি কোন মঙ্গল কার্য্য হইলেও সর্ব্বাগ্রে পরলোকগত পিতৃগণকে কৃতজ্ঞ চিত্তে ভক্তিভাবে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে ও শুভ কর্ম্মোপলক্ষে ব্রাহ্মণগণকে এই রূপে দান করা হইত। কালক্রমে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদানাদি আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে অন্নাদি দান পর্য্যন্ত সমুদয় কার্য্য

শ্রাদ্ধ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই জন্যই বোধ হয় আপস্তম্ব বলিয়াছেন "অথৈতন্মনুঃ শ্রাদ্ধশব্দং কর্ম্ম প্রোবাচ" মনু সমুদয় কর্ম্মকে শ্রাদ্ধ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

এ দানের কারণ কি? মৃত্যুর সমক্ষে সংসারের অনিত্যতা ও অকিঞ্চিৎকারিতা যেমন স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, তেমন আর কখনও হয়না। তখন যে ভাবের উদয় হয় লোকে তাহাকে শ্মশান-বৈরাগ্য কহে। যিনি পরলোকগত হইলেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কিছুই গেলনা, সমস্তই পড়িয়া রহিল; তখন সহজে মানব পার্থিব পদার্থে; বীতস্পৃহ হইয়া পড়ে। তখন মনে হয়, এই সমুদায় পদার্থের যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়া লই; সৎপাত্রে দান করিয়া অর্থের সার্থকতা করি। অতি প্রাচীন কালে বোধ হয় এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রাদ্ধ কর্ত্তা অকাতরে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে তাঁহার কিয়দংশ সম্পত্তির উপযুক্ত পাত্রে দান করিতেন।

—০(*)০—

কবি রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রেমরা খেলা লক্ষ্য করিয়া রমাপতি বিভাস রাগিণীতে গাহিয়াছেন;—

প্রেমরা আমরা তোমার প্রেমে মরা
তরিব বাল্মিকী প্রায় জপিয়া প্রেমরা মরা।
নির্জ্জনেতে চারিজনে, যখন বসি একাসনে,
তখন দেখি মনে মনে পৃথিবীরে সরা।
তেরস্তা কোরস্তা দানে, লোভ বড় বাড়ে মনে,
দুই হাতে এক দান যদি পড়ে ধরা।

ইত্যাদি।

রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, মেটকাফ হল প্রভৃতি নানা বিষয়ে রমাপতির রচিত সুন্দর সুন্দর গান রহিয়াছে। সাময়িক ঘটনা লইয়াও তিনি কয়েকটী গান রচনা করিয়াছেন। যে সময়ে মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ প্রচলনের নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন এবং ৺রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার সেই সাধু চেষ্টায় বাধা দিতেছিলেন, সেই সময়ে রমাপতি বিভাস আড়া-ঠেকা ঘটায় রচনা করিয়াছেন;—

যে তরঙ্গ উঠছে বিদ্যেসাগরে,
কত রঙ্গ হ'বে নগরে।
* * * *
শুনিতেছি নিরবধি, মন্থন বারিধি,
সে দেবাসুরের বিধি;
এতে দেব বিরোধী নিরবধি,
কেবল যা করিবেন ঈশ্বরে।
ঈশ্বর যাতে অনুকূল, দেব তাতেই প্রতিকূল,
এ বিবাদের এই মূল;
কোরে গুণ বিধান, দিতেছে টান,
বিধি মন্থর পরাশরে।

ইত্যাদি।

প্রাচীন কবিগণের ন্যায় রমাপতি অনুপ্রাস ব্যবহার করিতে ভাল বাসিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে একটী গান দেওয়া হইল;—

বাগেশ্রী—তাল আড়া।

এখন বাসনা করি, এখানে বাস না করি,
সমাধি হইগে শিবে।
আমার অশিবে, বিনা শিবে কেবা বিনাশিবে।
যথা উপাসনাশয় , তথা উপাসনা সয়
করিয়াছি পূর্ণাশয়, লব অন্নপূর্ণাশ্রয়।
কেন থাকি নিরাহার, করি গঙ্গানীরাহার
কাল দণ্ড দুর্নিবার, অনিবার নিবারিব ।
ত্যজি সংসার সং-সার, করিব সৎসঙ্গ সার,
বিপদে শ্রীপদ সার, অন্য সকলি অসার;
শিব বাক্যে মন দেহ, এতে ক'রনা সন্দেহ,
রমার এ পাপ দেহ, শেষে গঙ্গাতে ভাসিবে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে মহাত্মা রমাপতির পিতা ৺গঙ্গাবিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পিতামহ ৺রাম সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে সঙ্গীতবিশারদ কবি ছিলেন। প্রাচীন গায়ক দিগের মুখে তাঁহাদের রচিত ভক্তিপূর্ণ গান এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। রমাপতি পিতা ও পিতামহের গুণ গরিমায় আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। তিনি আপনাকে 'গঙ্গাসুত' 'সুন্দর সুতের সুত' বলিয়া অনেক গানেই পরিচয় দিয়াছেন।

কান্তির ১৭৪ পৃষ্ঠায় ভ্রমবশত রমাপতিরচিত বলিয়া কালেংড়া রাগিণীর যে গানটী লিখিত হইয়াছে, তাহা তদীয় পিতামহ মহাশয়ের রচিত। এক্ষণে নিম্নে তাঁহার পিতার কৃত একটি গান প্রদত্ত হইল ;—

কালেংড়া — জলদ তেতালা।

এই যে যাব সে যাব আসিব সে কথার কথা
চিন্তা কর চিন্তা কথা
ক্ষতিনাই ক'ও তারা তারা, রসনারে ক'রেত্বরা
এ কেবল কর্ম্মধরা জিজ্ঞাস যথা তথা।
সুন্দরসুতে এই কয়, ভাবিলে ভাবনাময়
দূর কর মনব্যথা।

রমাপতি শেষ জীবনে অর্থাভাবে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবি-জীবন সঙ্গীতচর্চ্চায় অতিপাত করিতেই ভাল বাসিত। অর্থাগমের কোন চেষ্টায় মনোনিবেশ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না। অথচ স্বীয় স্বাভাবিক দান-শীলতারও নিবৃত্তি ছিলনা। সুতরাং কাল-ক্রমে অর্থাভাব হইয়া ঋণজালে জড়িত হইবেন ইহা বিচিত্র নহে। 'মূল সঙ্গীতাদর্শ' পুস্তক, সম্ভবতঃ এই ঋণদায় হইতে মুক্তির নিমিত্তই মুদ্রিত হইয়াছিল। 'সঙ্কেত পত্রিকা'-শীর্ষক কবিতায় তিনি স্পষ্টই বিজ্ঞ মহোদয়গণের সমীপে অর্থানুকূল্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

রমাপতি ভীমপলাসী মধ্যমান ঠেকায় গাইয়াছেন,—

আহার বিহনে শীর্ণ হ'ল পরিবার
বিশেষতঃ বসন নাহিক পরিবার।
বাসের কষ্টেতে ব'সে রজনী পোহাই,
নিদ্রাবশে অলসে সঘনে উঠে হাই।
ইত্যাদি

বলা বাহুল্য এই ভীষণ দারিদ্র্যের ছায়াও রমাপতিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার কেবল মাত্র অর্থের সচ্ছলতার অভাব হইয়াছিল ।

'মূল সঙ্গীতাদর্শ' প্রকাশিত হইবার দশ বৎসর পরে ১২৭৯ সালের ২১শে ভাদ্র

গতা হইয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রাণবায়ু অনন্তের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে, জড়দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে; কিন্তু স্মৃতি এখনও জাগরিত রহিয়াছে; এখনও বিপন্ন প্রতিবেশী তাঁহাদের উদ্দেশে অশ্রুপাত করিতেছে। যতদিন সঙ্গীতের আদর থাকিবে, সুললিত গীতের মোহিনী শক্তি মানবকে বিমুগ্ধ করিতে পারিবে, ততদিন করুণারমাপতি মানব-হৃদয়ে বিরাজিত থাকিবেন। চিরদিন প্রেমিক প্রেমিকা দম্পতির প্রেমগাথা গান করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইবে; ভক্তদল ভক্তিপূর্ণ গীতের আলোচনায় ভক্তি শিক্ষা করিবে।

—o(*)o—

বালেশ্বর-রাজবংশ।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

পূর্ব্বোক্ত রূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে, মায়াপুরস্থ তাম্লি মহালে হাহাকার পড়িয়া গেল। এই সম্প্রদায়স্থ সমস্ত লোক একত্রিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যাক্ প্রাণ, থাক্ মান"। হিন্দু অম্লান বদনে সকল কষ্টই সহ্য করিতে পারে, ধর্ম্মার্থে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না; কিন্তু হিন্দু-জীবনের সার-সর্ব্বস্ব, জীবন-তোষিনী কন্যা, ভগ্নী, অথবা সহধর্ম্মিনীর পবিত্র সতীত্ব-রত্ন বিক্রয় করিতে কে সম্মত হইতে পারে? শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকিতে হিন্দুজাতি কি এরূপ জঘন্য প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে পারে? ভগবান দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, সেই ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া, মায়াপুরস্থিত তাম্লিগণ শপথ করিলেন—এই জাতির একটি বালকের জীবন থাকা সত্বে কিছুতেই এই অসাধু প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে না। বাসস্থান, সুখ সম্পত্তি, এমন কি জীবন পরিত্যাগ করিব, কিন্তু জীবনের সারভূত পতিব্রতা সাধ্বী সতীর সতীত্ব-রত্ন বিক্রয় করিব না। হিন্দুর গৃহলক্ষ্মী দুরাচার যবনের অঙ্কশায়িনী হইবে? একথা স্মরণ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। এক্ষণে কি উপায়ে সাধ্বীর সতীত্ব-রত্ন রক্ষা হইবে ইহাই চিন্তার বিষয়। আবার বালক, বৃদ্ধ, যুবা একত্রিত হইয়া মন্ত্রণা স্থিরতর হইল—"প্রাণ যায় ক্ষতি নাই, কিন্তু মান রক্ষা করিতে হইবে।"

বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালী যেমন দুর্ব্বল, ভীরু, অকর্ম্মণ্য ও আত্মরক্ষায় অক্ষম অপদার্থ জীব, শতবর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গসমাজ এরূপ অপবাদে কলঙ্কিত হয় নাই। তৎকালে বাঙ্গালীর দেহে বল, মনে বল, ও আত্মাভিমান জ্ঞান ছিল। তখন বঙ্গদেশে বলবান লোকের অভাব ছিল না। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম রায়ের বীরত্ব-কাহিনী কে না শ্রবণ করিয়াছে? এক সময়ে রাজা প্রতাপাদিত্য শুদ্ধ বাঙ্গালী সৈন্য সহায়ে দেশ শাসন ও স্বাধীনতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এখন বাঙ্গালীর সে শক্তি, সামর্থ্য কোথায়?

কয়েক দিন পরে পাপিষ্ঠ শাসন কর্ত্তার পিশাচ সহচরগণ মায়াপুরে উপস্থিত হইল; আবার সেই লাবণ্যময়ী ললনার আত্মীয় স্বজনগণকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। তৎকালে সেই আত্মীয়গণ দূতকে বলিল :— "তোমরা নবাবকে বলিবে আমরা যদি মেয়েকে তাঁহার নিকটে পাঠাই তাহা হইলে লোকে জানিতে পারিবে; আমাদের অপমান ও অসম্মানের—একশেষ হইবে; যদি তিনি গোপনে আমাদিগের বাড়িতে উপস্থিত হন, আমাদের আর কোন আপত্তি নাই।"

মায়াপুরস্থ তাম্লিগণ ইতিপূর্ব্বেই বাসস্থান পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কাহার আশ্রয়ে নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন করিবেন? এই চিন্তায় তাঁহারা বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরাজ দিগের অনেক উপনিবেশ বাঙ্গালার অনেক স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছিল। ইংরাজ যে ন্যায়বান ও তেজীয়ান এরূপ সুখ্যাতিও প্রচার হইয়াছিল। সেই সময়ে ঘাটালের সন্নিকিত বরদা নামক স্থানে ইংরাজের কুঠি ছিল। ঘাটাল, তমলোক, ও বালেশ্বরে ইংরাজের বড় বড় কুঠি ও বিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায় ছিল। মায়াপুরস্থ তাম্লিগণ সকলে সম্মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, আর এখানে থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে। চল আমরা সকলে বরদায় চলিয়া যাই, সেখানে টুপীওয়ালা দিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। আমরা সেই স্থানে অবস্থিতি করিলে, মুসলমান দিগের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইব। স্ত্রীলোক দিগের মান সম্ভ্রম, বালক বালিকাদিগের জীবন রক্ষা হইবে। চল আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই; একটী লোকও এই স্থানে থাকিতে পারিবে না; যিনি এখানে থাকিবেন, তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। সেই প্রতিজ্ঞা অদ্যাপি রক্ষিত হইতেছে। তাম্লি মাত্রেই একাল পর্য্যন্ত মায়াপুরে জল-গ্রহণ করে না।

এই সময়ে ইংরাজ বণিকগণের খ্যাতি প্রতিপত্তি দেশ মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইহাঁরা যে ন্যায় পথে থাকিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় করেন, দুর্ব্বল লোককে প্রবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, এইরূপ সুযশঃ সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। এইরূপ সুনামই ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্য লাভের মূল ভিত্তি স্বরূপ।

মায়াপুরস্থিত তাম্লিগণ আপনাদিগের ধন সম্পত্তি, স্ত্রীলোক, বালক বালিকা, অক্ষম বৃদ্ধ দিগকে অবিলম্বে বরদায় প্রেরণ করিলেন। কেবল পাষণ্ড শাসনকর্ত্তার পাশবিক অত্যাচারের প্রতিফল প্রদান জন্য কয়েকজন বলবান যুবক আর দুই একটী কিশোরবয়স্ক সুন্দর বালক মায়াপুরে থাকিল। উহারা সেই পামরের আগমন লক্ষ্য করিয়া, অস্থির চিত্তে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। যথাসময়ে সেই কামুক লম্পট আপনার পাপলালসা পরিতৃপ্তি জন্য মায়াপুরে উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বেই সেই সুন্দর বালকদ্বয়কে স্ত্রীমূর্ত্তিতে সজ্জিত করা হইয়াছিল। একজন

সেই সুন্দরী, অপর উহার সহচরী স্বরূপ সুন্দর বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইল। কিন্তু উহাদিগের উভয়ের মস্তকবস্ত্রমধ্যে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা লুক্কায়িত ভাবে থাকিল। শাসন কর্ত্তা উপস্থিত মাত্রেই উহাকে একটী ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য বলা হইল। সেই নির্দ্দেশ মতে পাপিষ্ট যবন গৃহপ্রবেশ মাত্রেই বাহির হইতে শিকল বন্দ করিয়া দেওয়া হইল। অন্যদিকে স্ত্রী মূর্ত্তিসজ্জিত বালকদ্বয় উহাকে সম্বর্দ্ধনা-পূর্ব্বক উপবেশন জন্য অনুরোধ করিল। উহাদিগের কপট অভ্যর্থনায় মোহিত হইয়া, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পাষণ্ড উপবিষ্ট হইবা মাত্র, অমনি তীক্ষ্ণধার ছুরিকাদ্বারা উভয়ে সেই দুরাচারকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা যবনের রক্ত পান করিয়া হস্তচ্যুত হইয়া পড়িল। পাষণ্ডেরপাপা-চরণের প্রতিফল পূর্ণ মাত্রায় ফলিল।

এই ঘটনার পরেই তাম্লিগণ মায়াপুরের মায়া কাটাইয়া চিরদিনের জন্য সেই স্থানের বাসস্থান পরিত্যাগ করিলেন। তাম্লিগণ বরদায় কিছুকাল সভয় চিত্তে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তৎপর উহারা সমবেত হইয়া বিবেচনা করিলেন — এখানে থাকিলে সমস্ত লোকের বাণিজ্য ব্যবসায়ের সুবিধা হইবে না। সুতরাং এই স্থানে কতক লোকের পরিত্যাগ করা উচিত। এই রূপে স্থির সিদ্ধান্ত হওয়াতে কতক লোক কলি-কাতার, কোন কোন পরিবার তমলোক্ বালেশ্বর ও মেদিনীপুর জেলায় রাজনগর ও পয়েশপুর প্রভৃতি স্থানে আপন আপন বাসস্থান মনোনীত করিলেন। যে সকল পরিবার বরদায় অবস্থিতি করিলেন, তাঁহারা তথায় বিশালাক্ষী নাম্নী এক ভগবতীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজা শ্যামানন্দের প্রপিতামহ বরদায় অবস্থিতিকালে ঘৃত, চাউল, ডাইল, কাপড় ও কড়ির ব্যবসা করিতেন। ইনিই বরদা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পুত্র মাণিকরাম ও অন্যান্য পরিবারবর্গ ও আপনার কুলপুরোহিত ব্রাহ্মণপরিবার সহ বালেশ্বর আগমন করেন। আপনার বাসস্থান পরিত্যাগ সহ কুলপুরোহিতপরিবারের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া সঙ্গে আনয়ন করা সহজ নহে। দৈব দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া চিরদিনের বাসস্থান পরিত্যাগ করা মহাবিপদের কারণ, এ বিষয় হিন্দু মাত্রেই বুঝিতে পারেন। এইরূপ দুঃসময়ে লোকে অপর কার্য্যে একটী পয়সা ব্যয় করিতে সম্মত হয় না। কিন্তু এবম্বিধ দুরবস্থায় পতিত হইয়াও যিনি গুরু পুরোহিতের ভার গ্রহণ করিতে কষ্ট বোধ করেন না, স্বীকার করিতে হইবে, অবশ্যই তিনি ধর্ম্ম ভাবে অনু-প্রাণিত বলিয়াই এরূপ সদনুষ্ঠানে কষ্ট বোধ করেন নাই। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ধর্ম্মার্থে সর্ব্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন।

যে সময়ে জয়কৃষ্ণরাম দে — বালেশ্বরে আগমন করেন, তৎপূর্ব্বেই তাম্লি জাতীয় কর বাবুরা এই স্থানে আগমন করিয়া আপনাদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ে যথেষ্টই উন্নতি করিয়াছিলেন। জয়কৃষ্ণরাম বালেশ্বরে বাসস্থান মনোনীত পূর্ব্বক

বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া, কর বাবুদিগের পরিবার মধ্যে আপনার পুত্রের বিবাহ দেওয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। এখানে বলা আবশ্যক করেরা তামুলি জাতির মধ্যে নিকৃষ্ট মৌলিক, আর রাজবংশীয়গণ শ্রেষ্ঠ কুলীন। শুভদিনে শুভক্ষণে লাল বিহারী করের সুশীলা কন্যার সহিত মাণিকরামের পরিণয়োৎসব সম্পন্ন হইল। এই বিবাহব্যাপারই বালেশ্বরে রাজপরিবারকে চিরস্থায়ী রূপে অবস্থিত করিবার সূত্রপাত করিল। সেই শুভবিবাহ-রজনীতে এই পরিবারের ভবিষ্যৎ সুখ সমৃদ্ধির বীজ অলক্ষিত ভাবে উপ্ত হইল। জয়কৃষ্ণরাম লক্ষ্মীস্বরূপিনী পুত্রবধুকে গৃহে আনিবার পরেই তাঁহার সংসারে কমলার পূর্ণ কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল। এমন কি তিনি যে কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন তাহাতেই তাঁহার মঙ্গল হইতে লাগিল। শুভক্ষণে বালেশ্বর রাজভবনে সর্ব্বার্থসাধিকা লক্ষ্মী দেবীর যে কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল, প্রায় দেড়শত বৎসর অতীত হইল, উহা অবিকৃত ভাবে থাকিয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

বালেশ্বর সহরের বর্ত্তমান মিউনিসিপাল অফিসের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এখন যেস্থানে ত্রিলোচন দাসের বাস্তবাড়ী, মাণিকরামের বিবাহের পূর্ব্বে কিছুদিবস এই পরিবার এখানে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত স্থানে পুলিশের আড্ডা থাকা প্রযুক্ত স্ত্রীলোকদিগের মান সম্ভ্রম রক্ষা করা অসম্ভব বিধায়, উক্ত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মাণিকরাম করবাবুদিগের প্রদত্ত কশবা মৌজার ভূমিতে, বাসস্থান প্রস্তুত করেন। কিন্তু এখানে থাকিবার তাদৃশ সুবিধা হইল না। কারণ এখানে স্বজাতীয় লোকের বসতি না থাকা প্রযুক্ত উক্ত স্থানে বাসকরা সুখজনক হইল না। স্বজাতিভক্ত মাণিকরাম "বার বাটীয়া" নামক স্থানে উঠিয়া গেলেন। এই বাড়ীতে ইহাঁরা কিছুদিন অবস্থিতি করেন। এই স্থানে ইংরাজদিগের কুঠী ছিল, সেই প্রাচীন কুঠী বাড়ী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রাজা শ্যামানন্দের জ্যেষ্ঠা কন্যা অদ্যাপি সেই স্থান ভোগ দখল করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে পরিবারের আধিক্য নিবন্ধন রাজা শ্যামানন্দের পিতা বারবাটীর সন্নিধানে অপর একটি নূতন বাসস্থান প্রস্তুত করেন।

পুনর্ব্বার বাসস্থান পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা লক্ষিত হওয়াতে, ইহারা মানিক্ষম রাজ নগর নামক বিখ্যাত স্থানে নূতন বাসভবন মনোনীত করিলেন। এখানে বসতি করিবার পরেই রাজলক্ষ্মীর সুপ্রসন্ন দৃষ্টি পূর্ণভাবে পতিত হইল। বালেশ্বর রাজবংশের শ্রী সৌন্দর্য্য এই স্থানে বিশেষ রূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এখানে রাজা শ্যামানন্দের পুণ্যময় পবিত্র হৃদয় স্বদেশের শুভ সাধন সঙ্কল্পে উন্নত হইয়া উঠে। এই ভবন হইতেই রাজা শ্যামানন্দের নাম বঙ্গোৎকলের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ

শ্রীচন্দ্র নাথ শর্ম্মা

সংবাদ।

মিঃ কমিং সাহেব ত্রিপুরার সেটলমেণ্ট অফিশর হইলেন। মিঃ ফল্ডার মেদিনীপুরের স্থায়ী মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর হইয়া আসিয়াছেন।

মেদিনীপুরের একটি ভদ্রসন্তান কলিকাতার কষ্টম্ হাউসের এক দালালকে ৫০০৲ টাকার একখান নোট দিয়া খুচরা নোট লইয়াছিল। ঐ নোট কলিকাতার আদামজি দাউদ ভাই কোম্পানি রেজেষ্ট্রী পত্রের মধ্যে মেদিনীপুরের সন্নিহিত এক গ্রামে তাঁহাদের কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কর্ম্মচারী ৫০০ টাকার পরিবর্ত্তে একখানি দশ টাকার নোট প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঘটনা পোষ্ট অফিশের কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করা হয়; কিন্তু কোন কিনারা হয় নাই। লবণের দালাল হইতে ঐ নোট করেন্সী আফিশে যাইয়া ধরা পড়ে, এবং উপরোক্ত ভদ্রসন্তানটির নামে চোরাই নোট ব্যবহার অপরাধে ফৌজদারী হইয়া মিঃ ম্যাকাটিশ সাহেবের এজলাসে তাহার ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। জজ সাহেব বাহাদুরের নিকট আপীলে ঐ রায় বাহাল আছে। প্রকাশ পাইয়াছে যে আসামীর এক সহোদর ডেব্‌রা পোষ্ট আফিসের রেজষ্টরি পত্র ও পার্শেল ক্লার্ক ছিলেন। ঐ রেজিষ্ট্রী পত্র ডেব্‌রা পোষ্ট অফিস দিয়া গিয়াছিল, এবং নির্দ্ধারিত সময় অপেক্ষা কয়েক ঘণ্টা অধিক সেথানে ছিল। উক্ত ক্লার্ক ডিশ্‌মিশ হইয়াছে। [illegible] সাবধান হইবেন।

যোগেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলির নিবাস ঢাকা জেলা। সে হরি নাথ মুখোপাধ্যায় নামে কলিকাতা বিডন স্কোয়ারে বাস করিয়া গোপনে চোরাই নোট ভাঙ্গাইবার কার্য্য করিত এবং নোটের পৃষ্ঠেও হরিনাথ নাম লিখিয়া দস্তখত করিত। সে একজন সহচরসহ মেদিনীপুরে সুজাগঞ্জের এক বেশ্যার বাটীতে বাসা করিয়াছিল। এবং একখান ১০০০ ও একখান ১০০ টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া ছিল। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডিটেক্টিভ ইন্‌স্পেক্টর বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুসন্ধানে যোগেন্দ্র নাথ ওরফে হরিনাথ ধরা পড়িয়া গত সেশনের বিচারে তিনটি পৃথক পৃথক অপরাধের জন্য ৯ বৎসর কয়েদ হইয়াছে।

ঘাটালে বক্‌রিদ উপলক্ষে হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা ইতি পুর্ব্বে কান্তিতে প্রকাশ হইয়াছে। মহিমাবর মাজিষ্ট্রেট ব্রাইট সাহেব বাহাদুর বিশেষ যোগ্যতার সহিত স্পেশাল পুলিশের বন্দোবস্ত করিয়া সে বার গোবধ নিবারণ করিয়াছিলেন। তৎপরে মুশলমানগণ বিরোধীয় স্থানে তাহাদের গোবধ করিবার জন্য স্বত্বসাব্যস্তের জন্য ১২০০ টাকা দাবিতে মেদিনীপুরে নালিশ রুজু করেন। শ্রীযুক্ত মহিমাবর জজ বাহাদুরের এজলাশে ৮ দিন ধরিয়া ঐ মোকদ্দমা চলিয়াছিল। মুশলমান পক্ষে কলিকাতা হইতে বারিষ্টার মিঃ কটনী সাহেব আসিয়াছিলেন। [illegible] মুশলমানগণ চাঁদা

করিয়া মহা উৎসাহে ঐ মোকদ্দমা চালাইয়া ছিল, এবং ঐ কয়েক দিবস আদালত গৃহে দলে দলে মুশলমানগণ উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দু পক্ষে নাকি তদ্বির হয় নাই। ঘাটালবাসীগণ ফিজের টাকা না দেওয়ায় জেলার কোন উকীল কার্য্য করেন নাই। শেষে ২।৩ দিন উকীল শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারি ঘোষ বি, এল, বিনা ফিজে কার্য্য করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। সহরে গুজব উঠিয়াছে যে ঘাটালবাসীগণ ৪০০ টাকা দিয়া কয়েকটি লোককে মোকদ্দমা তদ্বির করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা নাকি উকীল নিযুক্ত না করিয়া এইরূপে গোলযোগ করিয়াছে। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন—প্রকৃত ঘটনা ঘাটালবাসীগণের অবিদিত নাই।

মেদিনীপুর ফৌজদারি আদালতের প্রসিদ্ধ মোক্তার হরিমোহন মল্লিক মহাশয় ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুর ১৪।১৫ দিন পূর্ব্বে তিনি আপন পুত্রকে লইয়া কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন। তথায় সজ্ঞানে তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে। মল্লিক মহাশয় উপার্জ্জিত অর্থ অন্ন দানে ব্যয় করিতেন। যৌবনে ৩০০।৪০০ টাকা তাঁহার মাসিক আয় ছিল। বৃদ্ধাবস্থায় আয় অনেক কমিয়াছিল, কিন্তু তথাপি ৫।৭।১০ জনকে প্রতিদিন অন্নদান করিতেন। অনেক দীন দরিদ্র বালক তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত ও ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে। মেদিনীপুরের উকীল অভয় বাবু, বিপীন বাবু, যোগেন্দ্র বাবু এবং কলেজের হেড মাষ্টার শ্যাম বাবু, অনেককে অন্নদান করিয়াছেন। তাঁহারা একে একে ইহ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। হরি বাবুও দীন দরিদ্রদিগকে কাঁদাইয়া চলিয়াগেলেন। যাঁহারা কেবল স্বার্থ স্বার্থ করিয়া সঞ্চয় করিতেছেন, অর্থের সদ্ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত, হরি বাবুর দৃষ্টান্ত তাঁহাদের শিক্ষার বিষয় সন্দেহ নাই।

কাঁথি ইংরাজী বিদ্যালয়ের বিগত পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে সুযোগ্য সবডিবিজনাল অফিশর শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল বাগচী মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেরূপ আশাপ্রদ বক্তৃতা অনেক দিন শুনা যায় নাই। এক্ষণে কাঁচা খড়ের বাড়ীতে স্কুল হইতেছে। গত বৎসর কোন দুষ্ট লোক স্কুল-গৃহে আগুন লাগাইয়া দিয়া ছিল; দৈবক্রমে কোন ক্ষতি হয় নাই। তিনি মহকুমায় স্থায়ী হইতে পারিলে স্কুল গৃহটি পাকা করিয়া দিবার ও ছাত্রদিগের আবাসযোগ্য বোর্ডিং স্থাপনের চেষ্টা করিবার আশা দিয়াছেন। কার্য্যকুশলতা ও বিচারনৈপুণ্যে তিনি সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী ভাবে মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিশ্রুত ও অন্যান্য সৎকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন ইহাই আন্তরিক অভিলাষ।

শ্রীযুক্ত বাবু ফকির চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী কাঁথির দ্বিতীয় অফিশারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি কাঁথি পঁহুছিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কাঁথিতে হরিসভা স্থাপনের কথা অনেক দিন চলিতেছে। [illegible]

নির্ম্মাণের নিমিত্ত অর্থ সাহায্য করিয়াছেন ও অনেকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সকলে শুনিয়া সুখী হইবেন যে হরিসভার নিমিত্ত সুন্দর পাকাবাড়ী প্রস্তুত হইতেছে। যাঁহাদের সাধু যত্নে এই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে তাঁহারা সকলের ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই।

মাজনামুঠা ও জলামুঠা পরগণা পুনরায় জরিপ হইয়া সেটেলমেণ্ট হইবার আদেশ হইয়াছে। শীঘ্রই কার্য্য হইবে।

কাঁথি থানার অন্তর্গত ঢোলমারি গ্রামে সামান্য এক খণ্ড জমীর ধান্য কাটা লইয়া মারামারি হইয়া বসন্তিয়া গ্রামনিবাসী সমীর সেখ নামক একব্যক্তি গুরুতর রূপে আহত হইয়া হাঁসপাতালে নীত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। মোকদ্দমায় তিন জন আসামী খালাস পাইয়াছে; বাকি আসামীগণ দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছে।

সেদিন কাজলা গ্রামের বশির খাঁ কয়েক ব্যক্তিকে অস্ত্র দ্বারা গুরুতর রূপে আঘাত করা অপরাধে ধৃত হইয়াছে। আহত পক্ষে ঘটনা এইরূপ প্রকাশ যে বশির তুইজন লোকসহ বিষমিশ্রিত ঘাস ক্ষীরোদ চন্দের একটা গরুকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছিল। ক্ষীরোদ তাহা দেখিতে পাইয়া গোল করায় তাহারা ধান্য ক্ষেত্রের দিকে পলায়ন করে। ভদ্র চন্দ বসিরকে ধরিতে যাওয়ায় সে ভদ্রর গলায় ছুরি দ্বারা আঘাত করে। ভদ্র মাটীতে পড়িয়া যায়। কান্ত দাস ও ক্ষীরোদ চন্দ বসিরকে পলাইতে দেখিয়া ধরিতে যাইয়া ভীষণ রূপে আহত হইয়াছে। ক্রমে অনেক লোক উপস্থিত হয়। বিরু দাস ও পচুপাল শেষে অনেক কষ্টে ভয়ানক আঘাত সহ্য করিয়াও আসামীকে ধরিয়া ফেলে এবং ছুরী ছাড়াইয়া লয়। এই বসির বিগত শ্রাবণে গরুকে বিষ দেওয়া অপরাধে চালান হইয়াছিল কিন্তু দণ্ড পায় নাই। আহত ব্যক্তিগণ হাঁস পাতালে রহিয়াছে। মোকদ্দমার বিচার হইয়া আসামীকে তুই বৎসরের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া তুঃখিত হইলাম। দোরোর বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্র নারায়ণ প্রধান নোট্ জাল করার অপরাধে পুলিস্ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। নদীয়া জেলার রানাঘাটের সব্‌ডিবিজনাল অফীসারের নিকট তাঁহার বিচার হইবার কথা; সত্য মিথ্যা জানিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম।

কাঁথির টোলটি অর্থাভাবে অত্যন্ত তুরবস্থাপন্ন হইয়া পড়িতেছে, কাঁথির ন্যায় সহরে যদি টোলটি অর্থাভাবে উঠিয়া যায় তাহা কাঁথির ভদ্র সমাজের নিতান্ত নিন্দার বিষয়। আশা করি কাঁথি সব্‌ডিবিজনের অধিবাসীগণ অধ্যাপক মহাশয়কে সাধ্যমত অর্থানুকূল্য করিয়া কাঁথির মুখ রক্ষা করিবেন।

মানবাত্মা ও প্রেম্।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে প্রেম মানবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেই কথাটা এ প্রস্তাবে একটু বিশদ রূপে ব্যাখ্যা করিতেছি।

মানবাত্মা স্বতন্ত্র নহে; অর্থাৎ আত্মা-ভিন্ন অপর কোন বস্তু বা সত্তা যদি এ জগতে না থাকিত, তবে ইহার অস্তিত্ব থাকিত না। আত্মা ও দেহ লইয়াই মানব। আত্মা দেহ হইতে পৃথক হইলেও এই দেহের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ বন্ধন রহিয়াছে। এই আত্মা ও দেহের সমষ্টিরূপ মানব, অস্তিত্বের জন্য আপনা ভিন্ন অন্য বস্তুর উপর নির্ভর করে। অন্যনিরপেক্ষ সত্বাকেই স্বতন্ত্র বলে। এই যে অন্যাপেক্ষা, ইহাই মানবের অপূর্ণতা বা অভাব। অন্যকে পাইতে কাজেই মানবের আকাঙ্ক্ষা। দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মা পর্য্যন্ত, মানব কেবল আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। অভাব পূর্ণ করিতে না পারিলে মানুষ বাঁচে না। শরীরের ভিতরে ক্ষুধা পিপাসাদি আকাঙ্ক্ষা; তজ্জন্য অন্ন জল চাই। চক্ষু রূপাকাঙ্ক্ষা করে, রসনা রসাকাঙ্ক্ষা করে, কর্ণ শ্রবণাকাঙ্ক্ষা করে; এই প্রকার অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ই আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। মন তো আকাঙ্ক্ষাময়। শরীরের রক্ষার জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণায় অন্ন জল গ্রহণ না করিলে শরীর ভগ্ন হয়, এবং তাহাতে আমরা ক্লেশ বোধ করি। আবার শরীর রক্ষার উপযোগী পদার্থও অন্ন জল রূপে বাহ্য জগতে আছে। উহা গ্রহণ করিলে ক্ষুৎপিপাসার শান্তি হয় এবং আমরা এক প্রকার আরাম লাভ করি, যাহাকে সুখ বলা যায়। এইরূপ প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষার বা অভাবের উপযোগী পদার্থ বাহ্য জগতে বর্ত্তমান আছে। তাহাদের সংযোগে সুখ-বোধ হয়। সুরূপ চক্ষুতে পড়িলে, সুস্বর শুনিলে, সুমিষ্ট রস আস্বাদন করিলে, সুগন্ধ আঘ্রাণ করিলে, সুখস্পর্শ পদার্থ স্পর্শ করিলে, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্ পথে সুখবোধ হয়। সর্ব্ব প্রকার ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সম্বন্ধেই এই প্রকার নিয়ম।

এই সকল আকাঙ্ক্ষার ভিতর আবার তীব্রতার তারতম্য আছে। কোনটী অধিক তীব্র, সেটী পরিপূর্ণ করিতে অধিক চেষ্টা স্বভাবতঃ হয়। যেমন দর্শনেচ্ছা অপেক্ষা বুভুক্ষা তীব্রতর; এই জন্য সুদৃশ্যের অপেক্ষা ভোজনের জন্য মানুষ অধিকতর ব্যস্ত। শ্রবনেচ্ছা বা স্পর্শেচ্ছা অপেক্ষা সাধারণতঃ রসগ্রহণেচ্ছা প্রবলা, এইজন্য সাধারণতঃ সঙ্গীতপ্রিয় লোক অপেক্ষা আস্বাদনপ্রিয় অর্থাৎ পেটুক লোকের সংখ্যা অধিক। কাম প্রবৃত্তি সহজ প্রবলা, এইজন্য কামুক লোকের সংখ্যা আরও বেশী। এই সকল দৈহিক আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিবার জন্য লোক কত ব্যাকুল, তাহা প্রতিদিন সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। এই পৃথিবীময় লোকের ছুটাছুটী কেবল এই জন্য।

এই সকল অভাব বা আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার উপযোগী পদার্থের প্রতি

মানুষের সহজেই ভালবাসা জন্মে। সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে যে ব্যক্তি বা বস্তু আকাঙক্ষা-পরিতৃপ্তির সহায়তা করে, তাহার প্রতিও সহজে ভালবাসা জন্মে। যে স্থানে এই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয়, তাহাও প্রিয় হয়। সদ্যজাত শিশু ক্ষুধা তৃষ্ণা ও আরাম যেমন অনুভব করে, আর কোন অভাব তেমন অনুভব করে না। পিতামাতা তাহার সেই সকল অভাব পরিপূর্ণ করিতে সর্ব্বদাই যত্ন করেন। এই জন্য সে সহজেই পিতামাতাকে ভালবাসে। ক্রমে যত বড় হইতে থাকে, তাহার আকাঙ্ক্ষা-বোধ ততই বাড়িতে থাকে, এবং সেই আকাঙক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য ততই বেশী লোকের ও বস্তুর সংস্পর্শে আসে, ও ততই বেশী লোককে ও বস্তুকে ভাল বাসিতে থাকে। ক্রমে রূপ রসাদি বোধ হয়, ক্রমে খেলনা, মিষ্টান্ন প্রভৃতির উপর ভাল-বাসা ছড়াইতে থাকে; এবং সেই উপলক্ষে ভাই ভগ্নী আত্মীয়াদির প্রতি ভালবাসা বিস্তৃত হইতে থাকে। ক্রমে সে বুঝিতে পারে অর্থদ্বারা সকল আকাঙক্ষা পরিতৃপ্তির সুবিধা হয়, তখন অর্থের প্রতি ভালবাসা জন্মে। যৌবনোদ্গমে সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তির বিকাশ হইতে থাকে; সেই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুরুষ পরস্পারের সঙ্গ ভাল বাসিতে থাকে। গৃহ, জন্মস্থান ও স্বদেশের প্রতি প্রেমের মুলেও এই প্রকার কারণ বর্ত্তমান। ভালবাসার বিকাশের এই প্রথম সোপান। ইন্দ্রিয়পথে সুখানুভূতি জন্মে বলিয়াই ইন্দ্রিয়-ভোগ্য ও তাহার আনুসঙ্গিক বিষয়ে মনের অনুরাগ জন্মে।

বহিরিন্দ্রিয়ের ন্যায় অন্তরিন্দ্রিয়েরও বৃত্তি গুলি যাহা দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়, তাহাতে প্রেম সঞ্চারিত হইতে থাকে। স্থূল বহিরিন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় স্থূল বাহ্য জগৎ। সূক্ষ্ম অন্তরিন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় সূক্ষ্ম অন্তর্জগৎ। চৈতন্যময় মন, চৈতন্যময় মনকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রীতি করিতে পারে, কেননা তাহার বৃত্তিনিচয়কে মন ভিন্ন আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। এই জন্য মানুষের প্রতি মানুষের একটী উচ্চতর প্রেম জন্মে। এবং যাহার মন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে কাহারও মনের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে, সেই বেশী পরিমাণে ভাল বাসা পায়। এই জন্যেই সম-প্রকৃতির লোকের মধ্যে সহজে প্রীতি জন্মে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, মন যেমন বাহ্যেন্দ্রিয়-স্পর্শজনিত সুখানুরোধে বাহ্য স্থূল ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে ভাল বাসে, তেমনি অন্ত-র্বৃত্তিনিচয়ের পরিতৃপ্তিজনিত সুখানুরোধে মনকে অর্থাৎ অপর ব্যক্তিকে ভালবাসে। মন আকাঙক্ষাময়; সে অনুরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট, অর্থাৎ তাহার আকাঙক্ষা অনুভব করিতে ও তাহাতে সহানুভূতি করিতে পারে, এমন ক্ষমতাশালী পদার্থ যে মন, তাহাকেই ভালবাসে।

পরিচালনা ও অভ্যাস দ্বারা যে ইন্দ্রিয়কে যত উত্তেজিত করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি ততই অধিকতর অনুরাগ জন্মে। যে রসনেন্দ্রিয়ের পরিচালনা অধিক পরিমাণে করে, রসের প্রতি তাহার অধিক অনুরাগ। যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সমধিক পরি-চালনা করে, সে সঙ্গীতপ্রিয় হয়। যে দর্শনে-ন্দ্রিয়ের পরিচালনায় যত্নশীল, রূপজ সৌন্দর্য্যে

তাহার অনুরাগ সমধিক। যে জননেন্দ্রিয়ের পরিচালনা বেশী করে, তাহার কামশক্তি প্রবলা হয়। তেমনি, যে ব্যক্তি যে মনোবৃত্তির পরিচালনা বেশী করে, সে তদনুরূপ বিষয়ের প্রতি, এবং যাহার সেই মনোবৃত্তি প্রবল, সেই ব্যক্তির প্রতি সমধিক অনুরাগী হয়। জ্ঞান-বৃত্তি পরিচালনশীল ব্যক্তির জ্ঞানানুরাগ ও জ্ঞানীর প্রতি অনুরাগ হয়। পরোপকার বৃত্তির পরিচালনাকারী পরের হিতসাধনে এবং পরোপকারীর প্রতি অনুরাগী হয়। স্নেহশীল ব্যক্তি স্নেহের পাত্র ও স্নেহ কারীর প্রতি অনুরাগী হয়। আত্মা জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাময়, সুতরাং জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাময় পদার্থেই ইহার অনুরাগ।

মানুষ জন্ম গ্রহণ করিবার সময় সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন থাকে। ক্রমে স্থূল জ্ঞানে-ন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া তাহার জ্ঞানের বিকাশ হয়। মন প্রথমে ইন্দ্রিয় পথেই প্রকাশিত হয়। ক্রমে সূক্ষ্মতর অন্তরিন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়। আধ্যাত্মিক বিকাশ সকলের শেষ ঘটনা।

মন অনুরাগময়, অর্থাৎ সে কিছু না কিছু অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না; সে সর্ব্বদা অনুরাগে বিভোর হইয়া থাকিতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষাই তাহাকে জ্ঞানরাজ্যে উন্নত করিতে থাকে। এই পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য সে নিয়ত উপায় অনুসন্ধান করিতে থাকে। এই অনু-সন্ধানই সকল জ্ঞানের মূল ভিত্তি। স্থূল রাজ্যে তৃপ্ত না হইয়াই মন অন্তর্জগতে প্রবেশ করে। তথায় তৃপ্তি না পাইয়াই সে এ সকলের অতীত চিদানন্দময় ব্রহ্মরাজ্যের অনুসন্ধান করিতেছে। এই ব্যাপারটী বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বহিরিন্দ্রিয়ের স্পর্শজনিত সুখ যত স্থূল, ততই সহজে মনকে আকর্ষণ করে, এবং তত অল্প সময়েই সেই ইন্দ্রিয়-সুখ শেষ প্রাপ্ত হয়। তথাপি যদি মন তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া সেই সুখের আশায় ইন্দ্রিয়কে বেশী পরিচালনা করে, তবে অতি অল্প কালের মধ্যেই তাহা হইতে ব্যাধি উৎপন্ন হয়; ইন্দ্রিয় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তখন মন আর সে পথে কোন সুখ লাভ করিতে পারে না। লোভী ব্যক্তি অতিরিক্ত আহার, কামুক অতিরিক্ত পরিমাণে কামসুখ উপভোগ করিতে গিয়া শীঘ্রই ক্ষীণ, রুগ্ন ও অক্ষম হইয়া পড়ে, ইহার দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন।

আবার ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকলও ক্ষণস্থায়ী; সর্ব্বদা ইচ্ছামত পাওয়া যায় না। সুতরাং মন তাহাতে সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে তো পারেই না, অধিকন্তু বিচ্ছেদ-কালে অবলম্বনস্বরূপ অন্য কোন পদার্থ ধরিতে না পারিয়া অশান্তি ভোগ করে।

যদি এমন হইত যে, কোন ইন্দ্রিয় চিরদিন সমভাবে অবিরাম কার্য্য করিতে পারিত, এবং তাহার ভোগ্য বিষয় সহজে লাভ করা যাইত, এবং তাহার শেষ না হইত, আর মনে কোন উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা না থাকিত, তবে মন সেই ইন্দ্রিয়পথে, সেই ভোগ্য বিষয়েই আসক্ত ও তন্ময় হইয়া চিরদিন তৃপ্তি লাভ করিতে পারিত। কিন্তু বিধাতা সংসারকে সে প্রকৃতি দিয়া গঠিত করেন নাই। তাহার ফল উপরে সামান্য

ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে; ক্রমে অপরাপর ফল বর্ণিত হইতেছে।

(১)বাহ্য বস্তুর অনিত্যতা হেতু মনের ভোগেরও বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়।

(২) ইন্দ্রিয়ের শক্তি নিতান্ত ক্ষুদ্র; সুতরাং বাহ্য বস্তুর সংযোজনা হইলেও ভোগের শক্তি না থাকাতে তাহা নিত্য সম্ভোগ করিতে পারা যায়না,তাহাতেও মনের অতৃপ্তি । এতদ্ভিন্ন অতিভোগজনিত পীড়াদি ক্লেশও বিস্তর আছে।

(৩) ঐ সকল বাহ্যবস্তু সহজলভ্য না হওয়াতে, তাহার অভাবে চঞ্চলতা, এবং অভাব হইতে পারে বলিয়া উদ্বেগ।

(৪)সংসারের নানা প্রকার ঘটনা ও অবস্থা, এবং অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক সময় সেই সকল ভোগের বিঘ্ন জন্মায়, তজ্জন্য মনে অশান্তি ও বিরক্তি।

(৫) ইন্দ্রিয়বিশেষের ভোগ্য বস্তুতে একবার আসক্তি জন্মিলে, বুদ্ধি কেবল তাহার দিকে একাগ্রভাবে স্থিতি করে, এবং অপর বিষয়ে পরিচালনার ক্ষমতা ক্রমে হ্রাস পাইয়া পরিণামে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। তাহাতে বিচ্ছেদ-কালে তৃপ্তি লাভ করিবার জন্য অপর পথ ধরিতে এবং উচ্চতর পথে চলিতে অক্ষম হইয়া,মনও দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয়।

কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই প্রতীত হইবে যে উপরে যে কয়েকটী ফলের উল্লেখ করা হইল, তাহারই মধ্যে সংসারের সমগ্র দুঃখ রহিয়াছে; এতদ্ভিন্ন অপর দুঃখ নাই। ইহারই মধ্যে রোগ শোক, মৃত্যুভয় অভাব, হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ, বিসম্বাদ মূঢ়তা, জড়তা, ভয় ভাবনা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও পাপের বীজ রহিয়াছে। এ সকল,ইন্দ্রিয় সুখাশক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু সংসারের সাধারণ লোকেরা ইহা অপেক্ষা উচ্চতর,মনের অবলম্বনীয় স্থায়ী কোন বিষয় ধরিতে পারে না বলিয়াই, এই অসার সুখে আত্মাকে মজাইতে গিয়া নানা প্রকার দুঃখ, দুর্ব্বলতা ও পাপে জড়িত হয়।

বহিরিন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তুর বিষয়ে যাহা উল্লিখিত হইল, অন্তরিন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তু বিষয়েও তাই খাটে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা যাউক। মানুষের পরিশ্রম দ্বারা আমাদের বাহ্য সুখের সংযোজনার বিস্তর সাহায্য হয়;—তাহার স্নেহ, সহানুভূতি, জ্ঞান, উদ্যম উৎসাহ, ও প্রেম দ্বারা আমাদিগের অন্তরিন্দ্রিয়ের সুখ লাভ হয়। ফলতঃ এজগতে মানুষ একাধারে আমাদের অনেক আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির উপায় স্বরূপ বহুবিষয়ের অধিকারী।এই জন্যে মানুষকে গাঢ় প্রীতি করা যায়। এই কারণেই স্ত্রী পুরুষে প্রেম এত প্রগাঢ় হইয়া থাকে। এই তৃপ্তির অভিপ্রায়েই স্ত্রী পুরুষ চিরকালের জন্য উভয়ে উভয়কে আপনার করিয়া রাখিতে চায়। মানুষ মানুষকে আপনার করিতে চায়। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু আত্মীয় 'আমার' হওয়া চাই। এই 'আমার' করিবার জন্যই পরিবারবন্ধন ও সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। যাউক, এক্ষণ আমাদের মূল কথা চলুক।

মানুষ চাই বটে, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষার উপযোগী মানুষটী চাই। অথবা যাহাকে 'আমার' করিয়া লইলাম, তাহাকে আমার আকাঙ্ক্ষার উপযোগী হওয়া চাই।

নতুবা আমি তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। তাহাকে অবিচ্ছেদে পাওয়া চাই।

কিন্তু যাহা চাই, তাহা পাওয়া যায় কৈ? প্রথম, মানুষও মরণশীল ও অনিত্য। সুতরাং অনিত্যতাজনিত যে সকল দুঃখ, মানুষকে প্রীতি করিয়াও সে সকল ভোগ করা অনিবার্য্য।

দ্বিতীয়, আমার মনের ন্যায় সকলেরই মন স্বাধীন, এবং সকলেই ভিন্ন রুচি-সম্পন্ন, ভিন্ন ভিন্ন আকাঙ্ক্ষার অনুবর্ত্তী। সুতরাং মনের অনুরূপ মন পাওয়া দুষ্কর। আবার, আজ যাহার মন অনুরূপ আছে, কাল যে সেরূপ থাকিবে, তাহারও বিশ্বাস নাই। মানুষের মন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অবিশ্বাসের জিনিষ। এই কারণ হইতে বিস্তর দুঃখের উৎপত্তি হইতে পারে ও হইতেছে।

তৃতীয়তঃ, এখানেও প্রতিযোগিতা বড় তীব্র। 'আমার'টী পাছে অপরে লইয়া যায়, এজন্য বড় উদ্বেগ থাকে। অপরের ছায়া দেখিলেই আশঙ্কা হয়। এই প্রতিযোগিতা হইতে যে বিরক্তি জন্মে, তাহাতে মর্ম্মান্তিক দ্বেষ হিংসা ক্রোধাদির সঞ্চার হয়। এমন শক্রতা আর কোথাও জন্মে না। মানুষের মনকে 'আমার' করা উপলক্ষে জগতে যত গুরুতর বিবাদ, শক্রতা ও মারামারি কাটা কাটি, এত আর কিছুতেই নহে। যে অর্থ হরণ করে, সম্মুখস্থ আহার কাড়িয়া লয়, ভূসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করে, তাহার প্রতি ক্রোধ হয় বটে; কিন্তু যে প্রণয়ী কিম্বা প্রণয়িনীর মন অধিকার করিতে চেষ্টা করে, তাহার প্রতি লোকের যেমন মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মে এমন আর কাহারও প্রতি নহে। এই ক্রোধের প্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে নরহত্যা সংঘটিত হইয়া যায়।

যাহাতে যত সুখের সম্ভাবনা, তাহা হইতেই তত অধিকতর দুঃখেরও সম্ভাবনা। এই জন্যই প্রণয় হইতে জাত দুঃখ, শোক, ভয়, ভাবনা; উদ্বেগ অশান্তি, ক্রোধ, হিংসা দ্বেষ, মোহ, সকলই গুরুতর।

দুটী মন একেবারে এক হইয়া যায়, এরূপ সচরাচর ঘটে না। সুতরাং প্রণয়জাত সুখও সচরাচর পূর্ণ মাত্রায় ঘটে না। দাম্পত্য-বন্ধনে এই সাধনের প্রয়োজনীয়তা বড় বেশী, অর্থাৎ পতি পত্নী উভয়ে মিলিয়া এক আদর্শে মনকে গঠিত করিয়া একরূপ হইবে, এই দম্পতীর প্রধান কর্ত্তব্য। এই সাধন করিতে পারিলেই উভয়েই পরম সুখ লাভ করিতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন দম্পতী কয়টী মিলে? মিলিলে কি প্রাচীন সাধুগণ গৃহত্যাগী হইবার পরামর্শ দিতেন?

আবার যদি দম্পতী সৌভাগ্যক্রমে এই সুখের অধিকারী হয়, তাহা হইলেও জীবনের অনিত্যতা তো ঘুচিবে না। বিচ্ছেদ তো অবশ্যম্ভাবী; সে বিচ্ছেদ বড় ভয়ানক; সুতরাং এখানেও মনের পূর্ণতৃপ্তি নাই, আরও কিছু চাই।

জ্ঞানালোচনায়, মনে গভীর সুখ পাওয়া যায়। আর তাহাতে এতদূর ঝঞ্ঝাট নাই। জ্ঞানের বিষয় সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে। তাহা কেহই হরণ করিতে পারে না। জ্ঞান অনন্ত, শেষ নাই। ইহা হইতে অপর সুখও অনেক পাওয়া যায়। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয় সকল অপেক্ষা এটি উৎকৃষ্টতর

সন্দেহ নাই। এই জন্য কেহ কেহ ইহাতেই মনকে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা যে খুব সুখী সন্দেহ নাই। তাহাদের মনও বেশ পবিত্র ও শান্ত। কিন্তু এপথেও পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না। বিশ্বের ভিতর দিয়া জগতেরই সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিতে হয় কেহ চিরদিন এ জগৎ লইয়া থাকিতে পারিবে না। সুতরাং জ্ঞান অনন্ত হইলেও, সংসারের অনিত্যতা হেতু ইহার সহিত বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়তঃ সংসারে জ্ঞান লাভেরও অনেক বিঘ্ন আছে। এমন কি সমাজও অনেক সময়ে জ্ঞানের বিদ্বেষী হইয়া জ্ঞান লাভের পথে শত্রুতাচরণ করে। জ্ঞানীদিগের প্রতি জগতে অনেক নির্য্যাতন হইয়াছে, এখনও হইতেছে। আবার জ্ঞান লাভের সুবিধা করার জন্যে সংসারে অর্থাদি অনেক বস্তুর প্রয়োজন; তাহা সংগ্রহ করিতে গিয়া মন চঞ্চল হইয়া পড়ে; সংগ্রহ করিতে না পারিলে জ্ঞান লাভের পথে বিঘ্ন ঘটে।

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত প্রেমাকাঙ্ক্ষা তাহাতে চরিতার্থ হয় না। এইটী সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভাব।

ফলতঃ জ্ঞানের পথেও মনের পিপাসা মিটে না।

কোন কোন দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি সংসারের অসার সুখের অতিরিক্ত কিছুই দেখিতে পায় না, অথচ তাহাতে জড়িত হইয়া যখন নানা প্রকার দুঃখ ক্লেশে ক্লান্তি বোধ করে, অথচ মনের তৃপ্তি হয় না, তখন মনের প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষার পথ বন্ধ করিতে চায়। কিন্তু জড়তা ভিন্ন তাহা সম্ভবে না। এই জন্য তাহারা জড়তা আনয়ন করিতে চেষ্টা করে — মাদক সেবনাদি দ্বারা মনের জড়তা সাধন করিতে চায়। কিন্তু নেশাও অনিত্য, সসীম, ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যুর অধীন, অর্থাদি সাপেক্ষ; সুতরাং সেও এ উদ্দেশ্য সাধনে কদাচ সমর্থ হইতে পারে না। অধিকন্তু, আরও ঘোরতর দুর্গতি সাধন করিয়া, মনুষ্যকে নিতান্ত বিপন্ন করিয়া, দুর্ব্বল করিয়া, রুগ্ন করিয়া, মলিন করিয়া, যখন পরাজয় স্বীকার করে, মানুষ তখন একেবারে অন্ধকার দেখে। নিরাশা, অনুতাপ ও দুর্ব্বলতার ভিতর পড়িয়া তীব্র নরক-যাতনায় অস্থির হয়।

মন তাহায় অনন্ত ক্ষুধা চরিতার্থ করিবার জন্য দিবা নিশি ব্যস্ত। সে একটা জিনিষ চায়, যাহাতে অনন্ত কালের জন্য অবিচ্ছেদে আত্ম-সমর্পণ করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু সংসারে এমন জিনিষ তো কিছুই নাই। বাহ্য ভোগ্য বিষয় সকল নিতান্ত সীমাবদ্ধ এবং মনও তাহা হইতে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না; অথচ নানা প্রকার দুর্গতি, পাপ তাপ উৎপন্ন হইতেছে। তাহার কুফল সকলকেই ভোগ করিতে হইতেছে; মনুষ্যসমাজ নানা প্রকারে অশান্তির আগুনে দগ্ধ হইতেছে। তথাপি মানুষ মানুষকে সর্ব্বদাই এই ঘোর নরকের দিকেই তৃপ্তির পথ দেখাইতেছে। জীবের এই পিপাসার জন্য সকলেই সংসার-মরুর সুখ-মরীচিকার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছে, "যাও ঐপথে যাও।" যাহারা সেপথে গিয়া এই ত্রিতাপের অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে, তাহারাও অপরকে বলিতেছে

ঐপথে যাইতে। পিতামাতা সন্তানকে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে, বন্ধু বন্ধুকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, আত্মীয় আত্মীয়কে—সকলেই পরস্পর ঐপথ দেখাইতেছে। বাল্যকাল হইতে আমরা ঐ শিক্ষা পাইতেছি, ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছি, ঐদিকেই ধাবিত হইতেছি। সংসারের অধিকাংশ লোকেই নিতান্ত জঘন্য নীচ সুখের দিকে ধাবিত। কিন্তু মধুর পিপাসা জলে নিবারিত হয় না। সকলেই অতৃপ্ত, সকলেই অশান্তিদগ্ধ, সকলেই অস্থির হইয়া হাহাকার করিতেছে। মনটা দশ পথে দশদিকে ধাবিত হইয়া, সর্ব্বত্রই অতৃপ্তি ভোগ করিতেছে।

কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি এই দুঃখ দূর করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন, যে সম্পূর্ণ রূপে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে পারিলেই ইহার প্রতীকার হইতে পারে। এই উদ্দেশে যোগপন্থার আবিষ্কার হইয়াছে। কিন্তু তদ্বারা জগতের বিশেষ কোন উপকারই সাধিত হয় নাই। কোন কোন ব্যক্তি যদিও যোগ সাধনা করিয়া চিত্তবৃত্তির একান্ত নিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। অনেকেই সে পথে বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। পরে, জন্ম জন্মান্তরে, অযুত বৎসরের পর সিদ্ধ হইবে বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছেন। তাহাতে জগতের দুঃখ দূর হইবে কেন? দুই একজন লোক বাদে সমস্ত জগৎ যেমন ছিল তেমনি রহিয়া যাইতেছে। আবার, যদি সে পথ সহজ হইত, এবং মানুষ তাহাতে সফলতা লাভ করিতে পারিত, তবে সকলেই সেই পথে ধাবিত হইত, এবং অপরকেও উপদেশ দিত। তাহা হইলে এত দিন সৃষ্টি-প্রবাহ নিশ্চয়ই লোপ প্রাপ্ত হইত। কিন্তু মানবজীবনের পক্ষে সে অস্বাভাবিক পথ নিতান্ত অনুপযোগী বলিয়াই মানবজাতি এতদিন জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই, তবে কি জীবের জন্য কোন পথ নাই? চিরদিন কি সে এই অতৃপ্ত পিপাসার জ্বালায় অস্থির হইবে, আর ভব-যাতনায় ছট্‌ ফট্‌ করিবে? না; যিনি এই জগৎকে এমন করিয়া, এই প্রকৃতি দিয়া রচনা করিয়াছেন; তিনি ইহার উপায়ও বিধান করিয়াছেন, এবং এই অতৃপ্তির ভিতর তাঁহার গূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায়ও নিশ্চয়ই বর্ত্তমান আছে।

—(**)—

তুমি কি আমার!

মন, তুমি কি আমার?—
তুমিকি আমার সেই, বাল্যের স্বপনময়ী,
সুখের আধারভূমি,
মানস আমার!

তুমিকি আমার সেই
শৈশব স্বপন-স্মৃতি, সেই সুখ সেই প্রীতি,
সেই আশা ভালবাসাময়,
সেই মোর পাগল হৃদয়?

মন ! তুমি কি গো সেই ?—
ছিলে যে আপনা ভুলা, সতত সুখের খেলা,
বিজনে খেলিতে নিশিদিন ;
নীরব নয়ন-ধারা বহেনি ত কোন দিন !

তুমি কি আমার সেই
প্রফুল্ল গোলাপ সম নিষ্কলঙ্ক প্রাণ মম
বিষাদ বিরক্তিহীন
জীবন আমার ?

আজি মোর আকুল হৃদয় ;—
সে সুখ স্বপনসম কোথায় মিশেছে মম
কাল মেঘ গ্রাসিয়াছে
ফুল্ল জোছনায়।

তাই আজ এ বিজনে
বহিছে নীরব ধারা, তাই প্রাণ শান্তি হারা
কি যেন বিষাদ মাখা
হেরি সমুদয় !

এখনও শুনিতে পাই—
কুহু রবে পাখি গায়, তটিনী বহিয়ে যায়
মধু মাসে ফুটে ফুল
নব কিশলয়-কোলে।

এখনও দেখিতে পাই
স্নেহময়ী মার কোলে, খেলে শিশু হেলে দুলে
আধ ফোটা কত কথা
আধ ভাঙ্গা কত গান !

সুদূরে দাঁড়ায়ে দেখি,—
আমার পরশে পাছে তারাও শুকায়ে যায়
কাছেতে যাইনা তাই
সরে আসি পায় পায়।

দেখি দূরে যৌবনের
উত্তাল তরঙ্গ-রাশি, আবেগ হৃদয় ভরা,
কতসুখ কত আশা হাসি
তাদের হৃদয়ে যায় ভাসি !

দেখি আর মনে হয়—
মন তুমি কি আমার? তুমি কি সে কহিনু
তুমিকি রতন সেই
মৃত অভাগার ?

দেখি আর মনে হয়—
সেই সে উদার প্রাণ, সেই আত্ম বলিদান
মলিন হইয়া গেছে
এত নীচতায়।

কখন ভাবি নি মনে
হবে ক্ষুদ্র হৃদি খানি, স্বার্থের আবাসভূমি
শেষ তার পরিপূর্ণ
মৃত্যু যাতনায়।

—*—

শ্রীসরলা দত্ত
মেদিনীপুর।

আমার মকদ্দমা।

(২০১ পৃষ্ঠার পর)

এবার আর সমন জারীর বিলম্ব হইলনা। সেবাপুজার বন্দোবস্ত করিতেই অতি সহজে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। রাম দাস এতদিন দাদাকেই আমার কারাগারের সঙ্গী নির্দ্ধারিত করিয়াছিল; এক্ষণে বলিতে লাগিল যে সেই সঙ্গে সাক্ষীদিগকেও শ্রীঘরে না পাঠাইয়া ছাড়িবেনা; তাহারা জবানবন্দী দিলেই ফৌজদারী সোপরদ্দের বন্দোবস্ত করিবে। রামদাসের আস্ফালনে সাক্ষীরাও ভীত হইল তাহারা আদালতে যাইতে অসম্মত হইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। দাদা তাহাদিগকে অনেক বুঝাইলেন;প্রকৃত কথা বলায় পুণ্য আছে, তাহাও প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন,আর রেজষ্ট্রী তমসুকে সাক্ষীদের ভয়ের কোন কারণ থাকিতে পারেনা, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। তাহারা কিন্তু বুঝিয়াও বুঝিলনা; পরিশেষে স্পষ্টই বলিল যে যাহাতে বিপদের আশঙ্কাও হইতে পারে, অকারণ কেন তাহাতে তাহারা অগ্রসর হইবে? সাক্ষীদিগের ভাব গতিক দেখিয়া দাদাও চিন্তিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ভায়া, সাক্ষী ক'টার নাম দলিলে লেখা থাকাতেই দায়ে ঠেকেছি, তা না হলে সাক্ষীর জন্য আবার ভাবনা? কিছু খরচ করলেই অনেক সাক্ষী আনা যায়।"

আমি বলিলাম," যে সে লোক নিয়ে কি হবে? যারা মোকদ্দমার কথা জানে, তেমন লোক না হলে কি হ'বে? "দাদা হাসিয়া বলিলেন, "ভায়া, সাক্ষী আবার কবে সব কথা জানে? সাক্ষ্য লওয়া কেবল স্মরণশক্তির পরীক্ষা মাত্র। তুমি পাঠশালায় যেমন ছেলেদের লেখা পড়া ঠিক ক'রে পরীক্ষকের নিকট উপস্থিত কর; সাক্ষীদিগকেও ঠিক তাই করতে হয়; শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক ক'রে হাকিমের কাছে ধ'রে দিলে পরীক্ষার ফল ভালই হয়ে থাকে।"

আমি দাদার কথা শুনিয়া বিস্মিত নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম; মিথ্যা প্রমাণ সংগ্রহের কথা শুনে মনে মনে বড় ঘৃণা হ'তে লাগল; দাদার প্রতি ভক্তির মাত্রা কমিতে লাগিল। কিন্তু তখন আর উপায় নাই; এতদুর অগ্রসর হইয়াছি যে পশ্চাদগামী হওয়াও এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, প্রাণ থাকিতে মিথ্যা সাক্ষ্য উপস্থিত করিব না।"

আমাকে ধীরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া দাদা আবার বলিতে লাগিলেন,"ভায়া তোমার কথায় কথায় বিস্ময়! পণ্ডিতি বুদ্ধি আদালতি বুদ্ধিতে পরিণত করা বড় সহজ কথা নয়। তুমি কি ভাব,আদালতে সাক্ষীরা সত্য কথা বলতে আসে?"

আমি বিষয় পরিবর্ত্তন বাসনায় বলিলাম, "এখন উপায় কি বলুন? আমাদের কোন মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার প্রয়োজন নাই।"

দাদা মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া

বলিলেন, "প্রয়োজন যথেষ্টই ছিল; কিন্তু উপায় নাই ব'লেই যা বল। তমস্থকের সত্যাসত্যতা প্রমাণের নিমিত্ত তমস্থকের লিখিত সাক্ষীর জবানবন্দী করান উচিত।"

তারপর নানা কথা বার্ত্তার পর দাদার যুক্তিমতে স্থিরীকৃত হইল যে যেরূপে হউক, সাক্ষীদিগকে বাধ্য করিতেই হইবে। ছয়জন সাক্ষীর মধ্যে দুইজনকে অর্থসাহায্যে, আয়ত্ত করা সম্ভব বলিয়া দাদা তাহাদের ভার লইলেন, এবং বাকী চারিজনকে তোষামোদ তৈলে আকর্ষণ করিবার ভার আমার উপর পড়িল।

মোকদ্দমার দায়ে পড়িয়া ইতিপূর্ব্বেই পাঠশালাটি একপ্রকার উঠিতে বসিয়াছিল। এক্ষণে পাঠশালার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়া, দুইবেলা সাক্ষীদের বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করিলাম। দুই চারি দিন তাহারা আমার সহিত বড় একটা কথা বলিল না। কখনও বা আমাকে দেখিতে পাইয়াও মুখ তুলিয়া চাহিল না। মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইতে লাগিল— অবজ্ঞাকারীদিগের বাড়ীতে আর প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু কি করি, দাদার পরামর্শে মনের দুঃখ মনে চাপিয়া, দাঁতে হাসি মাখিয়া, গাপড়া হইয়া কথা কহিতে লাগিলাম; ইচ্ছার বিরুদ্ধে দায়ে পড়িয়া তাঁহাদের সন্তোষকর চাটুবাক্য প্রয়োগ করিতে অভ্যাস করিতে লাগিলাম। আর কখন বা একটা বড় মাছ, এক কাঁধি পাকাকলা, একভার ভাল দধি ইত্যাদি মনোরম দ্রব্য উপহার দিতে লাগিলাম। সাক্ষীদলের মধ্যে রাম গোবিন্দ ঘোষ সর্ব্বপ্রধান; তিনিই দলের নেতা; তাঁহার রায়েই সকলের রায়। কাজেই তাঁহার বাড়ীতেই আমাকে অনেক সময় কাটাইতে হইত। নিজের পূর্ব্ব অবস্থা, শিক্ষাবিভাগের মর্য্যাদা ভুলিয়া, কখন তদীয় কনিষ্ঠ পুত্রটিকে কোলে করিয়া, তাঁহাকে শুনাইয়া, শিশুর নাক মুখ চ'কের প্রশংসা করিতাম; চুলগুলি বড় সুন্দর সুলক্ষণযুক্ত বলিয়া ঘোষজার সন্তোষ বর্দ্ধন করিতাম; কখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তির সুখ্যাতি করিয়া, তাঁহার সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করিতাম; আবার কখনও বা ঘোষজার নিজের দয়া দাক্ষিণ্যের যশোগানে সুর মিশাইতাম।

এক দিন বৈকালে কএকটী পাকা কলা লইয়া ঘোষ মহাশয়ের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। ঘোষজার মুখে হাসি ধরেনা— তিনি তৎক্ষণাৎ আপন পুত্রকে কলা গুলি লইয়া যাইতে বলিলেন, এবং যত্ন সহকারে আমার সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রসন্ন ভাব দেখিয়া আমারও সাহস হইল; নিয়মমতভাবে ধীরে ধীরে মোকর্দ্দমার কথা আরম্ভ করিলাম। ঘোষজা বলিলেন "হেঁ হেঁ, আমরা সেদিন যুক্তি ক'রে স্থির করেছি— আদালতে যাব, আর সাক্ষ্যও দিব। রামার কথায় ভয় কর্‌লে লোকে নিতান্ত কাপুরুষ ব'লে মনে করবে।"

কথা শুনিয়া আমার আনন্দের সীমা রহিলনা; একথা ওকথার পর বিদায় লইয়া দাদার নিকটে আসিলাম এবং সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত করিলাম। দাদাও আহ্লাদিত হইলেন, এবং পরদিন সাক্ষীদিগকে এক একটি মাছ পাঠাইবার উপদেশ দিলেন।

পুকুরে একটি আঁইশও ছিলনা ; হাটে সাতটি মাছ ক্রয় করিয়া, ছয়টি সাক্ষীর বাড়ীতে ছয়টি, ও দাদাকে একটি পাঠাইয়া চরিতার্থ হইলাম। বাড়ীর নিমিত্ত একটি ক্রয় করিতে সাহস হইলনা— নিরামিষার ভোজনে দিন কাটাইলাম।

পরদিন প্রাতে ঘোষজা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কি কারণে ডাকিয়াছেন বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিল, তাড়াতাড়ি তাঁহার বাড়ীতে গমন করিলাম।

ঘোষজা বলিলেন, " ওহে, শমন পেয়েই একেবারে আদালতে হাজির হ'লে নিতান্ত বাজে সাক্ষীর দলে প'ড়ে যাওয়া যায়। চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করেছি, দস্তক মালক্রোক না হ'লে যাওয়া ভাল নয়। আমরা যাবই, তোমাকে চিন্তা করতে হ'বেনা ; তবে নিজ মানসম্ভ্রমের দিকে দৃষ্টি করে কার্য্য করা আবশ্যক; তজ্জন্য বলি, যে দস্তক মালক্রোকের বিধানটা ক'রে দাও, তাহ'লেই যাওয়া যাবে।" আমি কথাটা ভাল বুঝতে পারলাম না ; কাজেই কোন উত্তর না দিয়ে দাদার নিকটে আসিয়া সব কথা বলিলাম। তিনি বল্লেন, " সে কথাটা মন্দ নয়। আর সাক্ষীরা এক শমনে যাওয়ার চেয়ে দস্তকাদিতে হাজির হ'লে সাক্ষীর মূল্যও খুব বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। তবে আগামী দিবসে অবকাশ পাওয়া যাবে কিনা, তা না জেনে কোনও যুক্তি ত হ'তে পারেনা।"

সুতরাং পরদিন ব্যাগহস্তে উকীল বাবুর বাসায় যাত্রা করিতে হইল। উকিল বাবু বলিলেন, "এ কিরূপ মান সম্ভ্রম বুঝিনা বাপু ! আদালতের সমনে উপস্থিত হইলে অপমান হইবে, আর দস্তক যাইয়া ঘাড়ে ধরিয়া টানিয়া আনিলে মর্য্যাদা বাড়িবে ?" তাঁহার সহিত যুক্তিতে বুঝিলাম, আগামী দিবসে মোকদ্দমা হইবার আশা নাই; তবে অবকাশ চাহিলেও তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

রাম গোবিন্দ ঘোষকে সমস্ত কথা জানাইলাম। কিন্তু বিনা দস্তকে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন না; দধি মৎস্যাদি দ্রব্য ও চাটুবাক্য, তিনি সমস্তই ভুলিয়া গেলেন; চক্রবর্ত্তীর পরামর্শই অকাট্য বলিয়া বিবেচিত হইল।

ঘোষজার কথা শুনিয়া, আর তিন জন সাক্ষীও যাইতে অস্বীকার করিল। কেবল মাত্র দাদা যে দুইজনের ভার লইয়াছিলেন, অর্থলোভে তাহারাই যাইতে সম্মত হইল। কাযেই মোকদ্দমার দিবসে তাহাদিগকে লইয়াই গমন করিলাম। দাদা আর দুইজন-কেও ডাকিয়া লইলেন [illegible] তাহারা দাদার বাড়ীতে মজুরি করিত। মজুরির দাম দিতে হইল। সাক্ষী আনিতে পারি নাই শুনিয়া উকীলবাবু ও মোহরি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, এবং মোকদ্দমা রক্ষার কোন উপায় নাই জানাইলেন। সাক্ষীব্যাপারে আমার বড়ই তিতীক্ষা জন্মিয়াছিল। সাক্ষী আসিলনা বলিয়া উকীল বাবু বার বার তিরস্কার করায় শেষে আমি বলিলাম, "কি করি বলুন, সাক্ষীরাত আর বাক্সের টাকা বা নিজের স্ত্রী পুত্র নয় যে তাহাদিগকে আমি যাহাই করিতে বলিব, তাহাই করিবে ? এই একমাস কাল, এ জীবনে কখন যাহা করিনাই তাহা

করিয়াছি; স্ত্রী ও শিশু পুত্রের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া তাহাদিগের পূজা করিয়াছি; নিজের মান সম্ভ্রমের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহাদের বাটীতে তামাক সাজিয়া খাওয়াইয়াছি। এত করিয়াও যদি না আনিতে পারি, উপায় কি বলুন ?" উকীল বাবু বলিলেন, "বাপু, আমরা সব বুঝি, সব জানি; কিন্তু হাকিমেরা তা বোঝেন না; তাঁরা মনে করেন, পক্ষগণ ইচ্ছা করিয়াই সাক্ষী আনে না।" শেষ চারি জন সাক্ষীর নামে দস্তক জারির প্রার্থনায় অবকাশ প্রার্থনা করাই স্থির করিয়া যথাসময়ে আদালতে দরখাস্ত দাখিল হইল।

হাকিম সময় দিলেন না— প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া মোকদ্দমা ধরিয়া বসিলেন। বাহিরে আসিয়া উকীল বাবু তমস্সুকের কোন সাক্ষী আছে কিনা,জানিয়া হাজরাণ দিবার উপদেশ দিলেন; দাদার মতেও তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইল। আমিও মোকদ্দমার কাণ্ড দেখিয়া নিতান্ত বিব্রত হইয়াছিলাম — যাহা হয় একটা হইয়া গেলে খরচ ও লাঞ্ছনার দায় হইতে রক্ষা হয় বলিয়া, আমিও তাহাতে দুঃখিত হইলাম না,কিন্তু তখনই মোকদ্দমা ধরা হইবে শুনিয়া আমার যেন বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হইয়া গেল; জিভ্ চট্ চট্ করিতে লাগিল, ঠোঁট শুকাইয়া গেল, বুক্ গুড় গুড় করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

উকীল বাবু কাগজ পত্র লইয়া ধরিয়া উঠাইল, আমি কলের পুতুলের মত উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এই এজলাস আজ কয়েক মাস যাবৎ দেখিতেছি; সেই হাকিম, সেই উকিল, সেই সব; কিন্তু সাক্ষীর কাঠরায় দাঁড়াইয়া সব যেন কেমন লাগিতে লাগিল; মাথার মধ্যে একটা গোলযোগ বাধিয়া গেল; বোধ হইতে লাগিল, মাথা নীচের দিকে, ও পা উপরের দিকে হইয়া গিয়াছে। আমি যেন হিংস্রজন্তুপরিবৃত স্থলে উপস্থিত হইয়াছি। ঘামে আমার মাথা পুরিয়া গিয়াছে; আর একটু হইলেই হয়ত নীচে পড়িয়া যাইতাম, এবং মিথ্যা কথা বলিতে উঠিয়াছিলাম বলিয়া চারিদিকে হৈচৈ পড়িয়া যাইত। কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বর এ যাত্রা আমাকে লোকলজ্জার দায়, ও সর্ব্বোপরি রামদাসের উপহাস হইতে রক্ষা করিলেন। পেয়াদার কঠিন হস্ত আমার হস্তের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া আমাকে নামাইল;— আমার যেন নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; আমি ধীরে ধীরে বাহিরে যাইয়া সুস্থ হইলাম; আমার অবস্থার কথা কাহাকেও বলিলাম না।

বাহিরে আসিয়া শুনিলাম, বড় সৌভাগ্য, আজ মোকদ্দমা রক্ষা হইয়াছে। দাদাকে লইয়া ছয় জনার নাম লিখিয়া হাজরান দাখিল হইয়াছিল; রামদাস ওপাঁচজন সাক্ষী আনিয়াছিল। কাজেই মোকদ্দমা ধরিতে গেলে ১১জন সাক্ষীর জবানবন্দী করিতে হয়। হাকিমের ফাইলে অনেক পুরাতন মোকদ্দমা রহিয়াছে; যখন তিনি দেখিলেন দরখাস্ত অগ্রাহ্য হওয়ায় বাদী

মোকদ্দমার জন্য দিন ফেলিয়া দিলেন। আমরা পরদিন ঘোষজা প্রমুখ চারিটি সাক্ষীর উপর দস্তক জারি করিবার দরখাস্তের খরচা ও তলবানা দিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে বাড়ী যাত্রা করিলাম।

এতদিন আদালতে যাতায়াত করিয়া আমার অনেকটা সাহস হইয়াছিল; কিন্তু এবার কাঠরাতে উঠিয়া যে বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহা ভাবিয়া নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলাম; কেমন একটা আতঙ্ক ভীষণ মূর্ত্তিতে হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল।

যে দিন বাড়ী পঁহুছিলাম, সে রাত্রিতে এক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। যেন আমি একখানি পরিষ্কার কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া বাতায়ন-পথে ফুটন্ত কুসুমরাশি দেখিতেছি; মলয় পবন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মনপ্রাণ সুশীতল করিতেছে। সহসা অদূরে এক লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া আমাকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ডাকিতে লাগিল। আমি তাহার হাবভাবে আকৃষ্ট হইয়া বাহির হইলাম। রমণী সুদূরে একটি আলোক দেখাইয়া আমাকে সেই দিকে লইয়া চলিল; আমিও সেই জ্যোতিতে বিমুগ্ধ হইয়া পতঙ্গবৎ ছুটিতে লাগিলাম; কিন্তু যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই সেই আলোক দূরে পলাইতে লাগিল; আমি ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তাহা ধরিবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। কিন্তু আর ছুটিতে পারিলাম না ক্লান্ত দেহে এক তমসাচ্ছন্ন অরণ্য ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। আমার সঙ্গিনী পক্ষীবেশে পক্ষচালনে আমার শ্রান্তি দূর করিতে লাগিল এবং ক্রমে আমার তন্দ্রা আসিল। পাপীয়সী সুযোগ বুঝিয়া, চঞ্চু সাহায্যে আমার হৃদয় ভেদ করিয়া রক্তপান করিতে লাগিল; তন্দ্রাবেশে আমি তাহা বুঝিয়াও বুঝিলাম না; শরীর ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইল; শেষে চাহিয়া দেখিলাম, কুহকিনী পলায়ন করিয়াছে; আমি এক দুরন্ত সিংহের সম্মুখে পড়িয়া আছি। পশুরাজ লাঙ্গুলাসনে উচ্চ হইয়া আমার মুণ্ডভোজনের অভিপ্রায়ে বসিয়া আছেন। এক পার্শ্বে একটা বাঘ আমার বুকে মুখ দিয়া রক্ত শোষণ, ও হৃদয়ের কোমল মাংস ভোজন করিতেছে। আর একদিকে একটা ভালুক দন্তবিকাশ করিয়া উগ্রমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে; এবং মধ্যে মধ্যে মুখফেন নিক্ষেপে আমার শরীরে দারুণ জ্বালা উৎপাদন করিতেছে; আবার কখন বা তীক্ষ্ণ দন্ত নখরাঘাতে আমার দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। সিংহও এক এক বার সুযোগ পাইলেই আমার মাথায় চপেটাঘাত করিতেছে। ব্যাঘ্র, সিংহ ভল্লুকের আক্রমণে বাধা দিয়া গভীর গর্জ্জনে চারিদিক নিনাদিত করিতেছে; আর এক একবার ব্যাঘ্র ও ভল্লুকের তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিতেছে।

একটা শৃগাল অদূরে ধীর ভাবে বসিয়া বসিয়া আমার দুর্দ্দশা দেখিতেছে; এবং সিংহ ব্যাঘ্র একটু অন্যমনস্ক হইলেই, ছুটিয়া গিয়া দন্তাঘাতে আমার উদর ছেদন করিয়া মাংস ও নাড়ী ভুঁড়ি কাটিয়া লইতেছে। একটা কাক উড়িয়া উড়িয়া আমার চক্ষুতে ঠোকরাইতেছে এবং কখন নাড়ি টানিতেছে,

কখনও রক্তপান করিতেছে, আর কখন বা ব্যাঘ্রে কবল হইতে মাংস খণ্ড লইয়া উড়িয়া যাইতেছে। কতকগুলি শকুনি চারিধারে ছুটাছুটি করিতেছে। তাহাদের কাহারও কাহারও মাথা লাল; তাহারা নিকটে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সিংহ বিশ্রাম চেষ্টা করিলেই, ব্যাঘ্র উদর পূরণ করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেই, শকুনিদল আমার ক্ষতবিক্ষত কঙ্কালদেহ লইয়া টানাটানি করিতেছে, এবং যে যাহা পারিতেছে উদরসাৎ করিতেছে। আমি দারুণ যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছি, আকুল প্রাণে কাঁদিতেছি, কিন্তু কেহই দয়া করিতেছে না; আপন আপন উদর পূরণে সকলেই ব্যস্ত হইয়াছে।

সিংহ এতক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া ছিল। শেষে সুযোগ বুঝিয়া গভীর গর্জ্জনে আমার মাথা কামড়াইয়া ধরিল। যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সিংহ ক্ষিপ্রতার সহিত সুতীক্ষ্ণদন্তে মাথা চিবাইয়া ফেলিয়া দিল; কিছুই উদরস্থ করিল না। আমি পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিলাম।

আবার সেই লাবণ্যময়ী রমণী ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া অতি কোমল ভাবে মধুর স্বরে আমাকে ডাকিল। আমি চমকিত হইয়া নয়ন মেলিলাম। হিংস্র জন্তুদল কোথায় চলিয়া গিয়াছে; আমি সেই স্নেহময়ীর ক্রোড়ে পড়িয়া আছি। সবকথা ভুলিয়া গেলাম, রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, আর রমণী নানারূপে প্রবোধ দিতে লাগিল।

নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। মলিনবসনা পত্নীর বিরস বদন সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। বিস্মিত নয়নে চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। কোথায় সেই ক্রোড়, আর কোথায় সেই হিংস্র জন্তুদল! তখনও ঘুমের ঘোর যায় নাই;—ক্রমে ভাবিতে লাগিলাম; মনে হইল, বালকদিগকে অনেকবার বুঝাইয়াছি "স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা মাত্র," কিন্তু কে যেন বলিতে লাগিল, "সাবধান!" আমার মনে হইল "তবে কি স্বপ্ন সত্য?"

—(•)—

আকিঞ্চন।

(১)

বুক ভরা স্নেহ আর প্রাণ ভরা ভালবাসা,
ক্ষুদ্র এই হৃদয়ের মুকুলিত নব আশা,
সঁপিয়া দুঃখীর তরে—
সারাটি জীবন ভরে'
বিভু হে, মিটাই যেন প্রাণের পিয়াসা।

(২)

আপন বাসনারাশি দিয়া যাক্ বিসর্জ্জন,
[illegible]
তাপীর বেদনা-ভার,
করুণ নয়নাসার
ঘুচাতে [illegible] প্রাণে—মনে বড় আকিঞ্চন।

(৩)

মুছাতে শোকের অশ্রু, তুষিতে ব্যথিত প্রাণ,
চিরদিন সমভাবে ধরি যেন এ পরাণ—
ব্যাকুল এ আকিঞ্চন
প্রাণে জাগে অনুক্ষণ,
তাই, নাথ, তব পদে করিতেছি নিবেদন;—

(৪)

আপনি হইয়ে গুরু দীক্ষিত করহ মোরে
দীন-সেবা-ব্রতে,—প্রাণ সঁপিতে পরের তরে,
নিজ হাতে হাত ধরি
নিয়ে চল কৃপা করি
আপনি দেখায়ে পথ; ঘোর মোহ-অন্ধকারে
ধ্রুব জ্যোতি হয়ে থাক হৃদি আলোকিত ক'রে॥

শ্রীগিরিজা কুমার বসু।

সমালোচনা।

বিবিধ সঙ্গীত।— শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র সরকার দ্বারা গড়বেতা হইতে প্রকাশিত, মূল্য ৵০। এই পুস্তক খানিতে নানা বিষয়ক ৫০ টি সঙ্গীত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সঙ্গীত গুলির রচনা সাধারণতঃ সুমিষ্ট এবং সরস হইয়াছে। স্থানে স্থানে বেশ কবিত্ব আছে। দুটি একটি স্থানে কোন কোন কথা যেন অতিশয় হালকা বোধ হইল। তাহা বাদ দিলে বইখানি ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে।

—(*)—

নন্দীগ্রামের কথা।

তমলুক মহকুমাতে নন্দীগ্রাম থানা যাওয়া অবধি স্থানীয় লোকের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। প্রথমতঃ তমলুক সহর অতিশয় সঙ্কীর্ণ ও সেখানে বাসোপযোগী ভাল স্থান আদৌ নাই। মোকদ্দমার পক্ষগণ, যাহাদের সুবিধার জন্য এই পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহারা অগত্যা অপরিচ্ছন্ন হোটেলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। এই সকল হোটেলে থাকা বা আহারাদি করা কেবল অস্বাস্থ্যকর ও ব্যয়সাধ্য নহে; হোটেলের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকের অধিক পরিমাণে সংস্কারগত বিদ্বেষ ও ঘৃণা রহিয়াছে। পল্লিবাসীরা স্বতন্ত্র ভাবে থাকিয়া, রন্ধন ও আহারাদি করিতে ভালবাসে। দ্বিতীয়তঃ, তমলুকে পানীয় জলের অবস্থা অতীব শোচনীয়। সে অভাব কিছুতেই মোচন হইবার নহে। সমস্ত সহরে দুইটী মাত্র পানীয় জলের পুষ্করিণী আছে; একটী মিউনিসিপালিটীর অধিকৃত ও আর একটী স্থানীয় রাজার নিজস্ব। দুইটীই আয়তনে অতি ক্ষুদ্র, ও সহরের অধিকাংশ বাসস্থান হইতে অনেক দূরে

অবস্থিত; সকলের ভাগ্যে ব্যবহার ঘটে না। এই পুকুর দুইটীর জল বর্ষাকালেই নির্দ্দোষ হয়; ও. শীত হইতে অল্লাধিক পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত ও নীলাভ উদ্ভিদানুপরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ডোবাগুলির জলে বহুবিধ সন্তরণশীল জীব-দেহের ক্রীড়া দর্শনে তাহা পান করা দূরে থাকুক, স্পর্শ করিতেও ইচ্ছা হয় না। সহরের মধ্যস্থলে "জুবিলি ওয়েল" নামক যে কূপ বহুদিন খনন করা হইয়াছে, তাহার জল এত কদর্য্য যে লোকে তাহা আদৌ ব্যবহার করে না, ও মিউনিসিপালিটী তাহা বন্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। তমলুক সহরটী লবণাক্ত নদীর তীরবর্ত্তী হওয়াতে পানীয় জলের উন্নতি করিবার শত চেষ্টা করিলেও কিছুতেই তাহা নির্ম্মল ও সুস্বাদু হইবার নহে। বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্ট পানীয় জলের উন্নতির জন্য যেরূপ সচেষ্ট হইয়াছেন, এই স্থান-পরিবর্ত্তন গবর্ণমেণ্টের সে নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে।

কাঁথিতে মফস্বল হইতে যে সকল লোক আসিত, তাহারা প্রশস্ত গৃহে বাস, ও অনায়াসলব্ধ স্বচ্ছ কূপবারি পান করিয়া, প্রবাসের কষ্ট আদৌ অনুভব করিত না। এমন কি, কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া তাহারা সঙ্গে রোগীদিগকেও চিকিৎসার জন্য কাঁথিতে আনিত। তমলুকে যাইয়া তাহারা একদিনের বেশী থাকিতে চাহে না। শতাধিক বর্ষ উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ কাঁথির জল বায়ু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তথায় ক্রমান্বয়ে শুভাগমন করিয়া আসিতেছেন। ভারতবর্ষের প্রথম বড়লাট ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ বাহাদুর কাঁথির নিকটেই গ্রীষ্ম-বিহার করিতেন। খরস্রোত রূপনারায়ণ নদ তমলুকের অর্দ্ধাংশ উদরসাৎ করিয়াছেন; পুনরায় যে কখন কি করেন, তাহার স্থিরতা নাই। সহরের যে অংশ বাকী আছে, তাহাতে ইতিপুর্ব্বে স্থানীয় লোকেরই সংকুলান হইত না, তাহার উপর প্রত্যহ দেড়শত বা দুইশত নূতন লোকের সমাবেশ হওয়া কতদুর অস্বাস্থ্যকর ও কষ্টদায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তমলুকের বিরুদ্ধে আর একটি প্রধান অপত্তি যে তথায় স্থান-সংক্ষেপ বশতঃ কি ভদ্রপল্লী, কি বিদ্যালয়, কি প্রবাসগৃহ সর্ব্বত্রই বারাঙ্গনাগণের লীলাভূমি অতি নিকটে রহিয়াছে, ও তদ্দারা নানা প্রকার দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতেছে। যেখানে নির্ম্মল পানীয় বারি, যেখানে অধিকতর বিশুদ্ধ, স্বাস্থ্যপ্রদ, মধুর সাগর সমীরণ নিয়ত সেবন করিতে পাওয়া যায়, যেখানে দ্রব্য সামগ্রী সাধারণতঃ সুলভ, যেখানে শতবর্ষ প্রজাবৃন্দ বিনা আপত্তিতে ও প্রফুল্লচিত্তে গতিবিধি করিয়া আসিতেছে, এমন সুখের স্থান পরিত্যাগ করিয়া, ব্যাধিসঙ্কুল ও ক্ষুদ্রায়তন তমলুকে যাতায়াত করিতে নন্দীগ্রামবাসীগণ অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলী সাহেবের জ্যেষ্ঠ সহোদর সুনামখ্যাত ডাক্তার বেলী সাহেবের পরামর্শানুসারে, সুযোগ্য রাজকর্ম্মচারীগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া, নন্দীগ্রামের দেওয়ানী বিচারালয় কাঁথির অধীনেই রাখিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পুর্ব্বে সুদক্ষ

কমিসনার বামন্ সাহেব কাঁখির প্রাকৃতিক শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়া তাহাকে জেলা শ্রেণীতে উন্নীত করিবার নির্দেশ প্রাপ্ত পাইয়াছিলেন। স্থানীয় লোকে কখন কোন কালে আপত্তি উত্থাপন করে নাই। এই পরিবর্ত্তন তাহাদের অসুবিধার একাংশ হইতেছে। পরিবর্ত্তনের সকল উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে।

সংবাদ।

কান্তির বর্ত্তমান জানুয়ারী মাসের সংখ্যা হইতে কাঁথি ও তমলুক মুন্সফী আদালতের সমুদয় নীলাম যথা নিয়ম কান্তিতে প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত জজ সাহেব বাহাদুর তমলুক মুন্সফী হইতেও নীলামের তালিকা লইবার অনুমতি দিয়াছেন। আমরা জজ সাহেব বাহাদুরের এই সদয় আদেশের জন্য হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ঘাটালের হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে যে স্বত্বের মোকদ্দমা মেদিনীপুরের জজ আদালতে হইতেছিল, তাহাতে মুসলমান পক্ষ জয় লাভ করিয়াছে।

চাঁদপুর সমুদ্রকূলে কাঁথি হইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত। চাঁদপুর বাঙ্গলা সমুদ্র তীরে অতি মনোরম স্থলে নির্ম্মিত। এই স্থান সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া অনেকে বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত এখানে আসিয়া থাকেন। গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস্ মহোদয়ও অনেক সময় এখানে অতিপাত করিয়াছেন। স্রোতোবেগে তীরদেশ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্র চাঁদপুর বাঙ্গলার অতি সন্নিকটে আসিয়াছে, এমন কি ২।১ বৎসর মধ্যে বাঙ্গলাটি সমুদ্রগর্ভে নিহিত হইবে। তদ্বিষয় অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সমুদ্রের ভাব গতিক দেখিয়া পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট চাঁদপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানের এম্ব্যাঙ্কমেন্ট পশ্চিম দিকে সরাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইহাতে অনেক গুলি দরিদ্র প্রজাকে বাস ত্যাগ করিয়া অন্যত্র উঠিয়া যাইতে হইবে। শুনা যাইতেছে যে যে ভূমির উপর বাঁধ হইবে, সরকার পক্ষ হইতে সেই টুকুরই মূল্য দিয়া ক্রয় করা হইবে; দরিদ্র প্রজাগণের রক্ষার কোন উপায় করা হইবেনা। আমরা আশা করি, সদাশয় গভর্ণমেণ্ট ও পোলবন্দী বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারীগণ এই অসহায় দরিদ্রগণের ক্ষতিপূরণের কোন রূপ বন্দোবস্ত করিয়া দয়া প্রকাশ করিবেন।

কলাগেছা গ্রাম কাঁথির আটক্রোশ উত্তরে। এই গ্রামে অনেক গুলি ভদ্রলোকের বাস। সেদিন এই গ্রামের শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র মাইতির দুইটী আমলা রাত্রিতে তাঁহার কাছারী হইতে বাড়ী যাইতেছিলেন। রাত্রি অন্ধকার বলিয়া তাঁহারা সঙ্গে একটি হরিকেন লণ্ঠন লইয়া যান। মাঠের পথে যাইতে যাইতে ভ্রম ক্রমে তাঁহারা গন্তব্য পথ হইতে কিছু দূরে যাইয়া পড়েন। তাহাতে মাঠের পার্শ্বে এক ব্যক্তির বাড়ী হইতে অদূরে কয়েকটি

ছাতা জুতা ও থালা প্রভৃতি কয়েকটি বাসন ও একটি কাপড়ের পোচ্‌কা দেখিতে পান। তাঁহারা ঐ দ্রব্য কাহার জানিবার জন্য ডাকাডাকি করিয়া নিকটবর্ত্তী বাড়ীর লোককে জাগাইয়াছিলেন; কিন্তু সে ব্যক্তি কিছুই বলিতে পারে নাই। অগত্যা তাঁহারা সেই ব্যক্তিকে জিনিষগুলি মাথায় লইয়া তাঁহাদের বাড়ীতে দিয়া আসিতে বলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিবার চেষ্টা করিবেন বলেন। তাহার পর তাঁহারা জিনিষগুলি লইয়া অগ্রসর হইবামাত্র দূরনিক্ষিপ্ত এক ইষ্টকের আঘাতে লণ্ঠনটি ভাঙ্গিয়া আলোক নিবিয়া যায়, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্ধকারে তাঁহাদের উপর লাঠির আঘাত পড়িতে থাকে। যাহার মাথায় ঐ সকল দ্রব্য ছিল, তাহার কাঁধে লাঠি লাগায় সে জিনিষগুলি ফেলিয়া দেয়। একটি আমলা বাবুর পায়ে সামান্য রূপ আঘাত লাগে, কিন্তু অপরটি গুরুতর আহত হন। তাঁহার মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। শীঘ্রই তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয়, এবং পরে কাঁথির হাঁসপাতালে তাঁহাকে পাঠান হইয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি আরোগ্য হইয়াছেন। পুলিশ কোন কিনারা করিতে পারেন নাই।

বাবু নারাণ প্রসাদ মাইতি ও বাবু শ্যামাচরণ মাইতি দুই সহোদর। শ্যাম বাবু একটা পাকা দেওয়াল দিতে আরম্ভ করায় নারাণ বাবু নাকি তাহাতে বাধা দেন। শ্যামবাবুর পুত্র নারাণ বাবুর বিরুদ্ধে ফৌজদারী করিলে নারাণ বাবু ঐ স্থান এজমালী বলিয়া দাবি করেন। কাঁথির সুযোগ্য সবডেপুটী কলেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু ... বিচার হয়। বিচারে আসামির ৭০৲ টাকা অর্থদণ্ড হয়, এবং জেলা আপিলেও তাহা বাহাল ছিল। নারাণ বাবু হাইকোর্টে আপীল করিয়া মুক্তি পাইয়াছেন। এজমালী সম্পত্তিতে এক শরিক স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে অন্যকর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলে, সেইরূপ বাধা দেওয়ার জন্য ফৌজদারী বিচারে দণ্ড হইতে পারে না। ইহাই সাব্যস্ত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম জেলায় ভয়ানক ঝড় হইয়া প্রায় দশ সহস্র লোকের মৃত্যু হয় এবং লক্ষাধিক লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ দুরবস্থাপন্ন লোকদের সাহায্যার্থে কতিপয় ভদ্রলোকের উদ্যোগে কাঁথি মহকুমায় হইতে প্রায় ১৮০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। কাঁথি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও দয়াপরবশ হইয়া কুড়ি টাকা এই সৎকার্য্যের জন্য দান করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সমিতির সাহায্যার্থেও উক্ত বিদ্যালয় একশত টাকা দান করিয়াছিল। দানশীলতায় বাস্তবিকই কাঁথির ছাত্রগণ সমগ্র বঙ্গদেশের ছাত্রগণের আদর্শস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভগবান্ তাহাদের মঙ্গল করুণ।

মজনামুঠা পরগণার জুগীবেড়া নিবাসী ৺জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র শ্রীব্রহ্মনন্দ মিশ্রের দ্বিতীয় পুত্রকে উক্ত পরগণার হাটিয়াগড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত বীর নারায়ণ পাহাড়ী বিগত ৪ঠা বৈশাখ বৃহস্পতিবার শাস্ত্রানুসারে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া তাহার নাম দিনি ননীগোপাল ও নিমন্ত্রিত ভট্টাচার্য্যগণ হরিপদ রাখিয়াছেন। তদুপলক্ষে পাহাড়ী মহাশয় অনেক টাকা খরচ করিয়া বহু ভদ্রলোক ... দিগকে ভোজনাদি করাইয়াছিলেন।